ভারতের

দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম

(অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস—প্রথম খণ্ড)

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

নবভারত  পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা—৯

প্রথম সংস্করণ

অক্টোবর ১৯৮৩

মূল্য : পনর টাকা

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর : শ্রীঅরুণকুমার রায়, শ্রীকমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫৪।১বি শ্যামপুকুর স্ট্রীট কলিকাতা—৪

সূচীপত্র

ভূমিকা

এই পুস্তকের প্রথম পাণ্ডুলিপি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে লেখকের সুদূর জার্ম্মাণীতে প্রবাসকালে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই সময়ে অনেক বাঙ্গলাভাষী যুবক ছাত্র সেই দেশে বিদ্যাশিক্ষার্থে আগমন করেন। তাঁহাদের কাছ হইতে শ্রুত হওয়া যায়, যে সব বৈপ্লবিক কর্ম্মী আন্দামানের নির্ব্বাসন হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কেহ কেহ নিজেদের পূর্ব্বের কর্ম্মকে নিজেদের ছেলেমানুষীর খেয়াল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, নিজেরাই নিজেদের অতীতের কর্ম্মকে ঠাট্টা করিয়া লোকচক্ষে হেয় করিয়াছেন। তাঁহারা হয়ত ইহাই বলিতে চাহিতেছিলেন: বাঙ্গলায় যে বিপ্লব-বাদের প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তাঁহারাই তাহার জন্মদাতা, আর ইহা তাঁহাদের ছেলে-মানুষী খেয়াল মাত্র। তাঁহাদের হয়ত ধারণা, এইরূপে অতীতের বিপ্লবকর্ম্মকে একটি পাগলামী খেয়ালের বস্তু বলিয়া ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিলে বিপ্লববাদও বঙ্গে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে, আর তখনকার গভর্ণমেণ্টও স্বস্তি বোধ করিবে। পুনঃ, ইহাও প্রবাসে লেখকের কাছে অন্তরীণাবস্থামুক্ত কতিপয় যুবক বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্তদের এবম্প্রকারের ব্যঙ্গোক্তি আন্দামানে নির্ব্বাসিত অন্যান্যদের প্রাণে বিশেষ আঘাত প্রদান করে। এই সংবাদ সুদূর প্রবাসে লেখকের কাছে পীড়াদায়ক হয়। লেখক ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা তখন স্বাধীনতা আন্দোলনে নূতন পর্য্যায় আরম্ভ করিবার জন্য চেষ্টিত আছেন। একবার অকৃতকার্য্য হইলে সেই কর্ম ব্যঙ্গোক্তির বিষয় হয় না। সেইজন্যই তিনি কলম ধরিলেন, যাহা তিনি জানেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিলেন।

এই সঙ্গে ইহাও বক্তব্য, দুই জন বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন বন্ধু moderator-রূপে তাঁহার লেখা পরীক্ষা করিতেন, যেন ইহা ব্যক্তিগত কলহের মধ্যে না আসিয়া পড়ে।

তৎকালে, লেখক বিপ্লবের মধ্যে বাস করিতেন এবং ইতিপূর্ব্বে (১৯২১ খৃষ্টাব্দে) সোভিয়েট-রুষ দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। এই জন্য লেনিনের বিখ্যাত উক্তি তাঁহার মনে জাগিত: "বিপ্লবের ইতিহাস লেখাপেক্ষা, বিপ্লব দেখা ভাল"। কিন্তু দেশের পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহ তাঁহার মনে পীড়া প্রদান করে; অবশেষে তাঁহাকে এই বিবরণটি প্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু এই স্থলেও একটি পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা ছিল—তাহা হইতেছে. বিদেশ হইতে স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা এক ব্যাপার, আর সেই ইতিহাসকে পরাধীন দেশে পরিচিত করা আর এক ব্যাপার। ইহার কারণ, পরাধীন দেশের কবি বহু পূর্ব্বেই গাহিয়াছেন: ' শাসন-সংযত-কণ্ঠ জননী, গাহিতে পারি না গান"।

এই সব কারণ বশতঃ যাহা পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হইয়াছিল তাহার অনেক বাদ দিয়া কিয়দংশ প্রথমতঃ "বঙ্গবাণী", তৎপরে পৃথক পুস্তকাকারে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ইহা চিরতরের জন্য বাজেয়াপ্ত করিয়া দেন। অবশেষে, ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিলে, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করিয়া আমলাতান্ত্রিক লাল-ফিতার দীর্ঘ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পুস্তকের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করান হয়।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ মারাঠি ভাষায় পুণা চিত্রশালা প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। পরে বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট তাহা বাজেয়াপ্ত করে।

কিন্তু তথায় প্রথম কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইলে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। এই পুস্তকের হিন্দি সংস্করণ লেখক কাকোরী মকদ্দমার আপীল পরিচালনা কমিটিকে অর্থ সাহায্যের জন্য দান করেন। তাঁহারা এই পুস্তকটির অনুবাদ করেন। কিন্তু মুদ্রিত না করিয়া অবশেষে আগ্রার "সৈনিক" সংবাদপত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করেন। ইহার মধ্যে একসংখ্যা গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেন। এই সঙ্গে ইহাও প্রকাশযোগ্য যে আসামে নূতন আইনানুযায়ী কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইলে আসামে বাঙ্গলা সংস্করণের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য দরখাস্ত করা হয় কিন্তু আসামের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকৃত হন।

এক্ষণে এই পুস্তকের দুই খণ্ডই বিস্তৃত পাদটীকা এবং বিবৃতিসমূহ দ্বারা বর্দ্ধিত-কলেবররূপে প্রকাশিত হইতেছে।

এই পুস্তক ভারতের পরাধীনতার অবস্থায় লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন ভারতের স্বাধীনতার যুগে এই পুস্তকের বিষয়বস্তুগুলি যাহা পূর্ব্বে সূত্ররূপে লিখিত হইয়াছিল, তাহা পাদটীকা দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত ঘটনা লোকের কাছে অজ্ঞাত ছিল তাহা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইতেছে। এই সঙ্গে বিপ্লবান্দোলন সম্বন্ধে যে সব আজগুবি গল্প এবং ভুল সংবাদ লোকের মধ্যে "ইতিহাস" নামে প্রচলিত রহিয়াছে তাহার নিরসন জন্য বিশিষ্ট কর্ম্মীদের নিকট হইতে লেখক স্বাক্ষরিত বিবৃতি গ্রহণ করেন। এইজন্য লেখক তাঁহাদের এইস্থলে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। বৈপ্লবিক ঐতিহাসিক তথ্য বিষয়ে লেখকের পূর্ব্বে-সহকর্ম্মী শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য্য যাহা লেখককে লিখিয়াছেন তাহাতেই এই ভুলের মূল ধরা পড়িবে।

৬০ বি ৫, কালীচরণ ঘোষ রোড,
কলিকাতা—২
১৫-১০-৪৭।

"ভাই ভূপেন—

তোমার চিঠি পেলাম...সত্যই অনেকে অনেক রকম কথা বলছে বা লিখছে যাহা সব সত্য নয়। আশা করি আমি অনেকটা সত্য সংবাদ দিতে পারবো। বারীনকে অনেক বার সত্য ব্যাপার জানিয়েছি—সে আমার কাছ থেকে লিখে নিয়ে গেছে। পূজার পর অর্থাৎ ২৫শে ২৬শে তারিখে আমায় একটা চিঠি দিও, তখন একটা স্থান, দিন ও সময় ঠিক করে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। ইতি -

তোমার—অবিনাশ"।

ইহার পর অবিনাশবাবু আমাকে এক বিবৃতি দেন। তৎপর লেখকের আর একজন সহকর্ম্মী ৺সতীশচন্দ্র বসু একটি বিবৃতি দেন। বাঙ্গলায় বৈপ্লবিক সমিতির প্রথম স্থাপনা বিষয়ে উভয় বিবৃতি বিশেষ মূল্যবান এবং মূলতঃ মিলও আছে। সতীশবাবুর বিবৃতি দ্বারা বাঙ্গলায় তথাকথিত "অনুশীলন" ও "যুগান্তর" সম্বন্ধে যে অদ্ভুত ভ্রম আছে তাহার নিরসন হইবে।

এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য কর্ম্মীদের বিবৃতি এবং পুস্তকের পাদ-টীকায় যেসব সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে তদ্দ্বারাই প্রমাণিত হইবে যে বিপ্লববাদ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জনকতক তরুণের উষ্ণমস্তিকপ্রসূত খাম-খেয়াল নয়, ইহার অন্তঃসলিলা রূপ বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রবাহিত হইতে-ছিল; ১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দে তাহা একটি বিশিষ্ট ধারায় আসিয়া একত্রিত হয়।

বাঙ্গলার বিপ্লববাদকে নিখিল ভারতীয় স্বাধীনতা প্রচেষ্টা হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তথাকথিত "সিপাহী মিউটিনি" হইতে এই

প্রচেষ্টা খণ্ডাকারে গুপ্তভাবে জাগিয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে—গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই প্রবাহ কংগ্রেসের আন্দোলনে কেন্দ্রীভূত ও অভিব্যক্ত হইয়া ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে "Quit India" (ভারত ছাড়) আন্দোলন হইয়া বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে ভারতের অতীত ইতিহাসে পর্য্যবসিত করে। তবে "পূর্ণ স্বাধীনতা" বা "মোকাম্মেল আজাদী" এখনও ভারতে আসে নাই; কিন্তু বাকী ব্যাপার অভিব্যক্তির পর্য্যায়ে সাধনসাপেক্ষ। ইহা সত্য বটে, গান্ধীজীর এবং অনেক বৈপ্লবিকের আদর্শ—"শ্রেণীহীন-সমাজ" (casteless and classless society) এখনও সুদূর পরাহত হইয়া রহিয়াছে কিন্তু তাহাও সাধনসাপেক্ষ। অথচ ইহা ধ্রুবসত্য যে জাতীয়তাবাদীদের কাম্য—বিদেশী-শাসনের অবসান, তাহা সফলতা লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমান সংস্করণে এই পুস্তকের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" রাখা হইল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীয় লেখকেরা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে যে আকারেই জগতের সম্মুখে ধরুক, বিদেশী ঐতিহাসিকেরা ইহাকে ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাই বলিয়াছেন। আর ভারতীয় বৈপ্লবিক, সাভারকার মহোদয় এই প্রচেষ্টার যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে ইহাকে *The First War of Indian Independence*" (ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সমর) বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইলে খণ্ডভাবে যে সব বৈপ্লবিক ধারা প্রবাহিত হইতেছিল তাহা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে কেন্দ্রীভূত হইয়া নিখিল ভারতীয় আন্দোলনে বর্দ্ধিত হয় এবং অবশেষে ১৯১৪—১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দেশ ও বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া জার্ম্মানী ও তুর্কি গভর্ণমেণ্টদ্বয়ের সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া "দ্বিতীয় স্বাধীনতা সমর" প্রচেষ্টাতে পরিণত হয়। প্রথম বারের ন্যায় এই প্রচেষ্টা দ্বিতীয়বার বিফল

হইয়াছে বলিয়া ইতিহাস হইতে ইহাকে বাদ দেওয়া যায় না। গোঁড়ামী এবং দলগত পক্ষপাত করিয়া এই প্রচেষ্টাকে ভারতের ইতিহাসে অস্বীকৃত করিয়া রাখিলে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কাছে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। সত্যের অপলাপ সম্ভব নয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে "ভারত-ছাড়" আন্দোলন এবং দ্বিতীয় স্বাধীনতা প্রচেষ্টার জেরস্বরূপ "আজাদ-হিন্দ-ফৌজ" রূপ প্রচেষ্টাও নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের Dominion status বিকটভাবে এই নিষ্ফলতাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের দেখাইতেছে। পুনঃ, বিপ্লবের নিষ্ফলতা এবং বিপ্লববাদের অসম্পূর্ণতাই ভারতকে খণ্ডীকৃত করিয়াছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস "বঙ্গ-ভঙ্গ" আন্দোলনই বাঙ্গলায় বৈপ্লবিক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা আংশিকভাবে সত্য; কারণ, বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিপুষ্টি সেই আন্দোলনের মধ্যেই হইয়াছিল; কিন্তু তাহার অসম্পূর্ণতা এবং নিষ্ফলতাই বর্ত্তমানে আবার "বঙ্গ-ভঙ্গ" করিয়াছে।

ইতিহাস একটি বিজ্ঞান। কেবল ভাব-প্রবাহের লিপিবদ্ধতাতেই ইহার পর্য্যাবসান হয় না। ইতিহাসের-দ্বন্দ্বজনিত-বস্তুতন্ত্রতার কার্য্যকারণ-সঞ্জাত ঘটনাগুলি দ্বারা ইতিহাস সৃষ্টি হয়। বাঙ্গলার বৈপ্লবিকদের মধ্যে খেয়োখেয়ী, ব্যক্তিগত কলহ বা বিদ্বেষ বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাস নয়। বাঙ্গলার যে সব বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস বাহির হইয়াছে তাহার বেশীরভাগগুলি নানাপ্রকার ব্যক্তিগত বড়াই, ব্যক্তিগত আক্রোশ, এবং উপদলগত পক্ষপাতপূর্ণ আখ্যানমাত্র। এইগুলির কোনটাই "ইতিহাসপদবাচ্য" নয়। আজকালও একপ্রকারের লেখা সংবাদপত্রে বাহির হয়। সেইসব লেখক জাহির করিতে চান, তাঁহারা যেন অতীত গুপ্তকর্ম্মের সর্ব্ব সংবাদ জানেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা বিপ্লবান্দোলনের ঐতিহাসিক। এই সব সবজান্তা লোকদের উদ্দেশ্য হইতেছে হয় ভূতপূর্ব্ব

একজন বৈপ্লবিক কর্ম্মীকে লোকচক্ষে হেয় করা বা কাহাকেও উত্তোলন করা। এইজন্য এই সব অজ্ঞাতনামা লোকেরা নানা উদ্দেশ্যে নানা অসত্য প্রচার করেন।

এই পুস্তকের বর্ত্তমান সংস্করণে যে নাম প্রদত্ত হইল, তদ্বারা আমরা সাধারণকে বুঝাইতে চাই যে, নন্দকুমারের সময় হইতে ভারত, বিদেশী কবল বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে তাহা প্রবলাকার ধারণ করিয়া সমূর্ত্ত হইয়াছে। সেইজন্য আজ এই স্থলে নন্দকুমার এবং তাঁহার সহকর্ম্মী বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম শহীদ জগমোহন দত্তকে ইংরেজ কবল-বিমুক্ত ভারতে শ্রদ্ধাঞ্জলির তর্পণ করিতেছি। তৎপর, রামমোহন রায়ের মনোগত আকাঙ্খাও আজ সফলতা লাভ করিয়াছে বলিয়া তাঁহাকেও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। পুনঃ, প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবৃন্দকে এইস্থলে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। আজ প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদদ্বয়—ব্যারাকপুরের মঙ্গল পাণ্ডে এবং বেন্দাসিংকে স্মরণ করিতেছি; আজ মনে পড়ে এই প্রচেষ্টার মস্তিষ্কস্বরূপ আজীমুল্লা খাঁকে, মনে পড়ে তাঁতীয়া তোপীকে—যাঁহার রণ-চাতুর্য্য ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল; মনে পড়ে ঝাঁসীর তরুণী লক্ষ্মীবাঈকে, যিনি বলিয়াছিলেন "মেরী ঝাঁসী নেহী দেবেঙ্গী" মনে পড়ে অযোধ্যার হজরৎ মহলকে, যাঁহার বিষয়ে করুণ গাথা লোকে নির্জ্জনে গাহিত—"মহল মহলমে বেগম রোয়ে, গলি গলি রোয়ে পাথেরিয়া"; মনে পড়ে আজ অশীতিবয়স্ক বীর কুমার সিংহকে, যাঁহার গাথা তাঁহার দেশবাসীরা নির্জন গ্রামাঞ্চলে ভয়ে ভয়ে গাহিত—"আগাড়ি চলে কুমার সিং পিছাড়ি অমর সিং......আঙ্গরেজ কহে এইসি লড়াই কভি দেখা নাই"; আর মনে পড়ে হিন্দু ও মুসলমানের সংযুক্তভাবে সম্রাটপদে নির্ব্বাচিত অন্ধ বাহাদুর শাহকে, যখন

স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়াশা নির্ব্বাপিত হইতেছে তখন এই ভরসার বাণী তিনি স্বদেশবাসীদের দিয়া গিয়াছিলেন :—

"গাজীওমে বু রহেগী যব তলক ইমানকি,
তব তক লণ্ডন তক চলেগী তেগ হিন্দুস্থান কি"।

(দেশ ভক্তদের মনে যতদিন দেশভক্তি দৃঢ়ীভূত থাকিবে, ততদিন লণ্ডন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর শক্তি ধাবিত হইবার আশা থাকিবে)। অত:পর মনে পড়ে পরের যুগের কর্ম্মী মারাঠা ফাডককে, শিখ গুরু কুকা এবং চাইবাসার হো নেতা বীরশা 'ভগবান'-কে। ইহারা যজ্ঞানলে নিজেদের পাঁজর জ্বালাইয়া স্বজাতিদের মুক্তির জন্য আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

আজ আরও মনে পড়িতেছে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সমরের শহীদদের, যাঁহারা দেশে ও বিদেশে ১৯১৫—১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্বীয় জীবন স্বাধীনতা যজ্ঞে আহুতিরূপে প্রদান করিয়াছেন; যেসব তরুণ শহীদদের অস্থিকঙ্কাল আজ বিদেশের মরুভূমিতে শুষ্ক হইতেছে, যে সব তরুণ স্বদেশে ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন দান করিয়াছেন তাঁহাদের স্মরণ করিয়া আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। তৎপর, ইহাদের পদাঙ্ক স্মরণ করিয়া যে সব তরুণ স্বদেশে পরবর্ত্তীযুগে স্বাধীনতার জন্য জীবন দান করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ করিয়া আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। শেষে, যেসব জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কর্ম্মীরা দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এইস্থলে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

হে ভারতবাসী! দলাদলি এবং পক্ষপাতের উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া স্মরণ কর, এইসব শহীদরাই তিল তিল করিয়া স্বীয় পঞ্জর প্রদান করিয়া নূতন মুক্ত-ভারতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। জয় হিন্দ্।

৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১০৫৬   শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম

অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস

(প্রথম খণ্ড)

আজকাল বঙ্গসাহিত্যে বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস চর্চ্চা হইতেছে। অনেকেই নিজের আখ্যায়িকা বা অভিজ্ঞতা মুদ্রিত করিতেছেন ' আমাদের সমসাময়িক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় ; নচেৎ ভবিষ্যতে ইতিহাস-রচনা দুষ্কর হইবে। বাস্তব-রাজনীতির অভিজ্ঞতার ফলে ইহা জানি যে, যাহা লোক-সমাজে রটে বা যাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় তাহাই ইতিহাস নহে। যথাথ তথ্য লোক-সমাজে বেশীর ভাগই অজ্ঞাত থাকে। ঐতিহাসিকেরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়াও অনেক সময় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। সেই জন্যই ভুল ঘটনা অনেক সময় ইতিহাস বলিয়া প্রচলিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার রাজনীতিক ইতিহাসে বৈপ্লবিক-আন্দোলন এক বিশেষ অধ্যায়। কিন্তু বঙ্গের বিপ্লবপন্থার ইতিহাস লিখিবার সময় এখনও আসে নাই অথবা লিখিবার সুযোগ নাই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া মুদ্রিত করিবার সময়ও নানা কারণে এখনও আসে নাই। এই সকল কারণে যথার্থ ইতিহাস লোক সমাজে দেওয়া যায় না। তবে আমি যাহা জানি তাহার কিয়দংশ এস্থলে সাধারণের সম্মুখে দিতে চাই।

স্বাধীনতা আন্দোলনের উৎপত্তি

বাঙ্গালার বিপ্লবপন্থা জনকতক অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকদের হুজুগের দ্বারা সৃষ্টি হয় নাই। বিপ্লববাদের ইতিহাসের উৎপত্তির কথা জানিতে হইলে, বাঙ্গালার বিগত ৮০ বৎসরের ইতিহাসের চর্চ্চা করিতে হইবে। বাঙ্গালার বিপ্লববাদের ইতিহাস বর্ত্তমান বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া যায় না; কারণ ইহা exotic নহে। ইহা বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের একটি স্তর মাত্র। (১) রামগোপাল ঘোষের সময় হইতে (নব্য বঙ্গের) ইয়ং বেঙ্গলের অভ্যুদয়। তৎপরে ব্রাহ্ম-সমাজের আবির্ভাব ও বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের চিন্তার উপর তাহার প্রভাব, রাজনারায়ণ বসুর (২) বৈপ্লবিক মত ও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় ও হিন্দু মহামেলা, (৩) 'নেশনেল পেপারের' সংস্থাপনা; 'নেশনেল থিয়েটারে' স্বদেশপ্রেম-মূলক নাটকসমূহের অভিনয়; তৎপরে হিন্দুধর্ম্ম পুনরুত্থান-কারীদের অভ্যুদয়; বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (৪) প্রভৃতির বৈপ্লবিক চেষ্টা ও তদনুসারে হুগলীর চারিদিকে লাঠিখেলার আখড়া-স্থাপনা; শিবনাথ শাস্ত্রীর দেশসেবার উদ্যম, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসুর বৈপ্লবিক চেষ্টা (৫) ও 'ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন' স্থাপনা ও শেষে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও কংগ্রেসের কার্য্য; শিশিরকুমার ঘোষের বৈপ্লবিক কল্পনা-জল্পনা; তৎপরে স্বামী বিবেকানন্দের আক্রমণশীল হিন্দুধর্ম্মের (Aggressive Hinduism) মতবাদ এবং শেষে বিপ্লববাদীদের দলস্থাপনা ও কর্ম্ম—এইগুলি বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের পরপর স্তর। একটাকে বাদ দিয়া অন্যটাকে ধরা যায় না। (৬)

যখন দুইটা সভ্যতা ও চর্চ্চা একত্র সংঘর্ষিত হয়, তখন তাহার ফলে একটা নূতন চর্চ্চা ও ভাবপ্রণালীর অভ্যুত্থান হয়। বাঙ্গালায় ইংরেজী-প্রভাব বিস্তৃত হইলে ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষণের ফলে এক নূতন চিন্তাস্রোতের ধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান ভারতের প্রেরিত পুরুষ রামমোহন রায় হইতেই ইহার সূচনা আরম্ভ হয়। তিনি ইউরোপীয় চর্চ্চার সংস্পর্শে আসিয়া ফরাসী-বিপ্লবের ও তাহার অগ্রগামী দূত 'এনসাইক্লোপিডিষ্টদের' ভক্ত হন। রামমোহন কিন্তু বৈপ্লবিক মতবাদ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রচার করেন নাই; কারণ বঙ্গে তখন রাজনীতির চর্চ্চা ছিল না। তবে তিনি তাহা ধর্ম্ম ও সামাজিকক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। এই বিপ্লববাদের প্রতিধ্বনি ব্রাহ্ম-সমাজে পৌঁছায় ও তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্রাহ্ম-সমাজ পরে এত চরমপন্থী হয় যে, তাহার ফলে তাহা সনাতন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আজ ইহা শুনিলে অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির প্রথম সম্প্রদায়ের অনেকের উপর বিশেষভাবে ছিল। তৎকালে একবার আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, বাছা বাছা বৈপ্লবিক কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত বা সমাজের ছায়াশ্রিত ছিলেন (১) এবং বর্ত্তমান ভারতের রাজনীতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিলে ইহা দেখা যায় যে, যে প্রদেশে ব্রাহ্ম-সমাজ, প্রার্থনা-সমাজ বা আর্য্যসমাজ (যে সব সমাজ বা পন্থা পুরাতন ধর্ম্ম ও সামাজিক মতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে অর্থাৎ যে সব জায়গায় একটা উদারনীতিক অথবা চরমপন্থী মতবাদ চলিয়াছে) একটা নূতন চিন্তাস্রোত আনিয়াছে, সেই সব জায়গায় আজ জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা-স্পৃহা বিশেষ প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বঙ্গে স্বাধীনতার স্পৃহা বিশেষভাবে জাগে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের বাঙ্গালা-সাহিত্যের খবর লইলে এই উক্তির

পোষকতা দৃষ্ট হইবে। বঙ্গে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের অগ্রে অনেকবারই বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতি স্থাপনা হইয়াছিল, (১) কিন্তু স্বাধীনতার স্পৃহা সর্ব্বজনীন না হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে এই সব সমিতি বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কোন্ শিক্ষিত বাঙ্গালী তৎকালে স্বাধীনতা মতবাদের আন্দোলন না করিত? বিশ্বস্তভাবে শুনিয়াছি, পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধুদের এই মতানুযায়ী কার্য্য করিতে বলিতেন। (২) অন্যান্য মনীষীদের কথা অগ্রেই বলিয়াছি। এই প্রকারে আমরা দেখি যে বাঙ্গালায় ব্যক্তিগতভাবে বা ক্ষুদ্র সমষ্টিগতভাবে বিপ্লববাদ ধারাবাহিকরূপে চলিতেছিল। অবশ্য দিনকতক কংগ্রেসের হুজুকে তাহা স্থগিত ছিল; কিন্তু যতদূর আমার স্মরণ হয়, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বৈপ্লবিক সমিতি বঙ্গে পুনঃস্থাপিত হয়। তাহার এক বৎসর অগ্রে এই অনুষ্ঠানের পূর্ব্বসূচনা হয় ও তাহাতে দুইজন বৈদেশিকের প্রভাব ছিল। (৩) কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সমিতি দৃঢভাবে স্থাপিত হয়।

সমিতি স্থাপন বিষয়ে পরিশিষ্টসমূহে সমস্ত তথ্য অবগত হওয়া যাইবে।

গুপ্ত সমিতি স্থাপন

এই সময়ের একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিব—শ্রদ্ধাস্পদ অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ একটি "আষাঢ়ে গল্প" দ্বারা বঙ্গে প্রচার করিলেন যে নর্ম্মদাকূলের সাধুরা যোগবলে স্থির করিয়াছেন যে, রাজপুতনার কোন সূর্য্য-বংশীয় কুলে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে বালক আছেন। তাঁহাকে দলপতি মানিয়া লইয়া একটা ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতি

স্থাপিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রে ইহার বিশেষ আড্ডা। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতব্যাপী বিপ্লব হইবে, কিন্তু কাপুরুষ বাঙ্গালী কিছু করিতেছে না, তাহাদিগকেও দলভুক্ত করিতে হইবে। উপরোক্ত গল্পটি আমি স্বকর্ণে ১৯০৩ বা ৪ সালে শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের মুখ হইতে শুনিয়াছি। অবশ্য এই গল্পের প্রথম ভাগটি আমরা হতভাগ্য নাস্তিক বাঙ্গালী যুবকের দল "গাঁজাখুরি" বলিয়া উড়াইয়া দিতাম; কিন্তু গল্পের শেষের ভাগটিই বাঙ্গালার ইতিহাসে বিশেষভাবে লীলা করে। যে সব বাঙ্গালী বরদা হইতে আসিয়াছিলেন সকলেই এই গল্পটি প্রচার করিতেন। ইহা তাঁহাদের একমাত্র পুঁজি ছিল। অবশ্য এ আষাঢে গল্পে বাঙ্গালী মাতে নাই, কিন্তু "কাপুরুষ বাঙ্গালী কিছু করিতে পারে না।" এই অপবাদ বাঙ্গালী যুবকদের দল সহ্য করিতে রাজী হইল না। সকলেই আমরা বলাবলি করিতাম যে, ভবিষ্যৎ স্বাধীন-ভারতের আম-দরবারে বাঙ্গালা যদি অন্ততঃ হাজার কতক সৈন্য লইয়া হাজির না হয় তবে বাঙ্গালার মুখ থাকিবে কোথায়? অবশ্য আমরা কেহ বিশ্বাস করিতাম না যে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বিপ্লব হইবে, কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে হুজুগ উঠাইবার জন্য কেহ কেহ এ গল্প প্রচার করিতেন। শেষে যখন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ আসিল তখন অনেক ছাত্র বলিল, "কই মহাশয়—বিপ্লব কোথায়—সব ভূয়া গল্প!" তখন এই গাঁজাখুরি গল্পটার একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইত যে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনই উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকারান্তর মাত্র। কিন্তু ফলে এই গল্পটা একটা কষ্টিপাথরের স্বরূপ হইল। যাহারা হুজুগে ছিল তাহারা হতাশ্বাস হইয়া সরিয়া পড়িল ও যাহারা এই মতকে ভালরূপে বুঝিয়াছিল তাহারা নাছোড়বান্দা হইয়া কার্য্য করিতে লাগিল।

উপরে বলিয়াছি যে, উপরোক্ত গল্পটির শেষভাগটি বাঙ্গালার ইতিহাসে

বিশেষ লীলা করে। "কাপুরুষ" বাঙ্গালীকে এ অপবাদ ক্ষালন করিতে হইবে, ইহাই বাঙ্গালীর বিশেষ ঝোঁক হইল। সেই জন্যই বাঙ্গালায় লাঠি খেলা, কুস্তি করা, বন্দুক ছোঁড়া ইত্যাদির আখড়া নানাস্থানে স্থাপিত হইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রসায়নবিদ্যার চর্চ্চাও বিশেষভা ব হইতে লাগিল। পরে ১৯০৩ কি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে "কাপুরুষ" বাঙ্গালীরা এক বীরবর মহারাষ্ট্রীয়কে "বোমা" খরিদ করিবার জন্য টাকা দেন। (১) তিনি বলেন যে, দক্ষিণাপথ হইতে এ অস্ত্র তিনি আনিবেন ও ছুঁড়িবার লোকও আনিবেন। কিন্তু তিনি টাকা লইয়া হাওড়া স্টেশনে যে গাড়ী লইলেন সেই অবধি কেহ তাঁহাকে আর দেখিল না। হায় রে কাপুরুষ বাঙ্গালী ও বীর দক্ষিণী! তৎপরে বাঙ্গালার ইতিহাস সপ্রমাণ করিয়াছিল যে, "উল্টা সমঝলি রাম।"

বাঙ্গালার "বোমার" প্রথম অধ্যায় এইখানেই শেষ। কিন্তু বাঙ্গালীর মনে চিরকালই বাঙ্গালীর বিশেষত্বভাব জাগিতেছিল। বাঙ্গালী নিজের ভাবে, নিজের মতে কাজ করিবে ইহাই তাহার বিশেষত্ব। পরে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন আসিল। ইহাতে বৈপ্লবিকদের কাজের সুবিধা হয়। এই সময় বাঙ্গালী কেন ২।১ জন অত্যাচারী রাজপুরুষদের মাথা ভাঙ্গে নাই—ইহা লইয়া কোন কোন অ-বাঙ্গালী ভারতবর্ষীয় রাজনীতিক পাণ্ডা আমাদের টিটকারী দিতেন (২)। ইহা আমরা তখন সহ্য করিয়াছিলাম; কারণ আমাদের কাজ আমরাই জানি ও পরের কাছে জবাবদিহিতে রাজি নই।

কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বোমার আবির্ভাব হয়। বাঙ্গালায় বোমার আবির্ভাবের দুইটী প্রধান কারণ ছিল। (ক) বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ (emotional), কল্পনাপ্রিয় (imaginative) জাতি। ইহা কোন জাতির ভাল কি মন্দ লক্ষণ তাহা জানি না; কিন্তু জানি, বাঙ্গালী

এক দিকে যেমন হুজুগে, তেমনি অন্য দিকে কাজে চটপটে এবং বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া পৃথিবীর চারিদিকে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে। এই জন্যই বাঙ্গালার উদ্যম চাপা রাখা যায় না। এই কারণেই অন্যান্য দেশের ইতিহাস আমাদের অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। আমাদের মধ্যে সকলের ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস জানা ছিল না, কিন্তু ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডির জীবনী ভালভাবে জানা ছিল। ম্যাটসিনির আত্মজীবনীর প্রথম ভাগ আমাদের ধর্ম্মপুস্তক ছিল (১), (মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিবেন বাঙ্গালী আনন্দমঠের (২ জাতি কিনা? ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?) তৎপরে রুষীয় বৈপ্লবিকদের কার্য্যকলাপ আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিতাম। (খ) নিরস্ত্র স্বদেশ-প্রেমিকতার পক্ষে জাতীয় অবমাননাকারী ও অত্যাচারীকে দণ্ড দিবার অন্য রাস্তা নাই এবং একটা কাপুরুষ জাতিকে জাগাইয়া তুলিবার অন্য উপায়ও তখন ছিল না। কাপুরুষ বাঙ্গালীকে অন্যান্য প্রদেশকে টেক্কা দিয়া কাজ করিতে হইবে। ইহাও আমাদের একটা জিদ্ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সব কারণ একত্রিত হইয়া বোমার আবির্ভাব করিয়াছিল। এককথায়, ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে, কংগ্রেস আবেদন ও নিবেদনের পন্থা দ্বারা দেশের লোকের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই বিনষ্ট মনুষ্যত্বকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য 'বিষস্য বিষমৌষধম্' দরকার। সেই জন্য বৈপ্লবিকদলের লোক দৃঢ়সংকল্প হইল যে, সাহস দেখাইয়া, আত্মজীবন ত্যাগ করিয়া ও অত্যাচারীকে দণ্ড দিয়া দেশে স্বাধীনতার স্পৃহা ও সাহস জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

বোমা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত মস্তিষ্কের খেয়াল বা পাগলামি নহে এবং ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলও নহে। অনেকেই এ বিষয়ে ভাবিতেছিলেন, এবং ইহার আবির্ভাবও সমষ্টির কার্য্যের ফল। ভারতে বোমার আবির্ভাব বাঙ্গালীর মানসিক ক্রমবিকাশের ফল। বাঙ্গালীর মনস্তত্ত্ব রাজা

রামমোহন রায় হইতে স্তরে স্তরে চরম পন্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যদি বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সামাজিক পরিবেশে চরম পন্থার অভ্যুদয় না হইত, তবে হয় ত বাঙ্গালায় বোমারও আবির্ভাব হইত না। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ বলিয়া তাহার মন চরমপন্থার দিকে দৌড়ায়। তৎপরে যে-প্রকারে বাঙ্গালীর শিক্ষা স্তরে স্তরে উঠিতেছে, বাঙ্গালীর রাজনীতিক ব্যারোমেটারও সেই প্রকারে উঠিতেছে। বাঙ্গালীর সমালোচকেরা তাহাকে কেবল অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী বলিয়া গালি দেয়, কিন্তু উপরোক্ত সত্যটা তাহারা বুঝে না। আমেরিকায় একজন খৃষ্টান মিশনারি (১) (যিনি ভারতে জন্মিয়াছেন) আমাকে একবার ধমকাইয়া বলিয়াছিলেন—"কেবল বাঙ্গালীরাই ইংরেজ-বিদ্রোহী ও ইংরেজের বিপক্ষে চীৎকার করিতেছে, ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেরা কিন্তু সন্তুষ্ট আছে!" এই তিরস্কারে আমি না চটিয়া কেবল হাসিয়া জবাব দিয়াছিলাম যে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে এককালে এক মহাসমস্যা ছিল—বিখ্যাত "মহান" ফরাসী-বিপ্লব ইউরোপের অন্যান্য দেশে না ঘটিয়া ফ্রান্সে কেন ঘটিল? বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা ইহার উত্তর পাইয়াছেন। তৎকালে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্স অতি উচ্চশিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল; যে কারণে ইউরোপের অন্যান্য দেশ ছাড়িয়া ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, সেই কারণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ছাড়িয়া বাঙ্গালায় রাজনীতিক গোলমাল ঘটিতেছে। মিশনারি মহাশয় ইহার আর জবাব দিতে সাহস করিলেন না।

সাধারণের বিশ্বাস, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালায় বিপ্লবপন্থীর গুপ্ত-সমিতির আবির্ভাব হয়। ইহা একটা ঘোর ভুল ধারণা। অগ্রেই বলিয়াছি যে, স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে বঙ্গে বিপ্লববাদী গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। (২) বিপ্লববাদ বঙ্গভঙ্গের দরুণ আন্দোলনের ফলে

আবির্ভাব হয় নাই। ইহা বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষা ও রাজনীতিক জীবনের অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশের ফল। বিগত ৭০ বৎসর ধরিয়া উচ্চশিক্ষার ফলে বাঙ্গালীর রাজনীতিক জীবনের সুর পর্দায় পর্দায় চড়িতেছে। বিপ্লববাদ ও বোমা তাহারই ফল এবং আজ যে জনকতক বাঙ্গালী বিপ্লববাদী কমিউ-নিজমের সুর ধরিয়াছেন ইহা এই প্রতিক্রিয়ারই ফল। স্বদেশী আন্দোলন বিপ্লববাদের সৃষ্টি করে নাই; বরং মফঃস্বলে স্বদেশী আন্দোলন বিপ্লববাদীদের দ্বারাই পরিচালিত ও পরিপোষকতা প্রাপ্ত হইত। স্বদেশী আন্দোলনের বেগ ও বৃদ্ধি বিপ্লববাদী সমিতির সাহায্য দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলন কেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও কংগ্রেসওয়ালাদের বক্তৃতার গরমে কৃতকার্য্য হয় নাই; বরং প্রত্যেক জায়গায় বিপ্লববাদীরা কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া স্বদেশী আন্দোলনকে পরিচালিত করিতেন ও তাহাকে কৃতকার্য্য করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বিপ্লববাদীদের কার্য্যে সুবিধা হইয়াছিল। সমিতির শাখা ও সভ্যের সংখ্যা চারিদিকে বিশেষভাবে বিস্তারিত হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের শেষাশেষি "আসমুদ্র হিমাচল" সমগ্র বঙ্গে বিপ্লববাদী সমিতি তাহাদের শাখা স্থাপনা করিয়াছিল। কোন শ্রেণীর লোক (চাষা-মজুর ছাড়া) এই সমিতির সভ্য না হইয়াছিল? খেতাবওয়ালা জমিদার হইতে কিশোরবয়স্ক ছাত্র পর্য্যন্ত সমস্ত স্তরেরই লোক আমরা দলে পাইয়াছিলাম।

বিপ্লবপন্থীর দল কেবল কতকগুলো "বকাটে" অর্দ্ধশিক্ষিত ছেলের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত করা হয় নাই। "বকাটে" লোককে দলভুক্ত করাই হইত না। শারীরিক ব্যায়াম, বিদ্যাচর্চ্চা, নৈতিক সংযম, জীবনের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। আদর্শ অতি উচ্চ করিয়া ধরা হইয়াছিল বলিয়াই অনেক ভাল ছেলে দলভুক্ত হইয়াছিল।

ইহাদের আত্মত্যাগ, সাহস, চতুরতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা ও স্বার্থত্যাগ জগতে অতুলনীয়। বঙ্গের জনসাধারণ ইহাদের বিষয় জানে না। ইহাদের আত্মত্যাগের জীবনী ইটালী, রুষ বা অন্যান্য দেশের উৎকৃষ্ট বৈপ্লবিকদের জীবনীর সহিত তুলনীয়।

ভারতীয় বিপ্লবপন্থীরা বা কংগ্রেসওয়ালারা কোন দলই নিজেদের মতানুযায়ী দর্শনশাস্ত্র এখনও গড়িয়া তুলেন নাই। (১) আমাদের রাজনীতিক জীবনের দর্শনশাস্ত্র হইতেছে—হুজুগ ও নকল। স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের অভাব ভারতবর্ষে নাই কিন্তু আমরা এখন পর্য্যন্তও কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না, তাহার কারণ আমাদের ভিত্তি কাঁচা রহিতেছে। কি চাই, কাহার জন্য চাই, কেন চাই, কি প্রকারে পাইব, কি পাইব ও কে পাইবে—এসব কথায় আমরা চিরকালই গোলে-হরিবোল দিই। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে দেখি যে, আমাদের মজ্জাগত যে জাতীয় দোষ Abstraction ও অস্পষ্টতা আছে, তাহা ছাড়া আর একটি বিশেষ অভাব বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যহ অনুভব করিতেছি। বড় বড় মস্তিষ্কশালী চিন্তাশীল ব্যক্তি এখনও বিপ্লববাদ বা অন্য কোন প্রকারের রাজনীতিবাদে অবতীর্ণ হন নাই। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক বুদ্ধিমান, নামজাদা, মহৎ অন্তঃকরণ ও মহানুভব ব্যক্তি আছেন সত্য, কিন্তু বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার ভারতের সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি-তত্ত্বের সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না বা পারিবেন না। ইহাও ঠিক যে, এ ব্যাপারটা কিছু সোজা নয়। বর্ত্তমান সময়ের (৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন একটা সামঞ্জস্য সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে এবং একটি রাজনীতিক দর্শনশাস্ত্রও লোকসমাজে খাড়া করিতেছে, কিন্তু এই দর্শনও নূতন নহে; ইউরোপ হইতে আমদানি করা অসহযোগ আন্দোলনপন্থা হিন্দুর অবতার-বাদের উপর স্থাপিত করিয়া বর্ত্তমান

অসহযোগিতাবাদকে খাড়া করা হইয়াছে। (১) এই মতবাদকে বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত করিবার চেষ্টা হইতেছে না ; ভারতীয় রাজনীতিতত্ত্বকে সমাজ ও অর্থনীতি-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহা না হইলে শেষে সবই ধুঁয়ায় পারণত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাঙ্গালায় প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর লোককে আমরা দলে পাইয়াছিলাম। ইহার ফলে এই সামাজিক ভাবটা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম যে, জাতীয় কর্ম্মে সকলেই সাম্যভাব অবলম্বন করিতে ও জাতিভেদ-প্রসূত অনিষ্টকর ছুৎমার্গ মানিতেন না অর্থাৎ এতকাল ধরিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ উপদেশ ও প্রচার দ্বারা যাহা বাঙ্গালাদেশে আনিতে পারে নাই, জাতীয়তার নামে ও কর্ম্মে তাহা আপনিই আসিয়াছিল। এই স্থানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে তাহা উদারতা অর্থাৎ এই জাতীয়তার মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া নবভাবে মাতোয়ারা নব্যযুবকদের অহিন্দুয়ানীও গোঁড়া হিন্দুরা সহ্য করিতেন এবং নব্য যুবকেরাও গোঁড়াদের মান্য করিতেন। এই সমস্ত শুভ লক্ষণ দেখিয়া আমাদের স্পষ্ট ধারণা হইয়াছিল, সমাজ-সংস্কারকেরা এতদিনের আন্দোলনের ফলে যাহা সফল করিতে পারেন নাই স্বাধীনতার নামের গুণে তাহা আপনা-আপনি আসিয়া যাইবে। এইজন্য স্বাধীনতাবাদীদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর আপনা হইতে সমাজ-সংস্কার হইবে। স্বাধীনতাকামীরা রাজনীতির সংস্কার করিতে বাহির হইয়াছিলেন। সেইখানেই তাহার সঙ্গে যাহা কিছু বিবাদ ও বাধা ছিল। "পুতুল-পূজা", বিধবা বিবাহ বাল্য-বিবাহ ভাল কি মন্দ, এগুলি উঠিয়া যাওয়া উচিত কি অনুচিত— এ সকল কথা লইয়া স্বাধীনতাবাদী সম্প্রদায় মাথা ঘামাইতেন না এবং সেইজন্য তাঁহাদের কাজের পথেও সুবিধা হইয়াছিল।

স্বদেশী যুগের সময় হইতে ন্যাশন্যালিষ্টদের ভাব প্রকট হইতে আরম্ভ

হইয়াছিল এবং বয়কট এই ভাব আনিয়া দেয় "my country right or wrong (ভাল হোক মন্দ হোক আমার দেশ) এই উৎকট ভাবটি ক্রমে ক্রমে সকলের মনে বসিতে লাগিল। জাতীয়তাবাদ আর্য্যামি বা গোঁড়া হিন্দুয়ানিতে পরিণত হইয়াছিল। ভ্যালেনটাইল চিরল তাঁহার, 'ইণ্ডিয়ান আনরেষ্ট' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন, 'হিন্দু স্বাধীনতাবাদীদের হিন্দু জাতীয়তাবাদ উদ্দেশ্য'— ইহা নেহাৎ মিথ্যা উক্তি নহে। বঙ্গীয় স্বাধীনতা বাদীদের মধ্যে অনেকেই গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং এক্ষণেও অনেকে আছেন। আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, এই সময় এমন অনেক ব্রাহ্ম যুবক আমাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন যাঁহাদের কেহ কেহ আবার সনাতন হিন্দু হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা জাতব্রাহ্ম হইলেও সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্মসমাজে একঘরে হইয়া থাকিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ইহাও জাতীয়তাবাদের ফল অর্থাৎ ভারতীয়-জাতীয়তা তখন হিন্দুধর্ম্ম পুনরুত্থানকারীদের ছায়ায় আসিয়া আর্য্যামী ও হিন্দুজাতি পুনরুত্থান মতবাদেই পরিণত হইয়াছিল (১)।

প্রথমে আমাদের দলে মুসলমান সম্প্রদায়ের ছেলে লওয়া হইত (২), কিন্তু এ সময়ে জনকতক ছাড়া মুসলমান বিপ্লববাদী বেশী পাওয়া যায় নাই। কিছুদিনের জন্য মুসলমান সভ্য লওয়া বন্ধ করা হইয়াছিল, কিন্তু শীঘ্র আবার লইবার হুকুম হইয়াছিল। তবে পরস্পরের স্বাভাবিক অবিশ্বাসের জন্যই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, পরে মুসলমান সভ্য আর পাওয়া যায় নাই। মুসলমান সমাজ তখন পর্য্যন্তও বিপ্লববাদের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। পরে ব্রাহ্মসমাজের লোকও পাওয়া যায় নাই। কাজেই বিপ্লববাদ সনাতনী হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যেই অনেকেই আবার হিন্দুধর্ম্মপুনরুত্থানকারীর দলে ছিলেন ;

কাজেই বিপ্লববাদ হিন্দু-জাতীয়তায় পরিণত হইল। এইজন্য মুসলমান বিপ্লববাদীরা বলেন যে, হিন্দুরা প্রথমে তাঁহাদের বিশ্বাস করিতেন না; তাঁহারা 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' প্রচার না করিয়া 'হিন্দু-জাতীয়তাবাদ' প্রচার করিতেন। (১)

বিপ্লববাদ বঙ্গে ধর্ম্মের আকার গ্রহণ করে। নৈষ্ঠিক লোক যে প্রকার ধর্ম্মের মতবাদ হইতে নড়চড় হয় না ও তাহার জন্য আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত, বিপ্লববাদও বঙ্গে সেই প্রকার আকার ধারণ করে। কোন একটা মতবাদের সঙ্গে ধর্মীয় গোঁড়ামী না থাকিলে স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগ করা যায় না। বঙ্গে যে সব যুবক স্বাধীনতার পথিক হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উপরোক্ত বিশেষত্ব ফুটিয়াছিল। তাঁহারা মনে স্থির ধারণা করিয়াছিলেন যে, ভারতের মঙ্গল সাধনের পক্ষে তাঁহাদের পন্থাই একমাত্র উপায় ও ইহার জন্য তাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই সমস্ত সদ্গুণ থাকিবার জন্য মুষ্টিমেয় যুবকের দল বাঙ্গালায় আগুনের হল্কা বহাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। বিপ্লববাদের প্রথম দলের কর্ম্মীরা সকলেই নিজেদের বিশ্বাসের জন্য অত্যাচারিত ও প্রপীড়িত হইয়াছিলেন এবং কেহ বা কারাগারে বদ্ধ, কেহ বা ফাঁসীকাষ্ঠে নষ্টপ্রাণ ও কেহ বা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। আসল কথা, আমাদের দলের জনকতক মাত্র জেল খাটেন নাই; কারণ তাঁহারা সেই সময় বিদেশে ছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ বিদেশের কারাগারে বাস করিয়াছেন ও কেহ কেহ এখনও নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতেছেন।

কিন্তু বাঙ্গালী কাপুরুষ জাতি বলিয়া অপবাদগ্রস্ত। আসল কাজের বেলায় দেখা গিয়াছিল যে কাপুরুষ বাঙ্গালীর মধ্য হইতেই যথার্থ বীর পাওয়া যায়। একটি মহৎ আদর্শ জাতির সম্মুখে ধরিলে ও তাহার দ্বারা উত্তেজিত বা উন্মত্ত করিতে

পারিলে সাধারণ লোকে নিজেরাই আত্মত্যাগ করিবে। সকলেই প্রফুল্ল চাকি (১) ও ক্ষুদিরাম বসু এই দুই বীর বালকের নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু এই প্রকার শত শত ত্যাগী বালক ও যুবক বাঙ্গালায় আছে। জামালপুরের হাঙ্গামায় যে ১৭ বৎসরের বালক সুধীর (২) এক ভাঙ্গা বন্দুক হাতে লইয়া মন্দিরের ভিতর রক্ষার জন্য আনীত হিন্দু মহিলা ও শিশুদের প্রাণ, ধর্ম্ম ও সতীত্ব, সমস্ত রাত্রি ইংরেজ পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পরিচালিত ২০,০০০ উন্মত্ত মুসলমান জনতার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল তাহার নাম কয়জন জানে? বর্ত্তমান সময়ের প্রথম বাঙ্গালী সৈনিকের নাম আজ পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট অজ্ঞাত। লোকে এক তথাকথিত সুরেশ বিশ্বাসের নাম শুনিয়াছে। ভারতের বাহির হইতে আমরা জনকয়েক ব্রেজিলিয়ান কন্সাল ও তথাকার লোকের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের নিকট বিশ্বাসের নাম অপরিচিত, কেহ কেহ বলেন বিশ্বাস ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার বংশ এখনও ব্রেজিলে আছে। আমাদের দল হইতে এক যুবক (৩ ইউরোপীয় এক বিখ্যাত দেশের সৈন্যশ্রেণীতে পাঁচ বৎসর ছিলেন ও পৃথিবীর নানা স্থানে সৈনিক হইয়া কৃতিত্বের সহিত কর্ম্ম করিয়াছেন। তৎপরে রাজনৈতিক কার্য্যে যে সব যুবক আশ্চর্য্য সাহস ও কৌশল দেখাইয়া স্থানে স্থানে প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত করিয়াছেন তাঁহাদের নাম, চরিত্র, আত্মত্যাগ ও কার্য্যকলাপ জগতে অবিদিত। (জগতে তাঁহাদের কপালে 'ডাকাইত" এই কলঙ্কের রেখা খোদিত হইয়া রহিল।) সুশীল সেনের (৪ সাহস ও শোচনীয় পরিণামের কথা, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (৫) সাহস, কীর্ত্তিকলাপের কাহিনী বাঙ্গালায় কয়জন জানেন? এই সব শিক্ষিত যুবক যে প্রকার সাহস, চতুরতা ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। যদি প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে বা রণক্ষেত্রে তাঁহাদের জীবনের কার্য্য বিকশিত

হইতে পারিত তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশ জগতের সম্মুখে এক আদরণীয় স্থান অধিকার করিত। বাঙ্গালায় স্বাধীনতাবাদীদের চরিত্রের আদর্শ অতি উচ্চ করিয়া ধরা হইয়াছিল বলিয়াই এই ভীতু বাঙ্গালী যুবকেরা প্রাণটি তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিল। ইহাদের যদি রণবিদ্যায় বিশারদ করা যাইত তাহা হইলে জগতের সম্মুখে একবার রণকুশল-বাঙ্গালী সৈনিকের কৃতিত্ব দেখান যাইত।

রাজনীতিক ডাকাইতি করিয়া বৈপ্লবিক কর্ম্মের জন্য অর্থসঞ্চয় করিবার মতবাদ বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতিতে প্রথম হইতেই ছিল। আমি যখন এই সমিতিতে যোগদান করি তাহার পূর্ব্বেই এ মতটা পাকাপাকিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কারণ দেশের লোকে টাকা দেয় না। দুই-চারজন ব্রিফলেস ব্যারিস্টার, যাঁহারা নেতাগিরি করিতেন, তাঁহারাই কিছু কিছু সাহায্য করিতেন; কাজেই স্থির হইল, ইংরেজের টাকা কাড়িয়া লও। কিন্তু স্বদেশী-যুগের পর যখন রাজনীতিক ডাকাইতি আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল যে, ডাকাইতি কেবল দেশের লোকেরই উপর হইতে লাগিল। কারণ, বোধ হয়, ইংরাজের বা গভর্ণমেণ্টের উপর ডাকাইতি করা তত সোজা নয়, নিরস্ত্র দেশের লোকের উপর করা যত সোজা।

বঙ্গে রাজনীতিক ডাকাইতির ইতিহাস এক 'মেলো ড্রামার' অভিনয়। ইহা বঙ্গেই সংঘটিত হইতে পারে। বাঙ্গালা আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীর দেশ। সেই অভিনয়ই বঙ্গে পুনঃপুনঃ হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, বাঙ্গালায় যে শেষ রাজনীতিক ডাকাইতি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল তাহা ত্রিশ জন ১৬।১৭ বৎসরের বালকদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি, তাহারা ছিপে করিয়া দিন-দুপুরে প্রকাশ্যে এক গ্রামে গিয়া সেই জায়গায় বাজারে, যেখানে বারোয়ারীর যাত্রা হইতেছিল সেইখানকার দুইশত, আড়াইশত শ্রোতা-সম্বলিত দলকে ঘেরোয়া করিয়া লুঠ করিয়া চালয়া

আসিয়াছিল। এবং ইহাও শুনিয়াছি যে, হিন্দুর বাটিতে ডাকাইতির সময় গৃহস্থেরা ভয়ে সব বাহির করিয়া দিয়াছে, আর মুসলমানদের বাটিতে ডাকাইতির সময় রক্তপাত হইয়াছে।

ডাকাইতি বা গুপ্ত-হত্যা বীরত্বের লক্ষণ নয়। বীর জাতিরা এই সব উপায় অবলম্বন করে না, তাহারা সম্মুখ যুদ্ধ করে। বাঙ্গালা ডাকাইতির দেশ; সেই জন্যই রাজনৈতিক ডাকাইতির হুড়াহুড়ি হইয়াছিল। ইহার ফলও শোচনীয় হইয়াছিল। ইহার জন্য নিজেদের মধ্যে দলাদলি হয় এবং দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহাদের নিকট টাকা লুকাইয়া রাখা হইত তাঁহারা গচ্ছিত অর্থ অনেক স্থলে আত্মসাৎ করিয়াছেন।

ডাকাইতি লইয়া বঙ্গে দলাদলি ছিল। আমার বোধ হয় কোন কোন লোকের কাছে ইহা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় পরিণত হইয়াছিল। এই সব দলের লোক বলিয়াছেন যে, মহাশয় যেদিন একটা ডাকাইতি বা হত্যা হইয়াছে তার পরেই সেই স্থানে হুড়হুড় করিয়া দলে সভ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। শেষ কালে এই সব বিভিন্ন দল ভাল যুবক সংগ্রহ করিবার দিকে নজর না দিয়া কেবল মাত্র সভ্য শ্রেণী বাড়াইবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন। সেই জন্যই যতসব হুজুগে ছোকরা দলে লওয়া হইয়াছিল। ফলে ১৯১৬—১৭ খৃষ্টাব্দে ধর-পাকড়ের সময় অনেক ছেলে ধরা পড়িলেই সব গুপ্তকথা বলিয়া দিত। শেষাশেষি বোধ হয় বেশীর ভাগই বাজে সভ্য লওয়া হইয়াছিল।

যে প্রকারে ভারতের রাজনৈতিক চর্চ্চা পরিচালনার কেন্দ্র রাজা-রাজড়ার হাত হইতে সরিয়া ক্রমশঃ জনসমূহের নিকট যাইতেছে, সেই প্রকারে বাঙ্গালার স্বাধীনতাপন্থার নায়কত্ব ও পৃষ্ঠপোষকত্ব ব্যারিস্টার, জমিদার, উকিল ও মধ্যবিত্ত লোকের হাত হইতে বাহির হইয়া ছাত্রবৃন্দের

হস্তে ন্যস্ত হইতেছে। আমাদের সময়ে সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তি হইতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক ও ছাত্রগণ সকলেই এক স্বাধীনতা মন্ত্রে গ্রথিত হইয়া কার্য্য করিতেন। কিন্তু যখন বোমা ও সন্ত্রাসবাদের আবির্ভাব হইল তখন হইতে উপরের স্তরের লোক ক্রমশঃ স্বাধীনতার আন্দোলন হইতে চলিয়া যান বা গা ঢাকা দেন। সুতরাং সমস্ত কার্য্য ছেলেদের হস্তে ন্যস্ত হয় এবং সেইজন্যে স্বাধীনতাবাদ বঙ্গে ছাত্র আন্দোলন (Students' movements) হইয়াছিল। গণসঙ্ঘ কখনও বৈপ্লবিকদের হাতে আসে নাই। তাহাদের কি উপায়ে হাতে লইতে হইবে তাহা আমরা জানিতাম না, পরবর্ত্তীরাও জানিতেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গীয় বৈপ্লবিক দলে দলাদলি ছিল। শেষাশেষি ইহারা তিন দলে বিভক্ত হন: (১) উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। ভারতের বাহিরে যখন আমি কোন বিপ্লববাদীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "এত দলাদলি কেন হইল এবং কি করিয়া বাঙ্গালায় হইল?" তাহাতে সেই ভদ্রলোকটি উত্তর দিয়াছিলেন, "ইহা আপনারাইত করিয়া ছিলেন।" কথাটা এই, আমাদের সময়ে একটি বঙ্গব্যাপী দলই ছিল কিন্তু স্বনামধন্য নেতাদের দোষে ঘনিষ্ঠভাবে ইহা কেন্দ্রীভূত হইতে পারে নাই। কারণ, কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা লইয়া মতভেদ ছিল। বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র। মিত্র মহাশয় ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু। তিনি ইংরাজীতে উত্তমরূপে লিখিতে ও বলিতে পারিতেন, তত্রাচ কংগ্রেসে গিয়া গলাবাজি করিয়া নামার্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার কখনও ছিল না। কংগ্রেসে চেঁচাইয়া দেশ-বিখ্যাত "নেতা" হইবার সুবিধা তাঁহার বিশেষই ছিল, কিন্তু তিনি বক্তৃতা দেওয়াকে বিশেষভাবে ঘৃণা করিতেন এবং কখনও আবেদন-নিবেদনকারীদের রাজনীতির সহিত মিশেন নাই। তিনি প্রথমাবস্থায়

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও অন্যান্যের সহিত বৈপ্লবিক-সমিতি স্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন। (যখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মানহানির মোকদ্দমায় জেলে নিক্ষিপ্ত হন তখন তাঁহার বৈপ্লবিক বন্ধুরা তাঁহাকে এই উদ্দেশ্যে বরিশালে পাঠাইয়াছিলেন যে তথায় বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিয়া বহুসংখ্যক লোক সমেত কলিকাতায় আসিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জেল ভাঙ্গিয়া নিষ্কৃতি দিবেন। তিনি বলেন যে, এজন্য বরিশালে লোক ও প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কলিকাতার নেতারা প্রতিশ্রুতি (Sign) দিলেন না। উদ্যম অঙ্কুরেই নষ্ট হয়! তিনি আক্ষেপ করিতেন যে তাঁহার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা পূর্ব্বে বহুবারই বিনষ্ট হইয়াছে। এইবার তাহা স্থায়ী ও ফলবতী হইল)। যখন তাঁহার সমসাময়িকেরা সকলে কংগ্রেসে গিয়া গলাবাজি করিতে লাগিলেন, একমাত্র তিনিই এ বঙ্গে 'শ্মশান জাগাইয়া' রাখিয়াছিলেন। ইহার মত ছিল যে, লাঠি, ফুটবল খেলা বক্সিং ও কুস্তি করা বাঙ্গালী যুবকদের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহা আমরাও মানিতাম, কিন্তু তাহা লইয়াই কেন যে আমাদের চিরকাল পড়িয়া থাকিতে হইবে ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। আমাদের মধ্যে কনকতক প্রচার কর্ম্মের উপর বিশেষ জোর দিতেন। ফলে কলিকাতায় দুইটি দল হইল, যদিচ মিত্র মহাশয় সকলকার উপর সভাপতি ছিলেন। এই বিভাগ যুবকদের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনী শক্তির নিয়মে সংঘটিত হয়। যাঁহারা প্রচারে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা একত্রিত হইলেন এবং ইহাদের সঙ্গে 'আত্মোন্নতি সমিতি' রাজনৈতিক কার্যে সহকারিতা করিত। "যুগান্তর" কাগজ ইহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত। বাহিরে রহিল পি. মিত্রের পরিচালিত অনুশীলন সমিতি (১)। এই সমিতি প্রচার কর্ম্ম না করিয়া কেবল লাঠিখেলা ও কুস্তির দিকে নজর রাখিত। এই সমিতি সভাপতি মহাশয়ের প্রিয় ও পৃষ্ঠপোষিত ছিল। তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গকে এই সমিতিকে সাহায্য করিতে অনুরোধ

করিতেন। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা বলি। যখন আমরা কাহারও নিকট হইতে একপয়সাও সাহায্য পাইতেছিলাম না এবং অর্থের অভাবে আমাদের কার্য্য প্রায় দেড বৎসর বন্ধ ছিল, যখন আমরা সব "ঘরের খাইয়া বনের মহিষ" তাডাইতেছিলাম এবং বৈপ্লবিক কার্য্যকে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলাম সেই সময় একবার ৺দেবব্রত বসু ও আমি খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ৺চিত্তরঞ্জন দাসের (ইনি প্রমথ মিত্রের বন্ধু ও প্রথমে তাঁহার দলের লোক ছিলেন। বৈপ্লবিক সমিতির স্থাপনকালে তিনি জয়েন্ট ভাইস-প্রেসিডেন্ট হইযাছিলেন) নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য গিয়াছিলাম। তিনি স্বীকার করিলেন যে, সভাপতি মহাশয়ের নিকট অর্থ দিবেন। (১) পরে একদিন আমাদের সম্মুখে সভাপতি মহাশয়কে তিনি তিরিশ টাকা দিলেন এবং সেই টাকা তৎক্ষণাৎ সভাপতি মহাশয় অনুশীলন সমিতিকে তাহার ঘর ভাডার জন্য দিয়া দিলেন। আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে টাকাটা জোগাড করিলাম তাহা আমাদের হাত হইতে ছোঁ মারিয়া অন্যলোকে লইয়া গেল, ইহা দেখিয়া আমরা হতভম্ব হইয়া গেলাম। ইহা হইতে সভাপতি মহাশয়ের সাথে আমাদের অপরোক্ষভাবে বিবাদ। আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলাম; তিনি নামেমাত্র আমাদের সভাপতি ছিলেন কিন্তু আমরা আর তাঁহার নিকট কাজ-কর্ম্মের হিসাব দিতাম না।

তৎপরে বঙ্গভঙ্গের হাঙ্গামা এবং স্বদেশীর বন্যা আসিল। সেই সঙ্গে আমরাও (প্রচারক-বিভাগ) গা ঝাডা দিয়া উঠিলাম। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্রকে 'ভবানী মন্দির' স্থাপনা উপলক্ষে আবার বঙ্গে পাঠাইয়া দেন। সেই সংস্রবে ঘোষ মহাশয়ের বন্ধু —ধনী সুবোধ মল্লিক বৈপ্লবিকদের সংস্পর্শে আসিয়া সাম্যবাদী হয়েন ও নানা জনহিতকর জাতীয় কর্ম্মে অর্থ-সাহায্য করেন। মল্লিক মহাশয়ের সহিত আমাদের আলাপ হয়। এই সময়ে পাবনার দল, যাঁহাদের অনেকে

আমাদের দলের লোক ছিলেন, তাঁহাদের নেতা যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সভাপতির ঝগড়ার কথা সভাপতির স্বমুখে শুনিয়া সন্দেহ দূরীকৃত করিয়া আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যোগদান করিলেন। ইহারাই উত্তরবঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার করিয়াছিলেন। (১) তাহার ফলে, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ও পাবনা আমাদের হাতে আসে। ইহার অগ্রে কটকে যে কর্ম্ম লুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল আমি গিয়া তাহা আবার জাগাইয়া একটি বড় আখড়া স্থাপন করিয়া আসিয়াছিলাম। এই সমস্ত যোগাযোগ একসঙ্গে সংঘটিত হইবার ফলে "যুগান্তর" কাগজ প্রকাশিত হয়।

বহুদিন ধরিয়া আমরা কাগজ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু ⁄সখারাম গণেশ দেউস্কর(২) মহাশয় আমাদের টাকার অভাব দেখিয়া কাগজ বাহির করিতে মানা করেন। পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় সভাপতি মহাশয় বলেন, "ছেলেদের ঠাণ্ডা থাকিতে বল, আমরা প্রেস যোগাড়ের চেষ্টা করিতেছি।" এই প্রকার স্তোকবাক্যে ১৯০৪—১৯০৫ সাল বহিয়া যায়। এই সময়ে ⁄উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' কাগজ বাহির করিলেন (৩)। কিন্তু এই কাগজে ক্রমাগত ধ্বংসমূলক আলোচনা (destructive criticism) বাহির হওয়ায় ইহা শিক্ষিত সাধারণের প্রিয় হয় নাই এবং ইহা বৈপ্লবিক মতাবলম্বী না হওয়ায় আমরাও একটি বৈপ্লবিক কাগজ (যাহা দলাদলির বাহিরে থাকিবে) বাহির করিবার জল্পনাকল্পনা করিতে লাগিলাম। এমন সময় কবিরাজ মহাশয় (৪) বলিলেন, "আমরা যদি কাগজ বাহির করি তাহা হইলে রঙ্গপুরের কেন্দ্র দুইশত টাকা সাহায্য করিতে বহু পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।" এই 'যুগান্তর' কাগজ বাহির করিবার প্রধান উদ্যোগী বারীন্দ্র, অবিনাশ ও আমি। তৎপরে একশত টাকা কলিকাতা হইতে পাওয়া যায়। এই প্রকারে তিনশত টাকা (৫) লইয়া বুক ঠুকিয়া আমরা মাথা গরমের দল "যুগান্তর" কাগজ প্রকাশ করিলাম। বারীন্দ্র তাঁহার "বিজলীতে" লিখিয়া-

ছেন যে, যে যুবক তাঁহার সঙ্গে গৌহাটিতে গিয়া রিভলভারের গুলির দ্বারা নিজে আহত হইয়াছিল সেই যুবক পাঁচশত টাকা রঙ্গপুর হইতে আনিয়াছিল তাহা ঠিক নহে—সেই যুবক দুইশত টাকা রঙ্গপুর হইতে আনিয়াছিল। (১

'যুগান্তর" নাম আমার মনোনীত। দেবব্রত বসুর সঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়া এই নাম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম। এই নামটি ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে ধার লওয়া হয়। আমরা অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই; সেইজন্য এই নামটি আমার বিশেষ পছন্দ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল। 'যুগান্তর' দলের কাগজ ছিল। টাকা সংগ্রহ, মতামত ও প্রবন্ধ লেখা সমস্ত কর্ম্মই পার্টির অভিপ্রায় অনুসারে হইত। কাগজ সম্বন্ধে আমাদের মাথার উপরে ছিলেন—অরবিন্দ ঘোষ, দেউস্কর এবং অবিনাশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (২)।

"যুগান্তরের" পশ্চাতে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী বৈপ্লবিক সমিতিই ছিল। ইহা তাঁহাদেরই কাগজ। এই সময়ে যাঁহারা পি. মিত্রের তাঁবেদার ছিলেন ও যাঁহারা লাঠি ঘুরাইতেন তাঁহারা একদল হইলেন; তাহা ছাড়া বঙ্গের সমস্ত কেন্দ্র আমাদের সঙ্গে ছিল এবং আমরা অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে কার্য্য করিতাম। এই প্রকারে বঙ্গে বৈপ্লবিক দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে দলাদলির ছায়া প্রকাশ পায়। কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, ঢাকার অনুশীলন সমিতি এবং ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও তাহাদের শাখাসমূহ পি. মিত্রের সরাসরি অধীনে ছিল; তাহা ছাড়া বঙ্গে যে সব বৈপ্লবিক কেন্দ্র ছিল তাহাদের সকলেই আমাদের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বাধীনে কর্ম্ম করিতেন এবং সংখ্যাতেও আমাদের দিকের লোক বেশী ছিল। অথচ-

বাৎসরিক কন্‌ফারেন্সে সকলেই পি. মিত্রের নেতৃত্বাধীনেই মিলিতাম। আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল এই যে, এক সহরে দুইটি দলও ছিল—যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদিতে। তখন সমিতি কেন্দ্রীভূত বা দৃঢ়ভাবে সুশৃঙ্খলিত হয় নাই। লোকের সম্মুখে বলিতাম, পি. মিত্র আমাদের সভাপতি, কিন্তু তিনি সতীশ বসু ও পুলিন দাস ছাড়া আর কিছুই বুঝিতেন না। আসল কার্য্যের সময় এই বিভেদ ধরা পড়িত। তখন লোকে বলিত, 'আপনাদের কার্য্য সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত নয়।" আমার মনে হয় ভবিষ্যতে এই দলাদলির ছায়ায় শেষে তিনটি দল বঙ্গে ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হয়।

তিনশত টাকা লইয়া আমরা কাগজ বাহির করিয়া কার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম কিন্তু পরে আরও অনেক টাকা পাওয়া যায়। প্রথমে আমরা যখন কাগজ বাহির করি তখন আমাদের অনেকের নিকট টিট্‌কারী খাইতে হইয়াছিল। বড় বড় কাগজওয়ালা আমাদের ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। আমাদিগকে (upstart) ভূঁইফোঁড় বলিয়া যেন কাগজওয়ালারা ভাবিতেন।(১) কেবল একজনমাত্র প্রাচীন লেখক আমাদের সঙ্গে ছিলেন—তিনি ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়। কিন্তু আমরাও নাছোড়বান্দা ছিলাম; আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একবার এই বাঙ্গালাকে, তাহার চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া সত্যকথা বলিয়া যাইব। গুপ্তভাবে কথা চিরকাল চলিবে না। বৈপ্লবিক কার্য্য করিতেই হইবে ও সেই সঙ্গে কাগজও চালাইতেই হইবে। টাকার টানাটানি চিৎকাল ছিল। কাগজের কোষাধ্যক্ষ ছিল অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, টাকার খবর সে জানে ও অরবিন্দ ঘোষ জানেন; টাকার অনটন হইলে অরবিন্দ ঘোষ ও চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের নিকট যাইতাম। যদিও টাকার অনটন সর্ব্বদাই ছিল, কিন্তু কার্য্যের সময় টাকা পাওয়া যাইত। এই প্রকারে হাতে চলা প্রেস লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া শেষে আমরা ইলেক্‌ট্রিক মেসিনের ছাপাখানা করি। (২)

শেষে টাকা চারিদিক হইতে আসিত। জেল, ফাঁসি যাইতে যুবকের দল ছিল, কিন্তু সর্ব্ব কর্ম্মের পাণ্ডা ব্যারিষ্টার, উকিলের দল কোথায় গেল? ভারতীয় রাজনীতির ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে এই ঘটনাটি একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বস্তু। যখন আমাদের বৈপ্লবিক কার্য্য আরম্ভ হইল তখন আমাদের কলিকাতায়, কথায় স্বদেশহিতৈষী ব্যারিষ্টারের দল 'গরমদলের' মোড়লি করিয়া গলাবাজি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহাদের নিকট হইতে একটি পয়সাও পাওয়া যায় নাই। সেইসঙ্গে উত্তর বঙ্গের উকিলের দলও গা-ঢাকা দিতে লাগিলেন। আমাদের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশনের সময়ে উত্তর-বঙ্গের কোন এক নামজাদা উকিল এবং জমিদারের নিকট চক্রবর্ত্তী-মহাশয় আমাদের জনকতককে কাগজের জন্য অর্থ-সাহায্য চাহিবার জন্য দাঁড করাইয়া দিলেন (১)। আমরা আমাদের অভাব যথাসাধ্য বলিলাম, কিন্তু যখন টাকার সাহায্য চাহিলাম তখন এই ধনাঢ্য নেতারা এদিক-ওদিক যে যার মুখ ফিরাইয়া লইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহাতে বড়ই ভগ্ন-হৃদয় হন। এই উকিল ও জমিদারের দল আবার "যুগান্তর" আফিসে গিয়া খাতা খুলিয়া টাকার হিসাব দেখিতে গিয়াছিলেন; কারণ তাঁহারা দুইশত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। অবিনাশ পরদিন এই খবর আমাকে দেয়। শুনিয়া আমি জবাব দিই অবিনাশ তুমি ইহাদের আফিস হইতে তাড়াইয়া দাও নাই কেন, খাতা কেন দেখাইলে? ঐ উকিল মহাশয়ের সঙ্গে এক চল্লিশ হাজার টাকার মুনাফার জমিদার ছিলেন (২)। তিনি তাহার দুই চারি দিন আগে আমাকে কোন কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রতিশ্রুত কুড়ি টাকা চাঁদা দেন নাই। পরে কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "আমরা যুগান্তরের আয়-ব্যয় দেখিতে যাইলে অবিনাশ খাতা খুলিয়া দেখাইল। যখন দেখি টাকার আয়ের কথা দূরে থাকুক তাহার খাবার পয়সা পর্য্যন্ত নাই, তখন আমি

নিজে তাহাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিই"।

ইহাই আমাদের ব্যারিষ্টার, উকিল জমিদারদের স্বদেশপ্রেম ও বৈপ্লবিক-কর্ম্মে সহায়তা। গায়ে আঁচড় না লাগাইয়া যেখানে বিনা ত্যাগে মোড়লি করিয়া নেতা হওয়া যায়, সেইখানেই এই স্বনামধন্য মনীষীরা অগ্রসর হন। ইহাকে বলে বুর্জোয়া মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান। প্রাণটা দিক পরে, আর নিরাপদে থাকিয়া ফলটা খাই আমরা—ইহাই চিরকাল বুর্জোয়াদের (Bourgeois) নীতি। সেইজন্য যখন বোমার আবির্ভাব হইল, টপাটপ গুলি ছুটিতে লাগিল ও ধরপাকড় হইতে আরম্ভ হইল, তখনই এই বুর্জোয়ার দল বৈপ্লবিক সম্প্রদায়ের রঙ্গমঞ্চের পশ্চাৎদিকে আসন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শেষকালে বুর্জোয়ারদল বৈপ্লবিক কর্ম্ম হইতে অন্তর্হিত হইয়া ছলেন এবং তাহা যুবকদের হাতেই ন্যস্ত হয়।

বাঙ্গালীর বদনাম এই যে, সে চারপয়সা চাঁদা বা ভিক্ষা দিলে চারবার চোখ রাঙায় ও টাকার হিসাব দেখিতে চায়। আমাদের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের ব্যবহারও সেই প্রকারের জঘণ্য ছিল! ইহাদের আচরণের সঙ্গে আমেরিকার ভারতীয় মজুরদের আচরণে কত আকাশ-পাতাল তফাৎ। তথায় নিরক্ষর মজুরেরা স্বদেশভক্তি বা "গদরের" নামে শত শত ডলার এক কথায় দান করিয়াছে [১]। ভারতীয় বৈপ্লবিকদের যখন আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট ডেপোর্ট কম্বিতে চেষ্টা করিতেছিল তখন বার্লিন সহরে অর্থ-সাহায্য করিবার জন্য আমি ভারতীয়দের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করি। তাহাতে একজন ভূতপূর্ব্ব সিপাহী একটী অতি গরিব পাঠান (আফ্রিদি)—যে অর্থাভাবে দিনে একবেলার বেশী খাইতে পায় না,—সে নিজের "কৌমের" (স্বজাতির) জন্য ৩০ মার্ক চাঁদা তৎক্ষণাৎ দিয়া দেন। ইহা 'দরিদ্র বিধবার দান' (Widow's mite) বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত মস্তকে তুলিয়া লইয়াছিলাম এবং এ দান আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

স্বাধীনতাবাদের আদর্শ

যখন আমি এদলে ঢুকিয়াছিলাম তখন ৺দেবব্রত বসুর সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ ঐতিহাসিক, ধর্ম্ম ও দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনা হইত। তাঁহার বাড়ী আমাদের একটি প্রধান আড্ডাস্থল ছিল। তাঁহার নিকট প্রথমে আমি শুনিয়াছিলাম ও তৎপরে অন্যান্য মাতব্বরেরা বলিতেন যে, বিপ্লবের কর্ম্মপদ্ধতি তৎপরে জাতীয় শাসন-যন্ত্র সংস্থাপনের জন্য একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা (constructive plan) নেতারা অগ্রেই গড়িয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য এ পরিকল্পনা দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল। রণনীতির বিষয়ে এই মত শুনিয়াছিলাম যে, আমাদের প্রথমে খণ্ডযুদ্ধ (গেরিলা যুদ্ধ) করিতে হইবে ও দেশী সিপাহিদের হাত করিতে হইবে ইত্যাদি। শাসন-প্রণালী বিষয়ে এই মন্তব্য শুনিয়াছিলাম, ভারতবর্ষ একটি নিয়মতন্ত্রানুযায়ী (constitutional) সাম্রাজ্য হইবে ; কিন্তু আমাদের দলের অনেকেরই এ বিধান পছন্দ হয় নাই। আমরা বলিতাম, বাঙ্গালায় আমরা রাজাফাজা মানি না,—বাঙ্গালা সম্বন্ধে কি বিধান হইয়াছে ? ইহার উত্তর পাইতাম—বাঙ্গালীর জন্য সাধারণতন্ত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা বলিতাম, সমস্ত ভারতের জন্য এই বিধান হইল না কেন ? ইহার উত্তর এই পাইতাম যে, দাক্ষিণাত্য, রাজপুতনা প্রভৃতি প্রদেশ ঘোর রাজতন্ত্রবাদী ! তবে স্বাধীন ভারতের শাসনপ্রণালী আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্য ও জার্ম্মাণীর শাসন-প্রণালীর মাঝামাঝি একটি প্রণালী এক প্রকারের Bundestatt (১) হইবে। একদিন ৺দেবব্রত বসুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, অরবিন্দ ঘোষের কি মত ? তিনি বলিলেন, "ঘোষ মহাশয় দক্ষিণাপথ হইতে আসিতেছেন— তিনি রাজতন্ত্রবাদী।"

আসল কথা, এই বিধানে আমরা কেহ কেহ সন্তুষ্ট হই নাই। ইহাতে ৺দেবব্রত বসু বলিতেন আমাদের এ বিষয়ে ভাবিবার বা মাথা ঘামাইবার দরকার নাই; নেতারা (ব্যারিষ্টারের দল) প্রকাণ্ড মস্তিষ্কশালী ব্যক্তি, তাঁহারা এ বিষয় সব ভাবিয়া চিন্তিয়া শাসনপ্রণালী ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রকারে রাজনীতিক দর্শনশাস্ত্রের দিকটা চাপা পড়িত। তবে যখন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী ব্যক্তি নূতন সভ্য হইতেন ও জিজ্ঞাসা করিতেন যে আপনারা ত ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করিতেছেন কিন্তু গড়িবার কি ব্যবস্থা করিতেছেন? তখন তিনি উপরোক্ত বাঁধা বুলিই জবাবস্বরূপ শুনিতেন। সকলেই এক অকাট্য জবাব পাইতেন, "অগ্রে ইংরাজ তাড়াও"। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ইংরাজ তাড়াইবে কে? ইহার উত্তরে শাসনাসিজমের একঘেঁয়ে এই বাঁধাবুলি শুনিতে পাইতাম যে 'রাজার দল হইতে চাষা পর্য্যন্ত জাতীয়ভাবে প্রণোদিত হইয়া একীভূত হইয়া স্বাধীনতা-সমরে যোগদান করিবে। রাজা, জমিদার, ব্যারিষ্টার ও ডাক্তারের দল যেন স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য বিপ্লবে যোগদান করিবে,—কিন্তু আমরা বাবুর দল—চাষাভূষাকে কি প্রকারে হাতে পাইব? বিশেষতঃ বাঙ্গালার যে সব কৃষক—চৌরঙ্গির হোটেলে আসিয়া ইংরেজের তাড়া খায় নাই, অথবা শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহ করিয়া শ্বেতাঙ্গ-সমাজ হইতে "নিগার" বলিয়া দূরীভূত হয় নাই অথবা রেসিডেণ্ট ও ম্যাজিষ্ট্রেটের লাথি খাওয়ার আস্বাদন কখনও পায় নাই—যাহাদের ঐরূপ আক্ষেপ বা অভিযোগ কিছুই নাই, তাহারা কিপ্রকারে সর্ব্বত্র ইংরেজ-বিদ্বেষী হইবে? ইহার উত্তরে শুনিতাম, "তাহাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে জমিদারের দোষ কি, বিদেশী শাসন-কর্ত্তারা তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ইংরেজ বিদায় হইলেই চাষাদের সুবিধা ও মঙ্গল হইবে।"

এই সমস্ত কথা আমরা তোতাপাখীর মতন কপচাইয়া ও ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সকলকে দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতাম। জানি না, অ-বাঙ্গালী নেতারা কত রাজ-রাজড়া হাতে পাইয়াছিলেন; বাঙ্গালায় কিন্তু অনেকগুলি জমিদার ও আইন-ব্যবসায়ীর দল আমাদের দলভুক্ত হইয়াছিল। আর যে গণসংঘ দেশের শতকরা ৯৫ জন তাহার কয়জন হাতে আসিয়াছিল ইহার উত্তরে ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে। একবার আমি নদীয়া জেলার কোন এক গ্রামে প্রচার-কার্য্যে গিয়াছিলাম (১)। তথায় এক চাষী আসিয়া বলিল, "শুনিলাম, কলিকাতা হইতে এক বাবু চাষীদের দুঃখ কষ্টের কথা শুনিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন।" তাহার দুঃখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া নিজের দুঃখ-কাহিনী বর্ণনা করিল। সমস্ত শুনিয়া শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মিঞা, বুঝিতে পারিতেছ কি, তোমার এত কষ্ট ও অত্যাচার কাহার দ্বারা হইতেছে?" সে উত্তরে বলিল, "জানি না বাবু? জমিদার!" আমিও তখন ন্যাসনালিজমের বাঁধা বুলি আওড়াইলাম, "দোষ জমিদার বেচারীদের নহে (২)। কসুর সব বিদেশী শাসন-কর্ত্তার!'...... মিঞা আর্দ্রচক্ষু ড্যাব্‌ড্যাব্ করিয়া আমার দিকে অবিশ্বাসের চাহনি চাহিল; আর আমার কথার কোন জবাব না দিয়া চলিয়া গেল। এই কাণ্ড দেখিয়া আমার নিজের মনেও লজ্জা হইল। বুঝিলাম যে, এই নিরক্ষর দরিদ্র কৃষকও আমার মতন কলিকাতার রাজনীতিক বাবুর কথাটা বিশ্বাস করিল না। জীবনে এ ঘটনা কখনও ভুলি নাই; তখনই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম যে আমরা কতটা ভুয়ার উপর দিয়া যাইতেছি। হায়রে, তখন বুঝিতাম না যে আমি দেশের কার্যের নামে বুনিয়াদি স্বার্থের (বুর্জোয়া শ্রেণী-স্বার্থের) এজেন্ট হইয়া চারিদিকে ঘুরিতেছি! এইত গেল আমাদের

গণশ্রেণীকে হাত করিবার খবর। তবে, অনেক মাতব্বর লোক বলিতেন যে, অমুক বাবু পাবনা হইতে ৫০,০০০ লোক দিবেন, অমুক বাবু ঢাকার ভার নিজ হাতে লইয়াছেন। কেহ কেহ বলিলেন, "মেদিনীপুর হইতে সাঁওতাল ও ডাকাতের দল জুটাইতে হইবে।" যাহা হউক একদিন দেবব্রতর সঙ্গে তর্ককালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'বাঙ্গালায় লড়িবে কে?' উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালায় ছাত্রের দল লড়িবে!" এ কথাটা আমার প্রথমে ব্যঙ্গ বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময়ের ইতিহাস দেখিয়া সে ধারণা পরে চলিয়া যায়। এক্ষণে ইহা সার্ব্বজনীন বিশ্বাস—ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাঙ্গালার আশাস্থল বাঙ্গালী ছাত্রদের দল (১)।

এই প্রকারে বাঙ্গালায় আমাদের বৈপ্লবিক রাজনীতি ও সমাজ-নীতির দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইত। একটা নূতন কিছু গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কি প্রকারেই বা গড়িবে? আমাদের রাজনৈতিক জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল—যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের পুস্তকাবলী, আনন্দমঠ ও ম্যাটসিনির আত্মচরিত। আর ভারতীয় অর্থনীতিক জ্ঞান আমরা আহরণ করিতাম ডিগবি ও দাদাভাই নৌরজীর পুস্তক হইতে। যাঁহার বেশী দৌড় ছিল, তিনি ইউরোপীয় রাজনীতিক মতবাদ, সোসালিজম ও রুষীয় বৈপ্লবিকদিগের ইতিহাস পড়িতেন। এই সব বৈজ্ঞানিক মাল-মসলা লইয়া ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় আমাদের লইয়া ক্লাশ করিতেন। তিনি নাকি বৈপ্লবিক নেতাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই "দেশের কথা" পুস্তক লেখেন। দেউস্কর মহাশয় আমাদের ভারতীয় রাজনীতিক ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার নিকট আমরা অনেক বিষয়ে ঋণী। এই সব চর্চার ফলে কানকতক ইংরাজী ও বাঙ্গলায় রচিত পুস্তিকা, কবিতা

ইত্যাদি বেনামায় ছাপাইয়া সাধারণকে বিলি করা হইত। তৎপরে স্বদেশী-অন্দোলনের সময় আমরা No Compromise নামক পুস্তিকা এবং সংখ্যার পর সংখ্যায় "সোনার বাঙ্‌লা" নামক একখানি ম্যানিফেষ্টো ইংরেজী ও বাঙ্‌লাতে বাহির করিতাম (১)। তখন এই সব ব্যাপারে কি উৎসাহ ও সাহস ছিল! এই সব কাজের উদ্দেশ্য ছিল,—জনসাধারণকে ইংরেজ বিদ্বেষী করা ও তাহাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া চোখ ফুটাইয়া দেওয়া।

তৎকালের বিপ্লববাদের দর্শন ছিল,—"জাতীয়তা'। স্বাধীনতা অর্জ্জন দ্বারা এক জাতীয়ত্ব লাভ করিতে হইবে, এবং ইহার জন্য স্বদেশ প্রেমের দ্বারা ব্রাহ্মণ, শূদ্র, রাজা ও প্রজাকে একসূত্রে বাঁধিতে হইবে। ইহার বেশী তখন কাহারও দার্শনিক দৌড় হয় নাই (২)। তবে একজন অ-হিন্দু ব্যারিষ্টার—৺অপূর্ব্বকুমার ঘোষ—যিনি আমাদের দলের বাহিরে ছিলেন অথচ কিছু খবরও রাখিতেন এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হইলেই তিনি কেবল সোসালিজ্‌মের কথা পাড়িতেন। (৩)

এস্থলে আমি যে সময়ের ঘটনা বর্ণনা করিতেছি, ইহা বাঙ্গালার বিপ্লববাদী গুপ্ত-সমিতির জীবনের প্রথম উচ্ছ্বাসের সময়। আমার বোধ হয় ইহাই গুপ্ত সমিতির খুব ভাল সময়ের অবস্থা যাহা আলিপুরের মোকদ্দমার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। অর্থের দিক দিয়া এ সময়ের অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু মনের স্বাস্থ্য ও সভ্যশ্রেণী হিসাবে এ সময় খুব উন্নত ছিল; কারণ নানাশ্রেণীর ও নানাপ্রকারের শিক্ষিত ব্যক্তি গুপ্ত-সমিতির সভ্য হইতেন বা সহানুভূতি দেখাইতেন। আমার বিশ্বাস, আলিপুরের মোকদ্দমার ব্যাপারের পর হইতে গুপ্ত-সমিতির কার্য্যের ও সভ্যশ্রেণীর পরিবর্ত্তন হয়। আমার দেশত্যাগের পর লোকমুখে

ভিতরের ব্যাপার যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে ইহা অনুমান হয়, বৈপ্লবিক পন্থা যতই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে আরম্ভ করিল, জমিদার, উকিল এবং ব্যারিষ্টারের দল ততই শনৈঃ শনৈঃ গুপ্ত-সমিতির সংস্রব ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। শেষে জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা কেবল ছাত্রশ্রেণীর দ্বারাই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। তখন টাকার অভাবে ডাকাইতি করা আর অত্যাচারী পুলিশের উপর প্রতিশোধ লও, ইহাই বৈপ্লবিক কার্য্যের চূড়ান্ত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে বিদেশ হইতে টাকাও পাঠান হইয়াছিল, অস্ত্রও পাঠান হইয়াছিল, আর তুর্কির সুলতান ইংরেজের বিরুদ্ধে "জেহাদ" ঘোষণাও করিয়াছিল এবং তুর্কির সেখ উল ইস্লাম ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানদের একত্রিত হইয়া ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য "ফতেয়াও" দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ইহার কারণ সাধারণে কি বুঝিতে পারিয়াছেন (১ ? ১৯১৫-১৬ খ্রীঃ বিপ্লব-প্রচেষ্টা অকৃতকার্য্যতার ফলে আমাদের কাহারও কাহারও চক্ষু খুলিয়াছে। দেশে বিপ্লববাদীর দল গণসংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া কতটা যে শূন্যে ছিল ইহা অনেকেই বুঝিয়াছে। আর রাজরাজাড়া জমিদার ও ব্যবহারজীবিদলের স্বাধীনতা সমরের স্পৃহা যে কত বেশী, তাহার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল যখন ইঁহারা দেশ হইতে অজস্র টাকা দেশবাসীর নিকট হইতে লইয়া ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন ও সর্ব্বপ্রকারে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বিপ্লববাদের প্রচেষ্টার পরিণাম দেখিয়া বেশ জ্ঞান হইয়াছে, আমরা যে আদর্শ ও যে শাস্ত্রানুযায়ী সাধন করিতেছিলাম ফলও তদনুরূপ পাইয়াছি। যেমন বপন করিব তেমনই ফল পাইব—ইহাই পুরাতন সত্য। তবে প্রত্যেক দেশেই রাজনীতিক ক্রম-বিকাশের পর্য্যায়ে ইহা

অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। কিন্তু আজ অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, আমাদের দর্শনশাস্ত্রে এক ঘোর ভ্রম ছিল এবং এ ভ্রম আজও অতি অল্পসংখ্যক লোক বুঝিতেছেন। ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্ত সকলকে স্বদেশ-প্রেমিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা সমর করিব,—যে যেমনটি আছে, সেই অবস্থাই সে থাকিবে, তাহার ইতরবিশেষ হইবে না, অথচ সকলে নিজের নিজের গদীতে থাকিয়া নিজের স্বার্থের ব্যতিক্রম না করিয়া ভ্রাতৃভাবে সর্ব্বশ্রেণী মিলিত হইয়া দেশ স্বাধীন করিব—ইহাই আমাদের দর্শন-শাস্ত্রের বিসমোল্লায় গলদ।

ভারতবর্ষীয় বৈপ্লাবকদের মন অচল (Static) অবস্থায় আবদ্ধ। সেইজন্য দেশের সমাজকেও তাহারা সেইপ্রকার অচল (static) অবস্থায় রাখিতে চাহে। মনের ভিতরে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন বা ক্রম-বিকাশ বা বিপ্লব আনিতে ভারতবাসী চাহে না, বৈপ্লবিকেরাও তাহার ব্যতিক্রম নহেন। আমাদের বর্ত্তমান সমাজে "পরিবর্ত্তনশীল শক্তি" নাই, তাই আমাদের মনেও তাহা নাই। ফলে আমাদের চিন্তা ও সমাজ স্থাণুবৎ থাকিয়া যাইতেছে। যাহারা মনে ও চিন্তায় বিপ্লব আনে নাই, তাহারা বহির্জগতে বিপ্লব কি প্রকারে আনিবে? যে নিজের মনকে অগ্রে মুক্ত করিবে, সে বাহিরেও তাহা উপলব্ধি করিবে। কিন্তু এ সত্য আমাদের বিপ্লব-পন্থীদের প্রতি প্রয়োগ করা কি চলে? ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা কি নিজেদের মনকে স্বাধীন করিয়াছেন যে তাঁহারা জন সাধারণের নিকট স্বাধীনতার বার্ত্তা ঘোষণা করিবেন? আমি এপর্য্যন্ত খুব অল্পসংখ্যক ভারতীয় বিপ্লবী দেখিয়াছি, যাঁহাদের ইউরোপে "বৈপ্লবিক" বলিলে যাহা বুঝায়, সেই পদবাচ্য করা যায়। আমাদের বিপ্লববাদ মানে ইংরাজকে দেশ থেকে বিদায় করা। বিপ্লববাদের প্রধান বুলি—"ইংরেজ

তাড়াও!" দেশে ও বিদেশে এই কলমার ব্যতিক্রম হইলেই মহাপাপ!

যখন বিপ্লববাদের ইহাই একমাত্র কলমা, তখন অন্য প্রকারের দর্শন-শাস্ত্রই বা কোথা হইতে আসিবে? আমি কোন ব্যক্তির বিপক্ষে কোন অভিযোগ আনিতেছি না; বিশেষতঃ, যে সব স্বদেশ-প্রেমিকেরা স্বাধীনতা-বাদের জন্য স্বার্থত্যাগ ও আত্মজীবন দান করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ও আমার প্রণম্য। এইস্থলে আমি বলিতে চাই যে আমাদের জাতিগত দুর্ব্বলতা আমাদের বিপ্লববাদেও প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। আমাদের জাতির প্রধান দোষ এই যে আমরা কিছু বিশিষ্ট (concrete) ভাবিতে পারি না বা ভুলিয়া গিয়াছি, সবই abstract ও ভাষা-ভাষা ভাবি, ফলে সর্ব্বত্রই কাজের বেলায় গোলে হরিবোল দিই এবং আমাদের মন অতি স্থাণুবৎ, অপরিবর্ত্তনীয় ও কুসংস্কারপূর্ণ। আমাদের বিপ্লববাদও তাহাই; কেবল বিশেষত্ব এই যে, বলি "ইংরেজ তাড়াও"। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে; হিন্দু অহিন্দুকে ঘৃণা করিবে; জমিদার প্রজার রক্ত শোষণ করিবে; স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার ও অবিচার পূর্ব্ববৎ থাকিবে বা চলিবে; শ্রেণী ও বর্ণ-বিভাগ পূর্ব্বের ন্যায় থাকিবে; ব্রাহ্মণ্য-গোঁড়ামীর চূড়ান্তও থাকিবে, অথচ স্বজাতীয়তার নামে সকলে একীভূত হইয়া ইংরাজ তাড়াইবে ইহাই আমাদের বৈপ্লবিক দর্শনশাস্ত্র! আসল কথা, পরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গে বিপ্লববাদ ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রকারান্তর হইয়াছিল। অথচ যখন মুসলমানেরা ধর্ম্মের নামে বিপ্লববাদ প্রচার করেন তখন আমরা Pan-Islamism-এর ভয়ে চীৎকার করি!

এই মানসিক অবস্থার গুটিকতক কারণ আমি দেখিতে পাই। ১ম কারণ,—আমাদের জাতীয় মনস্তত্ত্বের অনুযায়ী, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ২য় কারণ,—আমাদের নেতাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু ধর্ম্মাশ্রয়ী ছিলেন এবং রাজনীতি ও সমাজনীতিকে সেই ধর্ম্মেরই চক্ষু

দিয়া দেখিতেন। বঙ্গের বিপ্লবপন্থার আশা ও ভরসার স্থল অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়। দ্বিতীয়বার ঘোষ মহাশয় বরোদা হইতে আসিবার সময় ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং আমি যতদূর তাঁহাকে বুঝিয়াছিলাম, তিনি বিপ্লববাদকে ধর্ম্মের চক্ষেই দেখিতেন। আর যে সব নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন সকলেই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। জনকতক, যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের ছায়ায় ছিলেন, তাঁহারা নিজেদের বিশেষত্ব বজায় রাখিতে পারেন নাই বা প্রকট করিতে পারেন নাই। যে সব ব্রাহ্মযুবক আমাদের দলে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বেশীরভাগ ন্যাশন্যালিসিমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়া "হিন্দু" ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ৩য় কারণ,—আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিবিজ্ঞান বিষয়ে বৈপ্লবিকেরা বড়ই অজ্ঞ ছিলেন। ইংরেজী বই পড়িয়া, ইউরোপীয় আমদানি "স্বদেশপ্রেমিকতা" সকলে শিখিয়াছিল। দরকার হইলে ধর্ম্মের নামে লোক ক্ষেপাইয়া দিয়া কার্য্য উদ্ধার করাই ছিল রাজনীতি। রাজনীতি বা বিপ্লববাদ যে সমাজ ও অর্থনীতিবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে হইবে, এ খবর কয়জন জানিতেন বা ভাবিতেন? ৪র্থ কারণ,—বৈপ্লবিকদের মন অতি বদ্ধ অবস্থায় ছিল বা এখনও আছে। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সেই সঙ্গেই সামাজিক, অর্থনীতিক, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ও চিন্তার স্বাধীনতাও যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা কয়জন তখন বুঝিয়াছিলেন এবং এখনও বুঝিয়াছেন? সব বিপ্লবীই ম্যাট্‌সিনি আবৃত্তি করেন; কিন্তু ম্যাট্‌সিনি বলিয়াছেন, "লোকের মন অগ্রে স্বাধীন করা চাই, তবে বহির্জগতে সে স্বাধীনতা উপলব্ধি করিবে।" একথার মর্ম্ম কয়জন বুঝিয়াছিলেন? বিপ্লবীদের মনটা অগ্রে পূর্ব্ব সংস্কার হইতে মুক্ত করা চাই, তবে সে বাহিরে স্বাধীনতার বার্ত্তা প্রচার করিবে। আমরা ইংরেজের বিপক্ষে স্বাধীনতা

সমন্বয় করিব অথচ তথাকথিত নীচ জাতিকে সাম্য দিব না, স্ত্রীলোককে মুক্ত করিব না, অহিন্দুদের সঙ্গে সাম্য ও মৈত্রীর ভাব দেখাইব না, পৌরোহিত্যের অত্যাচার হইতে মনকে মুক্ত করিব না, কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইব না! অর্থাৎ বিপ্লবীরা বরাবর ভাবের ঘরে চুরি করিয়াছেন। মুখে বুলি 'চাই স্বাধীনতা' 'মার ইংরেজ' অথচ গোলামির শত বন্ধনে নিজেকে ও স্বজাতিকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাই—ইহার চেয়ে ভাবের ঘরে চুরি আর কি হইতে পারে? এইজন্যই বিপ্লববাদ কোন নিজস্ব দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টি করিতে পারে নাই এবং শেষে সব ধূঁয়ায় পরিণত হইয়াছিল।

ভাবের ঘরে চুরি করা আমাদের জাতীয় দোষ। যাহা সত্য বলিয়া বুঝি তাহা প্রকাশ্যে উপলব্ধি করিতে চাহি না। সত্যের জন্য আমরা নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারি না অর্থাৎ আমরা শহীদ জাতি নহি। আমি এখানে ব্যক্তিগত ত্যাগের বা নির্য্যাতনের কথা কহিতেছি না। আমাদের সমাজে বা দেশে, ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক ব্যক্তিই শহীদ (martyr) হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। কিন্তু আমরা যাহা সত্য ও ভাল বলিয়া বুঝি তাহা প্রকাশ্যে সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ করি কি না তাহা ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের চক্ষের উপর জাপান পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, চীন ও তুর্কি ওলট-পালট হইয়া গেল আর ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরে। অপরিবর্ত্তনীয় চীন এত শীঘ্র বদলাইয়া যাইতেছে যে পাশ্চাত্য-দেশ-সমূহে একবার রব উঠিয়াছিল, "চীনকে থামাও!" আর তুর্কি—দুইবার তুর্কির দেশে গিয়া দেখিয়াছি, ভারতবর্ষীয় মুসলমান ও তুর্কির মুসলমানদের চাল চলন, মানসিক চিন্তা ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে কত প্রভেদ! তুর্কি নিত্য কতই বদলাইতেছে যদিও তাহারাও

সরিয়াৎ কানুন মানে। এইসব দেশে মানসিক চিন্তার পরিবর্ত্তন বা বিপ্লব হইতেছে বলিয়া সমাজে ও রাজনীতিক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন হইতেছে।

মনে ঝড় না বহিলে বাহিরে তাহা প্রকট করিবার চেষ্টা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ এইখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিব যাহা পরলোকগতা ভগ্নী নিবেদিতার নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম। পরলোকগত রুষীয় অ্যানার্কিষ্ট—বৈপ্লবিক নেতা—ক্রপ্‌ট্‌কিন তাঁহাকে এই ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছিলেন। (১) একবার ক্রপ্‌ট্‌কিন তাঁহার সতের বর্ষীয়া এক বালিকা শিষ্যাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার সম্মুখে যে গির্জ্জা দেখিতেছ তাহাকে বোমা দিয়া উড়াইতে হইবে, বোমা তোমাকে দিতেছি। তুমি এ কার্য্য করিতে পারিবে? ইহাতে তোমার কিন্তু জীবন বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।" বালিকাটি এই কথার অগ্রে বেহুঁস অবস্থায় ছিল। এই আদেশ শুনিবামাত্র লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "বোমা আমায় দাও, আমি যাইতেছি।" তখন ক্রপ্‌ট্‌কিন বলিলেন, "আমি তোমাকে কেবল পরীক্ষা করিতেছিলাম, তোমায় এ কার্য্য করিতে হইবে না।" এই কথা শুনিয়া বালিকাটি চক্ষুজলে ভাসিয়া বলিল, "ইহা কি পরীক্ষা বা ছলনার কার্য্য? ইহা যে আমার ধর্ম্ম, ঐ গির্জ্জা হইতেছে পৌরোহিত্য অত্যাচারের স্তম্ভ। আমার ধর্ম্ম হইতেছে উহার ধ্বংস-সাধন করা।" সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও শোষণের কবল হইতে মানবকে মুক্ত করা অ্যানার্কিষ্টদের অভিপ্রায়। সেইজন্য তাহাদের কাছে পুলিশ ও রাজপুরুষ যে প্রকার রাজনৈতিক অত্যাচারের প্রতিনিধি, গির্জ্জাও সেইরূপ পৌরোহিত্যের অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ। সেইজন্যই মানবের মুক্তি অভিলাষী বালিকাটি এই গির্জ্জা উড়াইয়া দিবার জন্য প্রাণদান করিতে প্রস্তুত ছিল।

এই প্রকার মানসিক ঝড় কি আমাদের বিপ্লবীদের মনে

রহিয়াছে? আমরা কি মানবের সর্ব্বজনীন মুক্তি ইচ্ছা করি? আমরা কি সকলকে স্বাধীনতা দিতে চাই? যাহারা বিপ্লবী বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারা একথার জবাব দিন। এই রুষীয় বালিকার সঙ্গে একটি বাঙ্গালী শহীদের তুলনা করিব। আমি প্রাতঃস্মরণীয় শহীদ প্রফুল্ল চাকীর কথা বলিতেছি। প্রফুল্ল সতের বৎসরের বালক ছিল, এবং জাতিতে অব্রাহ্মণ-বংশীয় ছিল। তাহাকে আমরা যাহা শিখাইয়াছিলাম তাহাই সে শিখিয়াছিল। আমরা তাহাকে যাহা করিতে বলিয়াছিলাম তাহাই সে করিয়াছিল। তাহাকে পূর্ব্ব-বঙ্গের গভর্ণর ফুলারকে মারিবার জন্য রঙ্গপুর হইতে আনান হইয়াছিল। এই ফুলার বধ চেষ্টা ৺সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা বিশেষভাবে প্রণোদিত হইয়াছিল। এইজন্য বোমার নির্ম্মাণ সময় হইতে ফুলারের ভারত ত্যাগ পর্য্যন্ত সমস্ত সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইত। (১) তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই কর্ম্মের সমস্ত ব্যয়ের জন্য তাঁহার জনকতক বন্ধুর নিকট হইতে ৭।৮ হাজার টাকা তুলিয়া বিপ্লবীদের দিবেন। কিন্তু কাজের বেলায় এক পয়সাও তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই, বিপ্লবীরা তাঁহার নিকট হাঁটাহাঁটি করিয়াই প্রাণান্ত হইয়াছিল। বোমা নির্ম্মাণকালে সিমুল-তলায় তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল। ইহাই ভারতের প্রথম "বোমা" নির্ম্মাণ। এই বোমা ও ফুলারের পশ্চাতে ধাবমান হইবার খরচা একজন ধনাঢ্য লোক দান করিয়াছিলেন। ইহাদেরই বিষয় উল্লেখ করিয়া বারীন্দ্র আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "আমরা ধনী-শ্রেণীর ভাড়াটিয়া গুণ্ডা ছিলাম!" গণশ্রেণীর দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় ইহা বলা যায় যে বুর্জোয়াদল নিজেদের কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য বিপ্লবীদের "ভাড়াটিয়া গুণ্ডারূপে" ব্যবহার করিতেন। (২)

আমি প্রফুল্লকে ম্যাটসিনির আত্মজীবনীর কিয়দংশ পড়াইয়াছিলাম

ও বাঞ্চিয়েরা ভ্রাতৃদ্বয়ের আত্মত্যাগের কথা তাহাকে শুনাইয়াছিলাম। (১) সেও সেই প্রকারে আত্মত্যাগ করিয়াছিল। সেও বিপ্লববাদকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সে অত্যাচারী রাজপুরুষের প্রাণদণ্ড দান ও তাহার জন্য আত্মজীবন ত্যাগ করা তাহার ধর্ম্মের সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সে-সাধনাতে সে কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। এইজন্যই সে বঙ্গের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাহার মনে একটা ঝড় বহিয়াছিল। তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে ভারতের রাজনীতিক মুক্তির জন্য আত্মত্যাগের প্রয়োজন। সেও সে সাধনা করিয়াছিল। এই উভয়স্থলেই একই মনস্তত্ত্বের বিকাশ দেখিতেছি। এই উভয়স্থলেই কার্য্য এক, কিন্তু কারণ ও আদর্শ বিভিন্ন। প্রফুল্ল চাকীকে যদি বলা হইত যে, সে যেমন ইংরেজের অধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, সেই প্রকার যেন পৌরোহিত্যের অত্যাচার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে,—কারণ বিভিন্ন প্রকারের অধীনতার মূলসূত্র এক, কেবল আকার বিভিন্ন মাত্র,—একটির বিপক্ষ হইতে হইলে আর একটির বিপক্ষে যাইতে হইবে—তাহা হইলে কি প্রফুল্ল বা পরবর্ত্তী শহীদেরা এক কথায় এই যুক্তি মানিয়া লইতেন ও নিজেদের কোরবানী করিতেন? এইস্থলে আদর্শের প্রভেদ ছিল। মুক্তির মন্ত্র পূর্ণভাবে দেওয়া হয় নাই এবং এখনও দেওয়া হয় না বলিয়াই ভারতের এত জটিল সমস্যা। এই আদর্শের প্রভেদ বলিয়াই রুষ আজ মুক্ত এবং সমগ্র মানবজাতিকে এই মুক্তি-দান-প্রয়াসী। তাই আজ রুষের আদর্শে জগৎ টলটলায়মান হইয়াছে। আর ভারত? সবই নিভিয়া গিয়াছে। শহীদেরা কেবলমাত্র ঐতিহাসিক হইয়া রহিলেন। জাতি, সমাজ ও ধর্ম্মভেদের সমস্যা মিটাইবার জন্য নেতারা পলিতকেশ হইতেছেন এবং ক্ষীণকণ্ঠে পরাজিত ব্যক্তির ক্রন্দনধ্বনি

শ্রুতিগোচর হইতেছে, "আমরা বিদেশী আমলাদের বিপক্ষে ঝগড়া করিতেছি।"

বুদ্ধদেব ভারতে এক নূতন যুগ আনিয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসীকে সামাজিক, পৌরোহিত্য ও মানসিক অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার বাণী ঘোষণা করেন। সমগ্র এসিয়াখণ্ড এই মুক্তির বাণী শ্রবণ করিয়াছিল। ইহা ভারতের প্রাচীনকালের বিশেষ দান। বর্ত্তমান যুগে জগতকে আমরা কি দান করিতেছি? কেহ কেহ বলেন যে আমরা বর্ত্তমান যুগে জগতকে স্বাধীনতার জন্য অসহযোগ আন্দোলন পন্থা দান করিতেছি। কিন্তু এ পন্থা কি ভারতের নিজস্ব উদ্ভব? ইহা যতই হিন্দুধর্ম্মের আচারে অভিষিক্ত হউক না কেন, ইহা কি বিদেশ হইতে আমদানি করা নয়? (১) আর ভারতীয় বিপ্লবপন্থীরা যদি একটা নূতন দর্শনের আদর্শে মাতিয়া ভারতে মুক্তির বাণী ঘোষণা করিতেন বা করেন তাহা হইলে জগতের রাজনৈতিক বা বৈপ্লবিক ইতিহাসে ভারতের জন্য আজ অতি উচ্চ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। তাহা হইলে ভারতে এক অগ্নির প্রবাহ বহিত যাহা ভারত ছাড়িয়া বাহিরেও পৌঁছিত।

ইতিহাসে যাহা ঘটে তাহা অনিবার্য্য ঘটনা। ভারতের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ইহা একটি পর্য্যায় মাত্র। তখন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শ ক্ষুদ্র ছিল, বৈপ্লবিক নেতাদের আদর্শও বিশেষ বড় ছিল না। আসল কথা এই যে, বিগত ৪০ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় মধ্যমশ্রেণীর সহিত ইংরেজ মধ্যমশ্রেণীর বিবাদ চলিতেছে। উভয় দলই সর্ব্বজনীন স্বাধীনতা প্রয়াসী নন। বিদেশী মধ্যমশ্রেণী (বুর্জোয়াশ্রেণী) ভারত শাসন করিতেছেন, আমাদের দেশীয় মধ্যমশ্রেণী তাহাদের হাত হইতে শাসন-যন্ত্রটা কাড়িয়া লইতে চান। এইজন্যই আজ রব উঠিয়াছে যে আমরা বিদেশী বুর্জোয়ার দলের প্রতিনিধি

আমলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু ভারতের সমস্যাসমূহের মূলে রাজনীতিক নেতারাও যাইতেছেন না, বিপ্লবী নেতারাও যাইতেছেন না। মুক্তি বা স্বাধীনতা কাহাকে দিব, কেন দিব ও কি প্রকারে দিব ইহা কেহ তলাইয়া দেখেন না। আমাদের বৈপ্লবিকেরাও দেখিতেন না। বঙ্গের বিপ্লবপন্থীর দুর্ভাগ্য যে, ইহা একদিকে যেমন শাসন-বিভাগ হইতে নির্য্যাতন ভোগ করিত, তেমনি অন্যদিকে কংগ্রেসওয়ালার নিকট "পারিয়ারূপে" গণ্য হইত এবং এই দুই অবস্থার মহৌষধিরূপে কোন প্রখর চিন্তাশীল ব্যক্তির উদয় হয় নাই যিনি একটা নূতন দর্শনানুযায়ী আদর্শ দিয়া সব পন্থার উপর বিপ্লবপন্থাকে বড করিয়া তুলিবেন। যখন বাঙ্গালার বিপ্লবপন্থার আশাস্থল অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় পণ্ডিচারিতে ধর্ম্ম সাধনে নিমগ্ন হইলেন তখন যুবকের দল আর কি করিবে? তাহারা চিন্তাশীল নেতার অভাবে পুরাতন গৎ গাহিতেছেন, একটা নূতন চিন্তাস্রোত এইজন্য বঙ্গে বাহির হইতে পারে নাই। বঙ্গে একটা নূতন চিন্তাস্রোত বহিতে পারে নাই বলিয়াই একটা কিছু অভিনব আদর্শের সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

বিপ্লব-সমিতি গঠন

বঙ্গীয় গুপ্ত-সমিতি স্থাপনার আরম্ভকালে একজন সভাপতি, দুইজন সহকারী সভাপতি ও একজন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। অবশ্য ইহারা সকলেই ব্যারিষ্টার ও ধনাঢ্যশ্রেণীর লোক। ইহাদের নীচে ছাত্রদের লইয়া কার্য্য করিবার জন্য যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্ত্তীকালের নিরালম্ব স্বামী) নিযুক্ত ছিলেন। যুবকদের ঘোড়ায় চড়া, প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা করিবার জন্য আপার সার্কুলার রোডে এক ক্লাব স্থাপিত হয়। যে

"আত্মোন্নতি সমিতি" (১) ইহার অগ্রে সংস্থাপিত হইয়া কার্য্য করিতেছিল, সে সমিতিও ইহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। এই ঘটনা বোধ হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বঙ্গে বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের পূর্ব্ব-সূচনায় দুইজন বৈদেশিকের প্রভাব ছিল। (২) তাহাদের একজন ভগ্নী নিবেদিতা—বোম্বাই-প্রদেশ পর্য্যটনের কালে মহামতি তিলকের সহিত পরিচিত হন। সেখানেও জনকতক মিলিয়া কার্য্য করিতেছিলেন। ইহারা নাকি মহারাষ্ট্র গুপ্ত-সমিতির সভ্য। এই দলের সভ্য শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ কলিকাতায় আসিয়া অগ্রে যে ভাসা ভাসা দলটি ছিল, তাহা দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করেন। ইহারই ফলে মহারাষ্ট্রীয় এবং বঙ্গীয় বৈপ্লবিক দলের সংযোগ স্থাপিত হয় ও উপরোক্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হয়। কার্য্যের প্রণালী এই প্রকার ছিল,—সভাপতিকে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের সংবাদ দিতে হইত। যিনি ক্লাবের অধিনায়ক হইয়া ছাত্রদের চালাইতেন তাঁহাকে কার্য্যের সংবাদ সভাপতিকে দিতে হইত এবং প্রত্যেক সভ্য স্বয়ং এক কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া ছাত্রদের মধ্যে কার্য্য করিত ও কার্য্যের ফল তাহার উপরিস্থিত নেতাকে জানাইত। এক কেন্দ্র অপর কেন্দ্রের কার্য্যের সংবাদ জানিত না। উদ্দেশ্য ছিল, একজন ধরা পড়িলে অন্য সব কর্ম্মীরা ও কেন্দ্রগুলি যেন ধরা না পড়ে এবং বিচ্ছিন্ন না হয়। কোন নূতন লোককে বৈপ্লবিক মতে আনয়ন করিতে পারিলে তাহাকে সমিতির মন্ত্র (৩) গ্রহণ করান হইত। এই দীক্ষামন্ত্র মহারাষ্ট্র হইতে নাকি আনয়ন করা হইয়াছিল। দীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা, হিন্দুশাস্ত্র, তরবারী ও প্রতিজ্ঞা বিশেষ উপকরণ ছিল। দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষাদাতার নাম কাহারও কাছে ব্যক্ত করিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এই প্রতিজ্ঞা তাহাকে করিতে হইত। দীক্ষাতে আমার যতদূর মনে হয় "ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের"

চেষ্টার কথা বলা হইত। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হইত, কারণ ইহা স্বামী রামদাসের আদর্শ ছিল। জানি না অহিন্দুর বেলায় কি ব্যবস্থা হইত। তবে আসল কথা এই যে, গুপ্ত-সমিতিতে অহিন্দু সভ্য বেশী ছিল না। হয়ত যাঁহারা আমাদের সঙ্গে মিশিতেন, তাঁহারা দীক্ষিত হন নাই। আমি কেবল হিন্দুশাস্ত্রের নাম প্রতিজ্ঞা করিতে অস্বীকার করাতে আমার জন্য উদার ব্যবস্থা (বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের পুস্তক স্পর্শ করান হইয়াছিল।

সমিতির সভ্যদের জন্য সামরিক কড়া নিয়ম (discipline) প্রচলনের চেষ্টা সর্ব্বদা করা হইত। একজন অপরের বিষয়ে কৌতূহল হওয়া বা প্রকাশ্যস্থলে তাহার সঙ্গে আলাপ করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার দীক্ষাদাতা এবং যিনি তাহার চালক হইতেন তাঁহার হুকুম মান্য করিতে হইত; বাঙ্গালীকে নিয়মের (discipline) মধ্যে আনয়ন করা এক অসম্ভব অথবা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বাঙ্গালী জাতি কথা-কুশল ও হুজুগে, তাহার মুখ বন্ধ করিয়া যন্ত্রের মতন কার্য্য করান—বিশেষতঃ যে কর্ম্মে নাম করিবার সুবিধা নাই সে কার্য্য করান—যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা যাঁহারা গুপ্তভাবে কার্য্য করিয়াছেন তাঁহারা জানেন। তথাপি প্রথমে এ বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক সভ্যকে প্রচারের কার্য্য করিতে হইত। কেহ হেদুয়ায়, কেহ গোলদীঘিতে, কেহ কলেজে ও হোষ্টেলে, কেহ-বা বার-লাইব্রেরিতে—যে যেখানে পারিতেন অন্য লোককে স্বীয় মতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন। হায়রে সেকাল! শিক্ষিত ব্যক্তিকে আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য যে স্বাধীনতা প্রয়োজন তাহা বুঝাইবার জন্য কত অকাট্য তর্কের প্রস্তাবনার দরকার হইত ও কত গলদঘর্ম্ম হইতে হইত! তখনকার যুবকদের আদর্শ ছিল

উকিল হওয়া, কংগ্রেসে গিয়া গলাবাজি করিয়া মক্কেল বৃদ্ধি করা ও বেশী বয়সে কাউন্সিলে গিয়া "মাননীয়" খেতাব পাওয়া।

"বাপরে! ইংরেজের সঙ্গে মারামারি করা, স্বার্থ ও আত্মত্যাগ করা যে ভীষণ ব্যাপার। স্বাধীনতা যে ঘোর সাংঘাতিক কথা, পালাও সে স্থান হইতে যেখানে এই প্রাণঘাতী কথা উত্থাপিত হয়"—ইহাই ছিল বেশীর ভাগ লোকের মনের ভাব। মনস্তত্ত্বের তথ্য এই যে, কাপুরুষ বা দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি তাহার চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে কোন এক সত্য প্রকাশমান হইলে সে তাহার দৌর্ব্বল্য হেতু সে সত্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয় ও নিজের দুর্ব্বলতাকে ঢাকিবার জন্য অসত্যের অবতারণা করিয়া সত্যকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। সাধারণ বাঙ্গালীর ইহাই মনস্তত্ত্ব। নিজেদের সাহসে কুলায় না, ইহা স্বীকার না করিয়া তখনকার বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টার বিপক্ষে সর্ব্বপ্রকার যুক্তির ফাঁদ পাতিতেন। তৎকালে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্বাধীনতাবাদ প্রচার করা এক ভীষণ ব্যাপার ছিল। তৎকালের মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের সাধারণের প্রাণে ভাবের উজান প্রবহমান করা যে কি কঠিন ব্যাপার ছিল তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। স্বদেশী-আন্দোলনের বন্যা না আসিলে বিপ্লববাদের অবস্থা যে কি হইত তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা দুরূহ। বৈপ্লবিক প্রচারকের দলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রি-প্রাপ্ত লোকদের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক-যুদ্ধ করিতে হইত, সেইজন্য প্রচারকদের ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনৈতিক-তত্ত্বের সংবাদ ভাল করিয়া রাখিতে হইত।

ইহা ত হইল চিন্তাক্ষেত্রের কথা। কর্ম্মক্ষেত্রে বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ব্যায়াম-ভূমি স্থাপন করিয়া ছাত্রদের আহ্বান করা হইত। সেস্থানে ব্যায়ামশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কথার চর্চা ও সঙ্গীত,

ম্যাটসিনির আত্মজীবনী, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের পুস্তকাবলী ও দেউস্করের 'দেশের কথা'' পাঠ, স্বদেশী কাপড় ব্যবহার, শিবাজি, প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম উৎসব, বন্দে-মাতরম সঙ্গীতের প্রচলন ইত্যাদি অনুষ্ঠান হইত। এইসব আখড়ায় স্থানীয় শিক্ষক বা যুবক উকিল বা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোক চালক হইতেন। এইসব বৈপ্লবিক কেন্দ্রই বঙ্গ-ভঙ্গের সময়ে স্বদেশী-আন্দোলনকে অন্তরাল হইতে চালাইয়াছিল কিন্তু তৎকালে এই সব কেন্দ্র স্থাপন করা বড় সহজ কাজ ছিল না। তৎকালে দেশের সেবা ও দশের সেবা একটা হাস্যোদ্দীপক দৃশ্য ছিল,—"ভারত-উদ্ধার" একটা ঠাট্টার সামগ্রী ছিল। (১) দেশের মাথার উপর উকিল, ব্যারিষ্টার ও "মাননীয়ের" দল নেতা সাজিয়া দেশটাকে অগ্রসর হইতে দিতেন না। কিন্তু একথা নিরপেক্ষ লোকদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বঙ্গের ও ভারতের রাজনীতিক স্রোত ঘৃণিত ও নগণ্য তথাকথিত অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত মজুর (পাঞ্জাব) ও ছাত্রের দল (বিশেষতঃ বঙ্গে) আত্মত্যাগের দ্বারা ওলট্-পালট্ করিয়া দিয়াছে।

বিপ্লব-শ্রেণীর লক্ষণ

কর্ম্ম যতই শক্ত হউক বিপ্লবপন্থীরাও নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং নিজেদের কর্ম্মের প্রভাবে বঙ্গে ও তাহার বাহিরে কেন্দ্র স্থাপনা করিয়াছিলেন। বিপ্লবপন্থীদের প্রধান চেষ্টা ছিল ছাত্রবৃন্দ ও বাবুর দলকে বিপ্লবপন্থীর অনুগামী করা ও সুবিধা হইলে রাজরাজড়ার দলকেও বিপ্লববাদী করা। কিন্তু এই চিন্তা কাহারও মাথায় তখন উদয় হয় নাই যে, কেবল বাবুর দলকে ভজিয়ে স্বাধীনতা সমরের কি সুবিধা হইবে।

১৯০২—১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৈপ্লবিক কর্ম্ম কেবল বাবুর দলই বিপ্লব করিবার চেষ্টায় নিয়োজিত করিয়াছিল, ফলে সমস্তই জন্মে

স্বতাহুতিতে পরিণত হইয়াছে ! আসল কথা, তখন আমরা কেহই বুঝি নাই "বিপ্লব" অর্থে কি বুঝায় এখনও অতি অল্প লোকেই একথার অর্থ বুঝেন)। বিপ্লব অর্থে কোন প্রকারে ইংরেজ তাড়ান নয়—এ কথা খুব অল্প বিপ্লববাদীই আজ পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন। বিপ্লববাদীরা সকলেই বুর্জোয়া বংশোদ্ভব। গরীব ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি ঘৃণা করা বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্থিমজ্জাগত স্বভাব। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কোন হিসাবের ভিতরেই আসে না। তাহাদের ডাকিলেই কুকুরের ন্যায় আসিবে ও বাবুদের কথায় ইংরাজ মারিবে—ইহাই আমাদের দেশের বুর্জোয়া দর্শনশাস্ত্র। তৎপরে ইংরাজ তাড়াইলেই আমাদের উকিল, ব্যারিষ্টার ও ডাক্তারের দল এবং ছাত্রদের মধ্যে যাহারা উকিল, ব্যারিষ্টার হইবার আশা রাখিতেন এইসব লোকেরাই ত রাজত্ব করিবেন, অতএব ছোটলোকদের জন্য কে মাথা ঘামায়! অর্থাৎ ভারতের রাজনীতি যেমন বুর্জোয়াদলের মধ্যে নিবদ্ধ, বিপ্লববাদও সেই প্রকার আজ পর্য্যন্ত বুর্জোয়াদলের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্য নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের বাহিরে নিরীক্ষণ করিবার সময় বা ইচ্ছা কাহারও হয় নাই।

যে কারণেই হউক চাষী, কুলী, মজুর, দোকানী, পশারি ইত্যাদি যাহাদের গণশ্রেণী বলা যায় তাহাদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করা আজ পর্য্যন্তও বঙ্গে বা ভারতে হয় নাই। ইহাই ভারতীয় বৈপ্লবিক সম্প্রদায় ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বৈপ্লবিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। বৈদেশিক বৈপ্লবিকপন্থা গণ-শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ অর্থাৎ শ্রমজীবীদের মধ্যেই আবদ্ধ। বিপ্লব অর্থে তাহারা বুঝেন, সমাজে এই প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে যে, যে জন্য সমাজ প্রপীড়িত হইতেছে তাহার মূল যেন দূরীভূত হয় অর্থাৎ সমাজে মনুষ্যের সামাজিক, অর্থনীতিক সামঞ্জস্য ও সাম্য সংস্থাপন করার নাম বিপ্লব।

কারণ এই সাম্যের অভাবেই মানুষ অত্যাচারিত ও প্রপীড়িত হয়। অবশ্য ইতালিতে বিপ্লবের সময়ে এই প্রকার সাম্য স্থাপিত হয় নাই, ইহা সত্য কথা। এই সাম্যের অভাবেই ইতালিতে বিপ্লববাদ আজ পর্যান্তও শেষ হয় নাই, এবং ইহাও সত্য যে তথায় আজ পর্য্যন্তও ম্যাট্‌সিনির মতবাদও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাঁহার "ঈশ্বর ও জনসমূহ" মতবাদাবলম্বী সমাজ কার্ল মার্ক্স কল্পিত গণবাদ প্রতিষ্ঠিত সমাজ না হইলেও বুর্জোয়ার স্বার্থযুক্ত সমাজ নয়। ইতালির বিপ্লব সামাজিক বিপ্লব না হইলেও ম্যাট্‌সিনি শ্রমজীবীদের সঙ্গে বরাবর কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে ইউরোপে বিপ্লবের ঢেউ বহিয়া গিয়াছিল তাহা বুর্জোয়া ডিমোক্রাটদের দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে সামাজিক বিপ্লব না হইলেও সামন্ততন্ত্রের বিপক্ষে পরিচালিত হইয়াছিল। আর ফরাসী বিপ্লব সমাজের অর্দ্ধেক ওলটপালট করিয়াছিল, এ বর্ত্তমানে রুষিয়ার বিপ্লব সমাজকে সম্পূর্ণরূপে ওলটপালট করিয়া দিয়াছে। এ হিসাবে আমাদের বিপ্লববাদ কি নূতন আদর্শ ও চিন্তাস্রোত লোক সমাজে দিয়াছে? জমার হিসাবে দেখি কিছুই নয়। ভারতীয় বিপ্লববাদীরা সামাজিক বা অর্থনৈতিক মতবাদ (World view) সাধারণে দিতে পারেন নাই; সমস্ত কর্ম্মটা ভূয়ার উপর চলিয়াছিল বলিয়াই ধোঁয়ায় পরিণত হইল। তবে এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, স্থানে স্থানে বিপ্লবী যুবকেরা জনসেবা কর্ম্মে (Social Service) নিজেদের নিয়োজিত করিতেন এবং যেস্থলে বৈপ্লবিক সমিতির শাখা স্থাপিত হইয়াছিল সেই স্থলে যুবকবৃন্দের মধ্যে নৈতিক আদর্শের উন্নতি হইয়াছিল।

১৯০২—৪ বা ৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতাই গুপ্ত-সমিতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। সভ্যেরা মধ্যে মধ্যে প্রচার কর্ম্মের জন্য বাহির হইতেন। একবার জনকতক গেরুয়া পরিয়া বাহির হইয়াছিলেন। বিভিন্ন জায়গায়

যাইয়া প্রচার করা, লোককে স্বমতে আনয়ন করা, তথায় সাধারণের জন্য একটা ব্যায়ামাগার স্থাপন করা ও একটা গুপ্ত-কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি গঠন করা প্রচারকদের কর্ম্ম ছিল। ( ) এই সময়ে ছাত্রভাণ্ডার নামক স্বদেশী দোকান আমাদের যুবকদের দ্বারা স্থাপিত হয়। স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের প্রত্যেক সহরে সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। বিপ্লব সমিতির প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে ছিল। পশ্চিম বঙ্গ সর্ব্ব বিষয়ে চিরকালই অনুর্ব্বরা। তৎপরে "যুগান্তর" কাগজ বাহির হওয়াতে নানা কারণে বাজারে নানা প্রকারের আজগুবী গল্প বাহির হইয়াছিল। লোকে আমাদের দলকে, রবিবাবুর "স্বদেশী-সমাজের" আন্দোলনকে ও চরমপন্থীর দলকে একদল ভাবিত ও সেইজন্য নানাপ্রকার গল্পেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ এখানে একটি গল্পের উল্লেখ করিতে চাই। একবার এক ভদ্রলোক আমাদের আফিসে আসিয়া নির্জ্জনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমি যদি তাঁহাকে স্বজাতি বলিয়া বিশ্বাস করি তবে এই কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে চান, "ইহা সত্য কিনা যে বঙ্গব্যাপী একটা বৈপ্লবিক সমিতি আছে এবং তাহার ১৬ জন প্রচারক দিবারাত্র সমস্ত দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ও সুবোধ মল্লিক সেই সমিতির কোষাধ্যক্ষ।" আবার অন্যদিকে অন্য কথাও শুনিয়াছি। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আমার পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া আমার সহিত দেখা হইলে বলিলেন, "দীনেন্দ্র রায় আমায় বলিলেন যে, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব একটা জেসুইট্, এই ছোঁড়ারা তাঁহার তালে নাচিতেছে।" ইহার অর্থ কি তাহা লোকে সহজেই বুঝিতে পারেন। শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় মহাশয়কে আমি ভালরূপেই ঘনিষ্ঠভাবে জানিতাম। সেইজন্য এই কটাক্ষে ভ্রূক্ষেপ করি নাই এবং এই কথাও সত্য যে আমরা কখনও তাঁহার তালে নাচি নাই। শ্রদ্ধেয়

উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত নানা কারণে বহু অগ্রেই আমার সহিত আলাপ পরিচয় ছিল। তিনি অগ্রে বিপ্লবী ছিলেন না অথবা সেরূপ মত প্রকাশ করিতেন না। "সন্ধ্যা" পত্রিকা প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই আমরা এক বৈপ্লবিক পত্রিকা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে-ছিলাম, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নেতাদের আনুকূল্যের অভাবে তাহা কর্ম্মে পরিণত করিতে পারা যায় নাই। পরে আমাদের "যুগান্তর" কাগজ বাহির হইবার বহু পরে রাজনীতির চর্চ্চা উপলক্ষে আমার সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়, শেষে তিনি বিপ্লবমতাবলম্বী হন। তাঁহার ফলে একবার "সন্ধ্যা" ছাপাখানা হইতে আমরা ইংরেজিতে "সোনার বাঙলা" ম্যানিফেষ্টো গুপ্তভাবে ছাপাইয়া লইয়াছিলাম। তিনি এই বঙ্গব্যাপী গুপ্ত-সমিতির সংবাদ জানিতেন না, সেইজন্যই একবার তিনি ও তাঁহার এক বাল্যকালের বিশ্বস্ত বন্ধু (১) আমায় বলিয়াছিলেন, "ভূপেন, তোমাকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া আমরা এক বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতি করিতে চাই।" অবশ্য এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার আশেপাশে অনেক বৈপ্লবিক মতাবলম্বী যুবকও ছিল।

বিপ্লববাদী ও অসাম্য দলসমূহ

এই ঘটনাগুলি এস্থলে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, তৎকালে সাধারণে কংগ্রেস-বিরোধীদলসমূহকে একদল বলিয়া ধরিয়া লইতেন। কিন্তু যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব নিরীক্ষণ করিতেন তাঁহারা স্পষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাইতেন। যথা,—উত্তর-বঙ্গের কোন এক প্রধান ও বিখ্যাত উকিল (সেই জন্য এক বড় নেতা) কলিকাতায় কংগ্রেসের সময় আসিয়া পার্থক্য বুঝিয়া বলিয়াছিলেন, "যাহা দূর হইতে এক শিবির বলিয়া

পরিলক্ষিত হয়, তাহা নিকটে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বিভিন্ন তাঁবু বলিয়া বোঝা যায়।" (১) ইহাতে অনেক সময় আমাদের কার্য্যের অসুবিধা হইত। কারণ, সাধারণের সম্মুখে খাড়া করিবার মত নামজাদা লোক কলিকাতায় আমাদের তখন ছিল না। ব্যারিষ্টারের দলের যাঁহারা আমাদের সমিতির পাণ্ডাগিরি করিতেন, তাঁহারা কেহই তখন বিশেষ নামজাদা ছিলেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'রক্তহীন বিপ্লবের" সুর গাহিতেন ও "গরম" দলের "পাণ্ডাগিরি" করিতেন। (২) এস্থলে বৈপ্লবিক সমিতি ও চরমপন্থী দলের সম্পর্ক বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পুরাতন চরমপন্থীর দল বলিলে ইহা বুঝাইত যে, কংগ্রেসের মডারেটদলের বা ভিক্ষাবাদী দলের বিপক্ষবাদী হইতে মায় উৎকট বৈপ্লবিক পর্য্যন্ত সকলেই চরমপন্থী দলের লোক ছিলেন। তৎকালে বিপ্লবীদল বলিলে কেবল ছোকরার দল বুঝাইত না, মফঃস্বলের বেশীরভাগ রাজনীতিজ্ঞ চরমপন্থী বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য ছিলেন বা সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তখন চেষ্টা হইতেছিল (অবশ্য একথা বলিতে পারি না যে জ্ঞাতসারে হইতেছিল) চরমপন্থাবাদকে বিপ্লববাদের বাহিরের খোলস করিয়া কার্য্য করা। চরমপন্থী দলের ভিতরে ভিতরে বিপ্লববাদীর দল নিজেদের সংগঠন গড়িবার চেষ্টা করিতেন। জনসাধারণের সম্মুখে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার বা স্বাধীনতার আদর্শ দিবার জন্য একটা প্রকাশ্য দলেরও দরকার। সেইজন্য বিপ্লবপন্থীরা চরমপন্থী দলের পুষ্টিসাধন করিতেন। কিন্তু একথা বলিতে পারি না যে অন্ততঃ বঙ্গে এ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। শুনিয়াছি অন্য প্রদেশে অনেকস্থলে রাজনীতিক চরমপন্থা বিপ্লবপন্থার বাহিরের আবরণস্বরূপ কার্য্য করিয়াছে। সেইজন্য বিপ্লববাদ তথায় তরুণবয়স্ক যুবকদের হস্তে ন্যস্ত হয় নাই এবং অন্যপক্ষে ইহাও সত্য যে সেই কারণে বিপ্লবপন্থা অন্যান্য প্রদেশে বিশেষভাবে প্রকট হইতে পারে নাই।

আমার মনে হয় দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গে এই দুই পন্থীরা একাভীভূত হইয়া কার্য্য না করার জন্য "স্বাতন্ত্র্য" মতবাদ আন্দোলনের ক্ষতি হইয়াছে। প্রথমতঃ বাঙ্গালায় চরমপন্থীদের নেতা হইলেন, জনকতক পেশাদার গলাবাজী-করা রাজনৈতিক পুরুষ; ভারতবাসীদের যে প্রকার সংস্কার তদনুযায়ী তাঁহারাও ভাবিতেন যে হুজুগ করিয়া ও গলাবাজী করিয়াই তাঁহারা কার্য্যোদ্ধার করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিপ্লব-সমিতির সংবাদ রাখিতেন বটে কিন্তু তাহা নগণ্য বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহারা বোধ হয় মনে করিতেন যে তাঁহাদের গলাবাজীর জোরেই ইংরেজ তাঁহাদের স্বরাজ "autonomy" বা "হোমরুল" দিয়া দিবেন। (১) মডারেটদের সঙ্গে ঝগড়া করা ছাড়া তাঁহাদের রাজনীতির আর দৌড় ছিল না, হয়ত ভবিষ্যতেও কিছু গঠিত হইত না। বিপ্লবপন্থীরা কেবল গোপনে কার্য্য করিয়াই কত কি করিবেন? দেশব্যাপী কার্য্য করিবার জন্য কে কত টাকা দিবে? স্বাধীনতাবাদকে জনসাধারণের সম্মুখে ধরা তখন সম্ভবপর ছিল না। হয়ত কিছু নরমভাবে দাঁড় করাইলে সাধারণে সাহস করিয়া সহানুভূতি দেখাইত, কিন্তু দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করা যে এই পেশাদার নেতাদের পক্ষে অসম্ভব! কারণ সর্ব্ব কর্ম্মের নেতা এই উকিল ও পেশাদার বক্তার দল তাঁহাদের এই পরম সুযোগ অনুযায়ী ব্যবসায় ব্যতীত আর কিছু বোঝেন না! এই প্রকারের লোকেরা আজ পর্য্যন্তও বুঝিতেছেন না যে, জনসাধারণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্যের পশ্চাতে এক শৃঙ্খলিত জমাট শক্তি না থাকিলে তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহারা বক্তৃতাতেই দেশোদ্ধার করিতে চাহেন। এই কারণে বঙ্গে আজ পর্য্যন্ত যথার্থ জাতীয় নেতার উদ্ভব হয় নাই। এইজন্যই রামসে ম্যাকডোনাল্ড আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "বাঙ্গালী যদি নেতৃত্ব করিতে জানিত তবে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অল্প সময়েই পরিবর্ত্তিত হইত।" এই কারণেই

বিপ্লববাদীরা চরমপন্থীদের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে লাগিলেন ও পরে নিজেদের কার্য্য সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে করিতে লাগিলেন। আমি যতদিন দেশে ছিলাম জানিতাম যে, আমরা এই বক্তৃতাবাগীশদের শ্রদ্ধা করিতাম না। ইহার কারণ গলাবাজী ছাড়া ইহাদের কোন গঠনশীল কর্ম্মপদ্ধতি ছিল না; বরং অনেক সঙ্কটের সময় মডারেটদের নিকট হইতে আমরা সাহায্য পাইয়াছি। (১) এই বিভেদের বিষময় ফল এই হইল যে, চিন্তাশীল ও প্রধান খ্যাতনামা নেতার অভাবে বিপ্লববাদীরা জনসাধারণের হৃদয়ে নিজেদের গ্রথিত করিতে পারেন নাই। তৎপরে নিজেদের দল হইতেও তাঁহারা এমন চিন্তাশীল ও খ্যাতনামা ব্যক্তির উদ্ভব করিতে পারে নাই, যাঁহাকে বা যাঁহাদের দেশের সাধারণের সম্মুখে দাঁড় করাইলে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারা যায়। এই জন্যই বিপ্লবপন্থীরা "অ্যানার্কিষ্ট" নামে আখ্যাত হইলেন ও তাঁহাদের কার্য্য গুপ্তভাবে নিবদ্ধ থাকিয়া সাধারণের বা জনসঙ্ঘের চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ফলে, পরে গুপ্ত বিপ্লব-সমিতি প্রকাশ্যে সাধারণের সহানুভূতি বা সাহায্য না পাওয়ায় এত ভিত্তিশূন্য হইয়াছিল যে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে অকৃতকার্য্যতার ফলে উহা আকাশে বিলীন হইয়া গেল। এক কথায়, বঙ্গীয় বিপ্লববাদের প্রধান দুর্ভাগ্য এই যে, ইহার মধ্যে সর্ব্ব-সাধারণের পরিচিত কোন শ্রদ্ধাস্পদ নেতার উদ্ভব হয় নাই। অবশ্য এ স্থলে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের কথা বলিতেছি না—যিনি বহুদিন হইতে বঙ্গত্যাগী হইয়াছেন। ভারতের ন্যায় স্থিতিশীল দেশে বিপ্লববাদের ক্রমবিকাশ বৈপ্লবিক গতিতে হইয়াছিল এবং প্রথম হইতেই গভর্ণমেণ্ট ইহা ভাঙিয়া দিতেছিল। (২) সেইজন্য বোধহয় কিছু দর্শনশাস্ত্র বা চিন্তাশীল ব্যক্তির উদ্ভব হইবার সুযোগ পায় নাই। ইউরোপে বিপ্লববাদের উৎপত্তি অন্যভাবে হয়। তথায় প্রথমে

কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বৈপ্লবিক দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। পরে তাঁহার শিষ্যবৃন্দ তাহা কর্ম্মে পরিণত করিবার চেষ্টা করে। যথা, ফ্রান্সে এনসাইক্লোপেডিষ্টের দল ও রুশো, জার্ম্মানীতে কার্ল মার্ক্স, রুষে বাকুনিন, ক্রপট্‌কিন, প্লেখানফ্‌ ইত্যাদি। তবে ম্যাট্‌সিনি ইটালির অতীতের বিপ্লবীদের কার্য্যের শেষ সময়ে আবির্ভাব হইয়াছিলেন ও নিজে একটি দার্শনিক মতবাদ সাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহার শিষ্যেরা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আর আমাদের সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল ও কল্পনাপ্রবণ বাঙ্গালীর হস্তে তাহা পড়িয়া তড়িৎগতিতে অন্য রাস্তা ধরিল। দেশের তদানীন্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লববাদের সম্পর্ক বড়ই কম ছিল। আমাদের "ন্যাশানালিস্‌ম্‌"ও বিদেশ হইতে আমদানী এবং "টেররিসম"ও বিদেশ হইতে আমদানী। (১) সেইজন্যই জনসমাজ হইতে বিপ্লববাদ বরাবর দূরে ছিল।

আমাদের বৈপ্লবিক কার্য্য যখন পূর্ণতেজে চলিতে লাগিল সেই সময় জনকতক লোক আমাদের দলের মধ্যে আসিয়া পড়ে। তাহাদের কার্য্য-কলাপ বাঙ্গালীর সম্পর্কীয় ভারতীয় বৈপ্লবিক ইতিহাসকে চিরকালের জন্য কলঙ্কমণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। ইহাদের একজনের নাম নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে গোস্বামী আমার কাছে আসে। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়ীতে আসিয়া আমাদের কোন এক পশ্চিম বঙ্গের নেতার (২) পত্র আমার হস্তে দেয়। তাহাতে তিনি গোস্বামীর পরিচয় দিয়া লিখেন যে ইহাকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়া দলভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু গোস্বামী কেবল গুপ্তকথা জানিতে চায়। সেইজন্য তিনি কি করিবেন তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া আমার কাছে পাঠাইয়াছেন। গোস্বামীর সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিলাম যে কাজটা

কাঁচা হইয়াছে। অল্পদিনের পরিচয়ে তাহাকে গুপ্ত দলে প্রবেশ করান উচিত হয় নাই! ব্যাপারটা এই, আমাদের মফঃস্বলের কর্ম্মীরা এ সব কর্ম্মে তত পাকা নন। কি করিয়া দল পুষ্টি করা যায় ইহার চেষ্টাই সকলে করেন। তারপর ধনাঢ্য ঘরের ছেলেকে দলভুক্ত করার লোভ যে এইস্থলে ছিল না তাহা আমি অস্বীকার করি না। গোস্বামী বলিল যে, সে আমাদের যুগান্তর আফিসে গিয়াছিল। সেখানে আমাকে সে পায় নাই। সেজন্য আমার বাড়ী আসিয়াছে। কথায় কথায় বলিল যে, সে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য আমেরিকা যাইতে প্রস্তুত, স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে বলিয়া তাহার পিতার সহিত তাহার বনিবনাও হইতেছে না ইত্যাদি। আমি সমস্ত শুনিয়া তাহাকে দ্বিতীয় দিন আমার বাড়ীতে আসিতে বলিলাম; কারণ সেইদিনই আমার কোন সহযোগীর সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিব। তৎপরে আমি যুগান্তর আফিসে যাই। সেখানে অবিনাশ বলে, "একটা লোক তোমাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল। তাহাকে পুলিসের গোয়েন্দা ভাবিয়া ভাগাইয়া দিয়াছি!" হায়রে, এইটে যদি প্রথম হইতে সত্য বলিয়া বুঝিতাম! আমি হাসিয়া বলিলাম যে, সে অমুকের পত্র লইয়া আমার কাছে আসিয়াছে, সন্দেহের কারণ নাই। দ্বিতীয় দিনে আমার বাড়ীতে গোস্বামীর সঙ্গে বারীনের আলাপ করাইয়া দিলাম। গোস্বামী আলিপুরের মোকদ্দমায় বলিয়াছিল, "অরবিন্দই আমাকে বারীনের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়াছে" ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এই সময়ে গোস্বামী আমাদের সঙ্গে আমেরিকা যাইবার চর্চ্চা করে ও শেষে বলে, "আমি চোখে ভাল দেখিতে পাই না, লড়াই শিখা আমার দ্বারা হইবে না, আমি আমেরিকায় যাইব না।" প্রথম দিন আমেরিকায় যাইয়া লড়াই শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র আর দ্বিতীয় দিন তাহার সে ইচ্ছা চলিয়া গেল। বোধহয় তাহার দুই দিন বাদে সে আমাদের আফিসে আসিয়া

বারীনের সঙ্গে ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহে। তাহার ফলে বারীন আমায় বলে, "দেখ, গোস্বামীর সঙ্গে তাহার বাপের স্বদেশী ব্যাপার লইয়া ঝগড়া হইয়াছে; সে আর বাপের বাড়ীতে থাকিতে পারে না, আমাদের আফিসে থাকিতে চায়, তুমি কি বল? আর এখানে থাকিলে লোকটা আমাদের হাতে থাকে" ইত্যাদি। আমাদের আফিসে গোস্বামীর আস্তানা লইবার ইচ্ছায় আমার সায় দেওয়ায় সে তথায় আসিয়া অধিষ্ঠান হইল। গোস্বামীর সঙ্গে আমার কখন ভাল মেশামেশি হয় নাই অর্থাৎ তাহার কলিকাতার বকাটে ছোকরার চাল চলন দেখিয়া আমি তাহার কাছ হইতে দূরে থাকিতাম, কিন্তু বারীন তাহার সঙ্গে মেশামেশি করিত। পরে সে নাকি বারীনের কাছে আত্ম-জীবনী বিবৃত করিয়াছিল যে, সে বকামির চূড়ান্ত করিয়াছে কুৎসিৎ ব্যায়রামগ্রস্ত হইয়াছিল ও তাহার পিতা তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার সে সব দুর্নীতি দূর হইয়াছে। সে প্রবৃত্তিমার্গের চূড়ান্ত করিয়া এক্ষণে নিবৃত্তিমার্গে আসিয়াছে ও পূর্ব্ব দুষ্কর্ম্মের জন্য বিশেষ অনুতপ্ত, বাকী জীবনটা সে স্বদেশের কার্য্যে অতিবাহিত করিতে চায়। এই প্রকার চরিত্রের লোককে আমাদের গুপ্ত-সমিতিতে সভ্য করার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। তবে এইস্থলে ইহা তাহার বিগতচরিত্র বলিয়া আমরা তাহাকে মাপ করিয়া লইয়াছি। আমরাও ইহাকে 'Prodigal son' বলিয়া ভাল কার্য্য করিবার সুযোগ এইজন্য দিয়াছিলাম যে সে তাহার পূর্ব্বের চালচলন তখন ছাড়িয়া দিয়াছিল।

গোস্বামী আমাকে বরাবর বলিয়াছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের একজন Statutary civilian তাহার বন্ধু। পরে যখন সে বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন এই কথাটা আমার কানে বরাবর বাজিত এবং মনে আজ পর্য্যন্তও এই প্রশ্ন উদয় হয় যে, গোস্বামীর এই দুই ঘটনার মধ্যে কোন

নিগূঢ় সম্পর্ক আছে কি না। সাধারণের হয়ত বিশ্বাস, গোস্বামী প্রাণের ভয়ে বা জেলের ভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। এ মতে আমি সায় দিই না। যতদিন যাইতেছে ততই আমার বিশ্বাস বাড়িতেছে যে গোস্বামী প্রথম হইতেই আমাদের দলে পুলিশ-গোয়েন্দারূপে ঢুকিয়াছিল। যাঁহারা গোস্বামীর সহিত আলিপুর জেলে ছিলেন তাঁহারা আমার এ মতে সায় দেন না। আমি কেবল আমার মত এইস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই বিষয়ে আমি কাগজে পত্রে কোন প্রমাণ দেখাইতে পারি না। আমার বিশ্বাস **Circumstantial evidence**-এর উপর নির্ভর করে। সে প্রথম হইতে আমাদের দলের মধ্যে ঢুকিতে চায় এবং সকলকার সঙ্গে মিশিতে চায়। তাহার প্রথম বুলি হইল আমেরিকায় গিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিব, দ্বিতীয় দিনে সে বুলি বন্ধ করিল। তারপর হঠাৎ আমাদের আফিসে আস্তানা লইল ও "ভবানী-মন্দির" স্থাপনার জন্য চাঁদা তুলিবে বলিয়া সমিতির মাতব্বর লোকদের সঙ্গে মিশিতে লাগিল। তাহার মতলব কেবল সব লোককে চেনা ও সব গুপ্ত-খবর জানা। তৎপরে সে বুলিও অন্তর্হিত হইয়াছিল। পরে বারীনের সঙ্গে সে ফুস্ ফুস্ করিয়া ডাকাইতি করার গল্প ফাঁদিত। আমাদের দলে অনেক ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু একমাত্র বারীন ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। তৎপরে দেওঘরে ও বৃন্দাবনে গিয়া সাধুবেশে তাহার বিপ্লববাদ প্রচার করিবার সখ হইয়াছিল। এইসব জায়গায় গিয়া অনেকের কাছে সে আবোল-তাবোল বকিয়াছিল। দেওঘরে কোন বিখ্যাত ও ধনী জমিদারের কাছে গিয়া প্রকাশ্যে এই প্রকার আহাম্মকি করিয়াছিল। এই জমিদার পরে আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি আপনাদের সাবধান করিয়া দিতেছি যে এই লোকটা সন্দেহজনক।"(১) শেষাশেষি সে আর কাহারও সহিত মিশিত না। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আর আমাদের আফিসে থাকিত না।

হয়ত বাড়ীতে থাকিত। কেবল যতীনের কাছে আসিয়া সে ডাকাইতি করার পরামর্শ করিত। গুপ্ত-সমিতির সকল সভ্যের সহিত তাহার আলাপ বা ঘনিষ্ঠতা হয় নাই, কেবল "যুগান্তর" সম্পর্কিত লোকদের সহিত আলাপ হইয়াছিল। এইজন্য সকলকে সে ধরাইয়া দিতে পারে নাই। ১) তবে আমরা তাহাকে দলভুক্ত করিয়াছিলাম ও বিশ্বাস করিতাম বলিয়া কেহ তাহাকে অবিশ্বাসও করিত না। শেষে, দেওঘরে গোস্বামীর বংশের কোন লোক যতীনকে ও আমাকে বলিয়াছিলেন "এই লোকটাকে আপনারা বিশ্বাস করিবেন না।" এই সদুপদেশে আমরা তখন হাসিয়াছিলাম।

ভাগলপুর জেলেযখন আমি শুনিলাম যে গোস্বামী বিশ্বাসঘাতক হইয়া সরকারী সাক্ষী হইয়াছে তখন আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে পূর্ব্বোক্ত সিভিলিয়ানের সহিত তাহার বন্ধুত্বতার কথা স্মরণ হইল। তখন এই সন্দেহ মনে জাগরিত হইল যে এই সিভিলিয়ান বন্ধুর প্ররোচনাতেই কি সে দলে ঢুকে নাই? আমার মনে এই তর্ক উপস্থিত হয় যে, আমাদের যে-কেন্দ্রে সর্ব্বপ্রথম সে দলভুক্ত হইয়াছিল সেই কেন্দ্রের উপর পুলিশ বড়ই উৎপাত করিতেছিল। হয়ত তাহার কর্ম্মচারী বন্ধু তাহাকে বলিয়াছিল, "ইহাদের ভিতর ঢুকিয়া দেখ ব্যাপার কি।" সেকেন্দ্রের নেতা কাঁচা লোক। জমিদারের ছেলে দেখিয়া তিনি তাহাকে শীঘ্রই দলভুক্ত করেন ও কলিকাতায় আমার কাছে পাঠান। তৎপরে সে একজন হইতে আর এক জনের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। সে গুপ্ত-সমিতির বড় বড় পাণ্ডাদের কেবল দেখিতে চাহিত ও গুপ্ত ব্যাপার জানিতে চাহিত। সে ঢুকিয়াছিল হয়ত সামান্য তথ্য বাহির করিতে শেষে দেখিল ভীষণ ব্যাপার। তৎপরে শুনিয়াছি, তাহাকে ধরিবার সময় পুলিশ তাহার সহিত অন্যান্য কয়েদীদের হইতে পৃথক ব্যবহার করিয়াছিল। এইজন্যই

মনে হয়, বৈপ্লবিক গুপ্ত ব্যাপার জানিবার জন্যই সে গুপ্ত-সমিতিতে ঢুকিয়াছিল। তবে পুরস্কারের কথা—সে কথা সাধারণে কি করিয়া জানিবে? পরে শুনিয়াছি, আলিপুর জেলে যখন প্রকাশ পাইল যে গোস্বামী সরকারী সাক্ষী হইবে তখন তাহাকে অনেক বুঝান হইয়াছিল। তাহাতে সে উত্তর দেয় যে, সে মরিতে পারিবে না। আমার বোধ হয় তাহা ভাণমাত্র। যে লোকটার এত উৎসাহ ছিল সে বিনা নির্য্যাতনে বিশ্বাসঘাতকতা করিল, এইরূপ দৃষ্টান্ত বৈপ্লবিক ইতিহাসে লিখে নাই, বাঙ্গালাতেও না। যাহারা একবার করে, হয় তাহারা ভয়ে করে, না-হয় নির্য্যাতনেই করে।

গোস্বামীর মৃত্যু-শাস্তিতে নাকি ইউরোপীয় বৈপ্লবিকেরা বাহ্‌বা দিয়াছিলেন। প্যারিসের সোসালিষ্ট (উপস্থিত কম্যুনিষ্ট) মুখপত্র "Humanite" নাকি লিখিয়াছিল, ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা যে প্রকারে শত্রুপুরীর ভিতর থাকিয়াও রক্ষীবেষ্টিত বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহিকে শাস্তি দিয়াছে, তাহা জগতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে প্রথম।

গোস্বামীর চরিত্র দ্বারা কখনও বৈপ্লবিকদের চরিত্রের সমালোচনা বা বিচার করা যায় না। এখানে পরিষ্কার করিয়া বুঝান দরকার যে, বিপ্লববাদী ও বিপ্লবী এই দুয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। গোস্বামী কিছুদিনের জন্য বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার জীবন-চরিত্র বিপ্লবীদের স্বরূপ বুঝিবার কোন প্রকার মাপকাঠি নহে।

কর্ম্মের প্রসার

স্বদেশী যুগের শেষাশেষি অর্থাৎ ১৯০৬—০৭ খৃষ্টাব্দে আমাদের সমিতি বঙ্গের বাহিরে বিস্তৃতি লাভ করে। বাঙ্গালার বৈপ্লবিক হাওয়া উড়িষ্যার গিয়া বিশেষভাবে লাগে। ৺দেবব্রত বসুই সর্ব্বপ্রথমে উড়িষ্যার কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপরে বারীন্দ্র, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্যেরা

তথায় যান। আমিও সে প্রদেশে তিন বার যাই। উড়িষ্যায় দলে দলে বাঙ্গালী (উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী) উড়িষ্যাভাসী যুবকের দল, মাষ্টার, উকিল, লেখক, ডাক্তার, জমিদার বড় বড় মঠের মোহান্ত (১) ও উচ্চপদস্থ প্রবীণ ব্যক্তিরা আমাদের দলভুক্ত হইয়াছিলেন বা সহানুভূতি দেখাইতেন। কটকের ব্যায়াম-সমিতি আমাদের দলের একটি বড ব্যায়াম-সমিতি ছিল। (২) একসময়ে কটক, পুরী, বালেশ্বর ও অন্যান্য স্থানসমূহ আমাদের সমিতির কার্য্যের ফলে স্বদেশী-আন্দোলন ও বিপ্লববাদে মুখরিত হইত। উড়িষ্যায় যা-কিছু স্বদেশী আন্দোলন তাহা আমাদের দলের লোকের দ্বারাই সংঘটিত হইত। উড়িষ্যাবাসীর এত বৈপ্লবিক উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্ববঙ্গ ও উড়িষ্যা এই দুই জায়গায় আমাদের বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। এই সময়ে উড়িষ্যার "মালিকা" সম্প্রদায়ের গল্প আমরা শ্রবণ করি। ইহা একটি পুরাতন বৈষ্ণব সম্প্রদায়। (৩) সম্বলপুরে কল্কি-অবতারের প্রকট হইবার কথা ইহাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে। উড়িষ্যাতে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম যে, উড়িষ্যার লোক স্বাধীনতাবাদকে বাঙ্গালার লোকের চেয়ে শীঘ্র গ্রহণ করিয়াছিল। যে কারণেই হউক (৪) উড়িষ্যায় আমাদের কার্য্য খুব বিস্তৃতিলাভ করে কিন্তু ইহা যে অনেকটা 'হুজুগ' মাত্র তাহা বোধগম্য হইয়াছিল তখন, যখন গবর্ণমেণ্ট উড়িষ্যাবাসী ও domiciled বাঙ্গালীদের (কেরা) ডেপুটি ও সাব-ডেপুটিগিরি দেন। তখন একদল যুবক যাঁহারা স্বাধীনতা পন্থার পাণ্ডাগিরি করিতেন তাঁহারা সরকারী চাকুরী লইয়া দল হইতে অন্তর্হিত হইলেন বা এই মতবাদ ভুলিয়া গেলেন। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে ইহাই মনে হয় যে, উত্তর-পশ্চিম ও উড়িষ্যা তৎকালে চিন্তার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বঙ্গ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পশ্চাতে ছিল। তৎকালে এইসব প্রদেশে ধর্ম্ম ও

সামাজিক সংস্কারের হুজুগ ছিল। বৃদ্ধেরা সংস্কারকের দলে ছিলেন; কিন্তু যুবকদের মন কোন প্রকারের সংস্কার দ্বারা আবদ্ধ না থাকায় স্বদেশী-আন্দোলনের মধ্য দিয়া স্বাধীনতাবাদের বাণী শ্রবণ করে। কিন্তু তাহাদের চিন্তা-শক্তির স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা না থাকায় সে মতবাদ দৃঢ়ীভূত হইতে পারে নাই, তাহা হুজুগে পরিণত হইয়াছিল এবং যখন প্রধান প্রধান কর্ম্মীরা ডেপুটি সাবডেপুটি হইল তখন বালকের দলআর কি করিবে? প্রধান কর্ম্মী-দের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বোধহয় শেষে কর্ম্মক্ষেত্রে ভাঁটা পড়িয়াছিল।

ইহার বাহিরেও বিপ্লববাদের ঢেউ লাগে। সুদূর দক্ষিণ-ভারত আমাদের কর্ম্মের একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র হইয়াছিল। ১৯০৬ খৃঃ আমাদের দলের শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস দক্ষিণ-ভারত হইতে জাহাজ লইয়া জাপানে যান। জলযাত্রা করিবার সময় তিনি তথাকার চিদাম্বরম্ পিলাই নামক একটি উকিলের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সংশ্রবের ফলে তথায় নানা প্রকার স্বদেশী কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়: যথা "স্বদেশী ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী" ও অনেক ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এইসব কর্ম্মের প্রধান নেতা চিদাম্বর পিলাই মহোদয় কলিকাতায় আমাদের সঙ্গে দেখা করিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি কাহার দ্বারা এইসব কর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "তারক ব্রহ্মচারী(১) (তারকনাথ দাস এই নামেই জাপানে গিয়াছিলেন।) যখন আমার বাড়ীতে থাকিতেন তখন প্রত্যহ তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেন,—'ভগবান যেন আমাকে দেশের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিবার শক্তি দেন।' তিনি আমায় কিছু বলিতেন না। এই প্রার্থনা দেখিয়াই আমার মন বদলাইয়াছিল।" এই অঞ্চলের স্বদেশী ও স্বাধীনতামতবাদী কর্ম্ম এই প্রকারে আরম্ভ হয়; কিন্তু কি প্রকারে তাহা ভাঙ্গিয়া যায় ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সে বিষয় জানেন।

এইসব কর্ম্মের সঙ্গে পশ্চিম-ভারতে আমাদের দল কর্ম্মক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করিবার চেষ্টা করে। স্বদেশী-আন্দোলনের আগে ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতি আমাদের দলের কতিপয় যুবক ম্যাজিক লণ্ঠন সঙ্গে লইয়া বিহার প্রদেশে প্রচার করিতে যান। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা স্বাধীনতাবাদ প্রচার করিতেন। ইঁহাদের সহিত বিহারের একটা পুরাতন ছত্রভঙ্গ বৈপ্লবিক দলের এক পাণ্ডার সহিত আলাপ-পরিচয় হয়। (১) তৎপরে "ভবানী মন্দির" স্থাপনা উপলক্ষে আমাদের জনকতকের বিহারে গমনের ফলে আরা, (২) বাঁকিপুরের সহানুভূতিসম্পন্ন উকিল, মাষ্টার ও ছাত্রদলের সহিত পরিচয় হয়। ইঁহারা স্বদেশী-আন্দোলন করিতেন এবং আমাদের কার্য্যের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। পরে মন্দিরের জন্য নগরের মাতব্বর লোকদের নিকট সহানুভূতি পাওয়া যায়। পশ্চিমে এই প্রকারে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করে। উত্তর-পশ্চিমের বিভিন্ন সহরে আমাদের লোক মাষ্টারি করিতে গিয়া এক একটি ছোট খাট কেন্দ্র স্থাপন করেন ও ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতা-বাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, বিপ্লববাদ হিন্দি বা হিন্দুস্থানী-ভাষীদের মধ্যে বিশেষভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই। কারণ জানিনা, হয়ত স্থানীয় লোকদ্বারা প্রচার করান হয় নাই বলিয়া ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বিশেষ ফল লাভ হয় নাই অথবা তৎস্থানীয় ছাত্রবৃন্দের মানসিক চিন্তা তৎকালে বিপ্লববাদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। এইস্থলে আমি স্বদেশী-যুগের কথা বলিতেছি। ভবিষ্যতে কি হইয়াছিল তাহা আমি জানি না। চাইবাসায় (সিংহভূম) কোন ঘটনা হইতে এই অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছি যে কোন কোন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক নিজে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতাবাদী হইলেও বাঙ্গালীকে এ কর্ম্মে বিশ্বাস করিতে রাজি হইতেন না। এর কারণ বাঙ্গালা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজকে সাহায্য

করিয়াছিল। ইহা ছাড়া উত্তর-পশ্চিমের গণশ্রেণীর লোক বা সিপাহীদের সহিত কথা কহিলে তাঁহারা বলিতেন, "আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত কিন্তু ভদ্রশ্রেণীকে অগ্রে জাগিতে হইবে ও আমাদের সাহায্য করিতে হইবে।" তাঁহারা বলিতেন, "আমরা কুমারসিংহের দেশের লোক, আমাদের কাছে এ কথা নূতন নহে, তবে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মিউটিনির মতন আবার অকৃতকার্য্য যেন না হয়। কারণ বে-সরকারী লোক তখন আমাদের সাহায্য করে নাই।" কথাটা সত্য। বৃথা রক্তপাত এবং নৃশংস হত্যা ও জুলুমের ফলে উত্তর পশ্চিমের জনসাধারণ ভয়ে দমিয়া গিয়াছে। আমাকে পরলোকগত পুরীর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য বলিতেন, "বাবা, রক্তপাত, হত্যা ও অত্যাচারের ছবি আমার চক্ষে আজ পর্য্যন্ত ভাসিতেছে। আবার যেন সে প্রকার উৎপাত আমাদের উপর না হয়।"

উত্তর-পশ্চিমে আমরা যে প্রকার কৃতকার্য্য হই নাই, ছোটনাগপুরে তৎবিপরীত হইয়াছিল। রাঁচি ও চাঁইবাসায় বাঙ্গালী ও বিহারী ছাত্রদের মধ্যে অনেককেই পাওয়া যায়। রাঁচি আমাদের বড় একটি কেন্দ্র হইয়াছিল। (১) রাঁচিতে একটি হিন্দুস্থানী পল্টনের এক অংশ আমাদের দলের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করে। (২) ছোটনাগপুরে কোন বিদ্রোহের নায়ক (৩) বীরশা ভগবানের দলের তৎকাল ন নেতার ৪) সন্ধানে আমরা ছিলাম, কিন্তু সাক্ষাৎলাভে কৃতকার্য্য হই নাই। বীরশা ও তাহার স্থানীয় তৎকালীন নেতা খৃষ্টান ছিলেন। সন্ধান করিয়া শুনিয়াছিলাম যে নেতা মোহন সর্দ্দার জঙ্গলের মধ্যে থাকেন। তাঁহার সহিত আলাপ করা সম্ভব নয়। এই প্রকারে কোলদের মধ্যে কার্য্য করা সম্ভব হয় নাই বটে তবুও দরকার হইলে কোলদের ক্ষেপাইবার আশা রাখিতাম।

হিন্দুস্থানী-ভাবীদের সহিত ঘনিষ্টতার ফলে কলিকাতায় জনকতক বিহারী ছাত্রের সহিত বিশেষ ঘনিষ্টতা হয়। (৫) ইহারা উৎসাহিত হইয়া

হিন্দী-ভাষায় "যুগান্তরের" এক সংস্করণ বাহির করিবার পরামর্শ আমাদের সহিত করিয়াছিলেন এবং টাকাও উঠাইয়াছিলেন। এইজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে মনে পড়ে না কি কারণে এই উদ্যোগ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। হয়ত পুলিশের হাঙ্গামার জন্যই এ চেষ্টা স্থগিত হয়।

এই প্রকারে বঙ্গের বৈপ্লবিক দলের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। ক্রমে আমরা পঞ্জাবের কর্ম্মীদের সহিত পরিচিত হই। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ হরি চরণ মুখার্জ্জী নামক একজন বাঙ্গালী যুগান্তরের আফিসে আসেন। (১) ইহার সহিত আমার আলাপের সময় ইনি বলেন যে, পঞ্জাবে ইহারা জনকতক বড় নেতার পশ্চাতে থাকিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। পঞ্জাবের সেই সময়ের রাজনৈতিক গোলমালের নায়কেরা এই দলের লোক। ইহারা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য প্রভৃতি জনহিতকর কর্ম্মেও ব্যাপৃত ছিলেন। অবশ্য কংগ্রেস রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্যভাবে ইহারা গরমপন্থী ভেকধারী। এই দলই পরে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীকে পঞ্জাবে লুকাইয়া রাখিয়াছিল ও শেষে আমাদের লোক বোম্বাইতে যাইয়া তাহাকে জাহাজে চড়াইয়া দেয়। চন্দ্রকান্ত আমার কাছে গল্প করিয়াছিলেন যে এই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির বাসাতেই সে অজিত সিংহের সহিত মিলিত হইয়াছিল। জানি না, সুফি অম্বাপ্রসাদের (যাঁহাকে ইংরেজ যুদ্ধের সময় ইরাণে হত্যা করে বলিয়া জনরব আছে) সহিত এ দলের কি সংস্পর্শ ছিল। কিন্তু শুনিয়াছি তিনি পঞ্জাবের সর্ব্বপ্রথম বিপ্লবী। পরে অম্বাপ্রসাদ, অজিত সিংহ ও হৃষিকেশ এবং আরও একজন পঞ্জাবী যুবক ইরাণে পলাইয়া যান। ইহাদের মধ্যে হৃষিকেশ নামক যুবকটি আমার কাছে সমস্ত পলায়ন ব্যাপার বর্ণনা করেন। যখন অজিত সিংহের সহিত এই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির অন্তরঙ্গতা ছিল ও সুফির সহিত অজিত সিংহ পারস্যে

পলায়ন করেন তখন বোধহয় ইহারা একদলভুক্তই ছিলেন।

এইরূপে বঙ্গীয় গুপ্ত-বিপ্লবসমিতি চারিদিকে কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি করে। কিন্তু পরিখা যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, গভীরতা ততই কমিতে লাগিল। সমস্ত কর্ম্মকে কেন্দ্রীভূত করা বড়ই মুস্কিল হইয়াছিল। প্রথমতঃ বাঙ্গালীকে কড়া নিয়মের ভিতর আনা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সভাপতি মহাশয় লাঠি ভাঁজা ছাড়া আর কিছু বুঝিতেন না; কাজেই অনুশীলন সমিতি ছাড়া আর কোন কার্য্যের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। যে লোক তাঁহার তাঁবেদার থাকিত সে ই তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হইত অথচ এই পৃষ্ঠপোষকতার মূল্য বিশেষ কিছুই ছিল না। আমরা আমাদের যুবক নেতা পাইয়াছিলাম। তবে যখন সমস্ত বঙ্গ হইতে অনেক নামজাদা উকিল, ডাক্তার ও জমিদারের দল সম্বাৎসরিক কন্‌ফারেন্সের সময় সম্মিলিত হইতেন তখনই শুধু সভাপতিমহাশয়নেতৃত্ব করিতেন। ১)আসলকথা এই যে, আমরা বঙ্গে এমন কোন নেতা পাই নাই যিনি সর্ব্বপ্রকারের বৈপ্লবিক কর্ম্মের কদর বুঝিতেন এবং সর্ব্বকর্ম্ম ও কর্ম্মীদের নিজের হাতে লইয়া কেন্দ্রীভূত করিতেন। তবে ইনি প্রবীণ ব্যক্তি ও বঙ্গের একজন প্রাচীন বিপ্লববাদী এবং ইনি কংগ্রেসে নাম করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া সমস্ত জীবন এক মতবাদ স্থায়ীরূপে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন।

ইহা হইল বঙ্গের বিপ্লববাদের প্রাচীন ইতিহাস। কিন্তু স্বনামধন্য দক্ষিণাপথের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক ছিল? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতি কাল্পনিক নিখিল ভারত সমিতির এক শাখা মাত্র, সেইজন্য মহারাষ্ট্র সমিতির ভগ্নী। আমাদের বলা হইয়াছিল যে মহারাষ্ট্রীয়েরা সমস্ত ভারত সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছেন ইত্যাদি কিন্তু কাজের বেলায় দেখা গেল "কাকস্য পরিবেদনা।" ভারতের বাহিরের মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীদের একথা বলিলে তাঁহারা হাসেন ও বলেন, বরোদা হইতে

আনীত এই "আষাঢ়ে গল্প" তাঁহাদের অজ্ঞাত। বোধহয়, এককালে যাহা কিছু ছিল তাহা মহারাষ্ট্রীয়দের চরিত্রের সতর্কতার ভাব প্রবল বলিয়া ও ভাবপ্রবণতার অভাব বলিয়া বাঙ্গালার ন্যায় বাহিরে ফুটিয়া উঠে নাই। তবে স্বাধীনতামতাবলম্বী তজ্জন্য বিপ্লবমতাবলম্বী অনেকলোক মহারাষ্ট্রীয়-দের মধ্যে আছেন। স্বাধীনতা মতবাদে দক্ষিণাপথ এক সময়ে শীর্ষস্থানীয় ছিল। মহারাষ্ট্রই এ বিষয়ে বাঙ্গালার পথ-প্রদর্শক। যাহাই হউক, মহারাষ্ট্রে যে বাঙ্গালী বিপ্লবীরা কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার করেন নাই তাহার কারণ তাহা "তেলো মাথায় তেল মাখান" হইবে। প্রথমে আমাদের দলপতিরা মহারাষ্ট্রের বিপ্লবকর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বড়ই সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে কোন এক বিখ্যাত নেতার পত্র লইয়া একজন ব্যক্তি বাঙ্গালায় আসেন এবং আমাদের সভাপতির সহিত সাক্ষাৎ করেন। (১) ইহার ফলে ঐ বৎসর কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে আমাদের তরফ হইতে ৺দেবব্রত বসু তাহাদের দলের নেতাদের (২) সহিত কার্য্যের আলাপ করেন। পর বৎসর শিবাজী উৎসব উপলক্ষে মহারাষ্ট্রীয় নেতারা কলি-কাতায় অসিয়া আমাদের দলের সভাপতির সহিত সাক্ষাৎ করেন; এবং এই বৎসরের আমাদের সম্বাৎসরিক কন্‌ফারেন্সের সময় কেহ কেহ কথা তুলিয়াছিলেন যে, ১৯০৬ খৃঃ জাতীয় কংগ্রেসে আগত মহারাষ্ট্রীয় নেতাদের সহিত কার্য্যের আলাপাদি করিবেন কিন্তু শেষে আমাদের মধ্যে ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে আমাদের গুপ্ত-সংবাদ তাঁহাদের দেওয়া হইবে না।

বঙ্গের পুলিশ-বিভাগে আমাদের দলের লোককে ঢুকাইবার ইচ্ছা বরাবরই ছিল। পরে দলের অনেক যুবকই ডেপুটি, সাবডেপুটি, সাব-ইনস্‌পেক্টর ও পুলিশের অন্য-প্রকার কর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্ত হন। ইহারা কি পরে বৈপ্লবিক কর্ম্মে পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছেন? এ সংবাদ আমার অজ্ঞাত। একবার এক ডেপুটি যুবক আমায় লিখিয়া-

ছিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন যে তাঁহার শ্রেণীর লোকেরা স্বদেশের বিষয় বিস্মৃত হয় কিন্তু তিনি সে মসলায় সৃষ্ট নন, তিনি নিজের মন্ত্র ভুলিবেন না। জানি না তিনি তাঁহার মন্ত্র কতদূর স্মৃতিতে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সাধারণ কোন কোন ঘটিরাম ডেপুটির ও গুপ্ত-পুলিশ ইন্সপেক্টরের কথা যখন সাধারণে বাহির হয় তখন বৈপ্লবিক দলের কোন কোন দীক্ষিত ডেপুটি ও পুলিশ কর্ম্মচারীর নামই উল্লেখ হইতে দেখি। (১)

বিপ্লববাদীর সঙ্ঘ

কোন্ প্রকারের ছেলে বৈপ্লবিক দলে ঢুকিত?—এ প্রশ্নের উত্তর সহজে দেওয়া যায় না। যাঁহারা "ভারতের মঙ্গলের জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন" এই মতবাদ গ্রহণ করিতেন ও তাহার জন্য নিজে কিছু করিতে প্রস্তুত তাঁহারাই বৈপ্লবিক দলভুক্ত হইতেন। অবশ্য আগে তাঁহাদের চরিত্রের বিষয় সন্ধান করিয়া লইয়া তাঁহাদের দলভুক্ত করা হইত। ইহাদের ভিতর কেহ কেহ হুজুগে জুটিত ও পরে পলাইত, কিন্তু এ প্রকার যুবকের সংখ্যা কম ছিল। যুবকদের কিছুদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দলভুক্ত করা হইত। তবে এ প্রকারের লোকও দলে আসিয়াছিল যাহারা সুবিধাবাদী চরিত্রের লোক,—সামাজিক সুবিধার জন্য দলভুক্ত হইত। এ প্রকারের লোক নবীন উকিল, ডাক্তার ও শিক্ষক শ্রেণী হইতেই আসিত। তাহাদের এসব কার্য্যে intellectual appreciation ছিল। দশজন লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে তাহাদের উৎসাহ ছিল, স্বদেশী-আন্দোলনের সময় হুজুগের কার্য্যে "গরম দলের" চাঁই হইত, কিন্তু স্বার্থত্যাগ কিম্বা সাহস বা আত্মত্যাগের প্রয়োজন হইলে তাহারা পশ্চাৎপদ হইত।

ইহারা ভারতীয় স্বাধীনতাকাঙ্খী রাজনীতি-মতবাদী তজ্জন্ত তাহাদের 'বিপ্লববাদী' বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহাদের 'বিপ্লবী' বলা যায় না।

এস্থলে আমি বিপ্লবমতবিশ্বাসী ও বিপ্লবীদের মধ্যে প্রভেদ করিতেছি। প্রথমোক্ত প্রকারের ব্যক্তি এই মতবাদের খাতিরে হয়ত কিছু পয়সা দিতে পারেন বা দুই একজন লোককে এইমতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন বা পিছনে থাকিয়া অন্ত প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন কিন্তু প্রকৃত বৈপ্লবিক কর্ম্মে তাঁহারা সাহস দেখাইতে পারেন না। কিন্তু যিনি বৈপ্লবিক কর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করেন এবং এই আদর্শের জন্য প্রতিপদে জীবনকে বিপন্ন করিতে দ্বিধা করেন না, তাঁহাকেই যথার্থ বিপ্লবী বলে। এই প্রকার চরিত্রের ব্যক্তি সকলে হইতে পারেন না। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের মত এই যে, এ প্রকার চরিত্রের মানসিক অবস্থা সচরাচর লোকের হয় না, এবং মস্তিকের অস্বাভাবিক (Pathologized) অবস্থা না হইলে বৈপ্লবিক কর্ম্মেও লিপ্ত হওয়া যায় না এবং তন্মধ্যে সকলেই 'Propaganda of act' (বাস্তব বৈপ্লবিক প্রচার) যথা—বোমাছোঁড়া, অত্যাচারীকে হত্যা করা, বাড়ী পুল, ব্যাঙ্ক উড়াইয়া দেওয়া ইত্যাদি করিতে পারেন না। বাঙ্গালায় বিপ্লবীদের অনেকেই Propaganda of act-এর রাস্তায়ই গিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহারা কেবল Terrorism কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন। সচরাচর যাঁহারা বৈপ্লবিক দলে আসিতেন তাঁহারা উচ্চ আদর্শের ও ভাল চরিত্রের লোক হইতেন। প্রচলিত রাজনীতি অবলম্বনে ভারতের মঙ্গল হইবে না, তজ্জন্ত স্বাধীনতা চাই এবং সেই স্বাধীনতার জন্ত চেষ্টা করা উচিত ও আমি তাহার জন্ত খাটিব ;—এই যুক্তি ধরিয়া যুবকেরা বৈপ্লবিক দলভুক্ত হইত। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা কিশোর বয়স্ক বা নব্যযুবক ছিলেন তাঁহারা ভাবপ্রবণ বলিয়াই কর্ম্মে উৎসাহ, সাহস ও স্বার্থত্যাগ করিতে পারিতেন। জগতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে দেখা যায়, কিশোরবয়স্ক বা উঠ্‌তি বয়স্ক লোকেরাই

বৈপ্লবিক কর্ম্মে সাহস দেখায়। ভারতে বা বাঙ্গালায় তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি যে, বঙ্গে-বিপ্লববাদ বুর্জোয়া-(Bourgeois শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল বা এক্ষণেও আছে। জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বুর্জোয়াশ্রেণী পূর্ণ-বৈপ্লবিক হয় না। বুর্জোয়াশ্রেণী আভিজাত্য-শ্রেণীর অধিকার ও আধিপত্যের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় বটে কিন্তু তাহাদের বৈপ্লবিকতার দৌড় আর বেশীদূর অগ্রসর হয় না। তাহাদের আদর্শ হইতেছে একটা নিয়মতন্ত্রানুযায়ী শাসন সংগঠন করা, যাহা দ্বারা তাহাদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষিত হয় ও নিজেরা নিরাপদে লাভবান হইতে পারে। বুর্জোয়াশ্রেণী (মধ্যমশ্রেণী) আভিজাত্য-শ্রেণীকে ঈর্ষ্যার চক্ষে ও নিম্নস্তরের গণশ্রেণীকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। ভারতের মধ্যমশ্রেণীর মধ্যেও এই সমাজতত্ত্বীয় নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। এই জন্যই ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এবং বিপ্লববাদেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই এবং এই কারণেই ভারতীয় রাজনীতিক আন্দোলনের আদর্শ ক্ষুদ্র ও তজ্জন্য বিপ্লববাদের আদর্শও ক্ষুদ্র। তবে প্রভেদ এই যে, বাঙ্গালায় পুরাতন আভিজাত্য বংশসমূহ না থাকায় অথবা রাজনীতিক ও অর্থ-নৈতিক কারণসমূহের জন্য সামন্ততন্ত্রবাদ (feudalism) পশ্চিম-ভারতের ন্যায় মূলবদ্ধ হইতে না পারায় বা ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায়, বঙ্গের সমাজ অনেকটা সাম্যবাদী। এই কারণসমূহের জন্য পশ্চিম-ভারতের অনেক লোকের মনে যে প্রকার সূর্য্যবংশীয় বা চন্দ্রবংশীয়, তুর্কির সুলতান বা * কাবুলের আমীর, নিজাম বা নেপালের মহারাজা ভারতের স্বাধীন সম্রাট হইবেন বলিয়া গাঁজাখুরি খেয়ালের উদ্ভব হয়, বাঙ্গালীর মনে সচরাচর

* এই অধ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হইবার সময় তুর্কীতে সুলতানাৎ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তাহার উদয় হয় না। বিশেষতঃ বাঙ্গালী ইংরেজী ভাষায় ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস বড় বেশী পড়িয়াছে। সেজন্য বাঙ্গালী যুবক সাধারণতঃ সাধারণতন্ত্রী। বঙ্গে বিপ্লববাদীদের বুর্জোয়া-সাধারণতন্ত্র (Bourgeois-democracy) আদর্শ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। তবে ভারতের সমাজে যে পুরাতন ব্রাহ্মণ্যবাদ ও সনাতন ইসলামবাদের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে ও তাহাদের বিপক্ষে যে আধুনিক সাম্যবাদ কার্য্য করিতেছে—এই দুই বিভিন্ন স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতের সমন্বয় আজও হয় নাই; বিপ্লববাদী দলের মধ্যেও সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা হয় নাই। আমার মনে হয়, বিপ্লববাদীদের চিন্তার মধ্যে এই দুই স্রোতের সংঘর্ষ হয় নাই, বোধ হয়, তাহা সমান্তরাল ভাবে (Parallel) বহিত, সেই জন্যই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ বঙ্গীয় বিপ্লববাদীদের মনে কখনও উদয় হয় নাই। "যে যেমন আছ, সে সেই রকম থাক, কোন প্রকারে ইংরাজ ভাগাইধা দাও, তৎপরে না হয় একটা নিয়মতন্ত্রানুযায়ী শাসনতন্ত্র স্থাপন করা যাইবে"—এই প্রকারের অস্পষ্ট চিন্তা মনের জড়াবস্থার (static) সাক্ষ্য দেয়। যদি আমাদের মনে এই দুই চিন্তা-স্রোতের যথার্থই সংঘর্ষণ হইত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই একটা নূতন চিন্তাপ্রবাহ দেশে বহাইতে পারিতাম ও একটা নূতন আদর্শ লোকসমাজে ধরিতে পারিতাম।

আমাদের মনে ও চিন্তায় পূর্ণ-বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই বলিয়াই বিপ্লববাদীরা দেশে বিপ্লববাদের পূর্ণ লহরী তুলিতে পারেন নাই ও পারিতেছেন না। আসল কথা, আমাদের মন পরিবর্ত্তনশীল (Dynamic) নহে। একটা বড় আদর্শ বা নূতন একটা মতবাদ যাহা "গতানুগতিক" হইতে নূতন তাহা আমরা মস্তিষ্কে উপলব্ধি করিতে পারি না। আমাদের মন বৈপ্লবিক নহে বলিয়াই আমরা জগতের এত পশ্চাতে রহিয়াছি। কবি টেনিসন্ সত্যই গাহিয়াছেন—

"Better fifty years of Europe
Than a coyle of a Cathay"

এই সব কারণে বঙ্গের বিপ্লববাদে বুর্জোয়া-সাম্যবাদানুযায়ী সাধারণতন্ত্রবাদ রাজনৈতিক আদর্শ হইয়াছিল। আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লববাদ ?—বুর্জোয়া সমাজনীতিতে তাহা হারাম্। এই বুর্জোয়াতান্ত্রিক-আদর্শের আন্তর্জাতিক নাম 'ন্যাশনালিসিম্' (জাতীয়তা)। তবে বহির্জগতে এই আদর্শ অনেকের কাছে যতই আপত্তিজনক ও ঘৃণিত হউক না কেন, ভারতীয় ইতিহাসের ক্রম-বিকাশের পর্য্যায়ে তাহার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী ও তাহা আসিয়াছে। অবশ্য এ আদর্শ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূর্ণ স্বাধীনতাবাদমূলক নহে। এ আদর্শের দৌড় "বিদেশী আমলাদলের" বিপক্ষে ঝগড়া করা, তাহা বিনা রক্তপাতেই হউক বা রক্তপাতেই হউক। (১)

এ আদর্শ দার্শনিকক্ষেত্রে ভুলই হউক বা অপূর্ণই হউক বা ক্ষুদ্রই হউক, বঙ্গের তৎকালীন রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা চরমপন্থা ছিল এবং তদুপরি বিপ্লবীরা "বিদেশী আমলাদলের' সঙ্গে শুধু ঝগড়াই করিতে চাহিতেন না, সমগ্র বিদেশীয়দের দেশ হইতে বিদায় করিতে চাহিতেন। ইহা ভিন্ন আর চরমপন্থার (radical) চিন্তা তখনকার লোকের মনে আসিত না। এইজন্য ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা একটা বিশেষ ধরণের বিপ্লববাদ ছিল। এই বিপ্লববাদ তখন অনেক যুবককে স্বদেশের কার্য্যে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল এবং অনেকেই এই আদর্শের বেদীর সম্মুখে স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ করিয়াছেন।

ইহাই হইল ভারতের বা বঙ্গের রাজনীতির আদর্শ। এক্ষণে কথা হইতেছে জগতের বিপ্লববাদের ইতিহাসে ভারতীয় বিপ্লববাদের স্থান কোথায় ? এস্থলে উল্লেখ্য যে ভারতীয় বিপ্লববাদ বঙ্গেই বিশেষ

ভাবে প্রকট হইয়াছিল কিন্তু বঙ্গীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমগ্র ভারতীয় আন্দোলন হইতে পৃথক করা যায় না। গুপ্ত-সমিতি স্থাপনার সংকল্প দক্ষিণাপথ হইতে আমদানী। তাহার রীতিনীতি এবং পদ্ধতিও তৎপ্রদেশীয়। অর্থাভাবে রাজনীতিক ডাকাইতি করাও কি তান্তিয়া ভীলের দলের অনুকরণ নহে? অথবা কেহ কেহ বলিবেন ইহা আনন্দমঠ হইতে গৃহীত, কেহ বলিবেন ইহা অর্থাভাবের স্বতঃসিদ্ধ প্রণালী, কিন্তু কোন্‌টা সত্য? রাজনীতিক হত্যাও কি চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের কার্য্যের অনুকরণ নহে? তবে বঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে "বোমার" আবির্ভাব হইয়াছিল। বঙ্গের বিশেষত্ব এই যে, ভারতীয় বিপ্লববাদে যে বীজ নিহিত ছিল বঙ্গে তাহা প্রস্ফুটিত হয়। অন্যান্য প্রদেশেও বিপ্লববাদ প্রকটিত হইলে তাহার ক্রমবিকাশ যে বঙ্গের ন্যায় হইত না তাহা বলা যায় না। যদিচ অনেক সময় মনে হয়, বঙ্গে যে প্রকারে রাজনীতিক ডাকাইতি হইত তাহাতে বঙ্গীয়মনস্তত্ত্বের (Race Psychology) বিশেষত্বের আভাষ পাওয়া যাইত।

এক্ষণে এই ভারতীয় বিপ্লববাদ বা সঙ্কীর্ণভাবে ধরিলে, বঙ্গীয় বিপ্লব আন্দোলন জগতের অন্য বিপ্লববাদের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখি যে ইহার বিশেষত্ব অর্থাৎ নিজস্ব বিষয়ে অন্যান্য দেশের সহিত তাহার পূর্ণ তুলনা চলে না। ভারতীয় বিপ্লববাদের লক্ষণ বা স্বরূপ এই:—গুপ্ত-সমিতি, রাজনীতিক ডাকাইতি, ব্যায়ামাগার সংস্থাপন, গুপ্তভাবে বিপ্লববাদ প্রচার, রাজনীতিক হত্যা, গণসঙ্ঘ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা, কেবল ছাত্রশ্রেণী অথবা বুদ্ধিজীবী দ্বারা (intellectual) আন্দোলনের পুষ্টিসাধন, কোন নির্দ্দিষ্ট রাজনীতির প্রণালীর (Party programme) অভাব, বিপ্লববাদের কেবলমাত্র রাজনীতিক বিপ্লবের চেষ্টায় পর্য্যবসান, চিন্তাক্ষেত্রে জড়তার (Static) অবস্থা, সামাজিক ও অর্থনীতিক

বিপ্লববাদ হইতে দূরে থাকা, বিপ্লববাদে সমাজ ও অর্থনীতিক Socid-Economic প্রোগ্রামের অভাব ইত্যাদি। এই প্রকারের ক্রমবিকাশ পৃথিবীর অন্যান্য বিপ্লবকালে সংঘটিত হয় নাই। তবে ভারতীয় বিপ্লববাদের লক্ষণসমূহ ব্যষ্টিভাবে (individualy) পৃথিবীর বিভিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলনসমূহের মধ্যে পাওয়া যায়। যদি প্রথম হইতে গণনা করিতে হয়, তবে ফরাসী বৈপ্লবিক আন্দোলনই বিপ্লবেতিহাসের প্রথম। ইহার সহিত ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের তুলনাই হয় না। সে প্রখর মুক্তিচিন্তা. সে জ্ঞানের ভাণ্ডার, সে মানবের মুক্তি-লাভেচ্ছার প্রবল বাসনা, সে উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা ভারতে কোথায়? সে আন্দোলনের সহিত ভারতের আন্দোলনের তুলনা হয় না। তৎপরে ইতালীয় কারবোনারির (Carbonary) দল। ইহাদের লক্ষণ গুপ্ত-সমিতি, হয়ত গুপ্তহত্যা, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট আদর্শের অভাব। ভারতীয়দের বৈপ্লবিক লক্ষণ ইহাদের সহিত কতকভাবে মিলে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। তৎপরে আসে রুষের Decembrist-দের দল, যাহারা আশী বৎসর আগে সে দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। বিখ্যাত রুষীয় লেখক Dostoiosky ইহার অন্যতম। ইহা ছাত্র ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর দল (intellectual) দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। ইহারা অবস্থাপন্ন শ্রেণী হইতে আসিয়াছিল। ইহাদের স্বরূপ ভারতীয়দের সহিত কতকভাবে মিলে বটে কিন্তু শেষোক্ত দল পূর্ব্বোক্তদের হইতে সর্ব্ববিষয়ে বহু অগ্রসর।

তৎপরে আসে রুষীয় সমাজ-বৈপ্লবিক দল (Social Revolution-aries)। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট (concrete) প্রোগ্রাম ছিল না। ১) ইহারা গুপ্তহত্যা (terrorism) করিত। বিদেশে যাহারা রুষীয় বৈপ্লবিকদের বোমা ছোঁড়া ও রাজনীতিক হত্যার কথা শুনিয়াছেন তাহা এই সমাজ

বৈপ্লবিক দলের এবং আনার্কিষ্ট দলের দ্বারাই সংঘটিত হইত। ইহারাই কথায় কথায় বোমা ছুঁড়িতেন। ইহাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস জগতে অতুলনীয়। রুষীয় বিপ্লবের প্রথমাবস্থায় ইহারাই কর্ণধার ছিলেন। কেরেন্স্কি এই দলের লোক ছিলেন। ইহারা নিজেদের কৃষকশ্রেণীর মঙ্গলেচ্ছু বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের সাহসিকতা ও অত্যাচারী রাজকর্মচারীদের হত্যা করা বিষয়ে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে, বিশেষতঃ বঙ্গের "বোমা" ইহাদের কাছ হইতেই নকল করা। তবে ইঁহারা যে প্রকার কৃষকদের প্রতিনিধি ছিলেন ভারতের বিপ্লবীরা তৎবিপরীত—গণসংঘ হইতে সর্ব্বপ্রকারে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তৎপরে বলশেভিকের দল—তাঁহারা সোসালিষ্ট—গুপ্তহত্যা বোমা ছোঁড়া ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন না; তাঁহাদের সহিত ভারতীয় কোন পন্থারই তুলনা হয় না। সর্ব্বশেষে ন্যাশানালিসিমের বড় পায়গম্বর ম্যাটসিনির দলের কথা উল্লেখ্য। ম্যাটসিনির দল গুপ্ত হত্যায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু ম্যাটসিনি নিজে কার্ল মার্ক্সের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তাঁহার একটা সামাজিক ও অর্থনীতিক (Socio-economic) প্রোগ্রাম ছিল। তিনি যে প্রকারে ছাত্রদের মধ্যে কর্ম্ম করিতেন, সেই প্রকারে শ্রমজীবীদের মধ্যেও কর্ম্ম করিতেন। (১) আমরা ম্যাটসিনির "ন্যাশনালিসিমের" সংবাদ রাখি. কিন্তু খবর রাখি না যে ম্যাটসিনি আন্তর্জাতিক ছিলেন, তাঁহার জাতীয়তাতে শ্রেণীবিভাগ ছিল না, পুরোহিত ও ধনীশ্রেণীর স্থান বা অত্যাচারের স্থান ছিল না। তাঁহার সামাজিক অর্থনীতিক দর্শনশাস্ত্র (Socio-economic Philosophy) কার্ল মার্ক্সের মত হইতে পৃথক হইলেও তাঁহার "জাতীয়তাবাদ" আজকালকার ইউরোপীয় বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হইতে বিভিন্ন। তাঁহার "(God and People)" প্রোগ্রামের ভিতর যে বুর্জোয়া ন্যাশ-

নাজিসিম্ ছিল না আমরা একথা জানি না বা ভুলিয়া যাই। তৎপরে থাকে জগৎ-বিখ্যাত আনার্কিষ্ট সম্প্রদায়। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় বিপ্লবীদের জগতের সম্মুখে বদনাম করিবার জন্য তাঁহাদের আনার্কিষ্ট বলেন। ইহা ঘোর মিথ্যা কথা। আনার্কিষ্ট এক রাজনীতিক-সমাজ নীতিক আদর্শ। তাঁহাদের সঙ্গে ভারতীয়দের কিছুই মিলে না। ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা হইতেছেন বুর্জোয়া-ন্যাশন্যালিষ্ট (Bourgeois Nationalist) মাত্র, বৈপ্লবিক জগৎ ইহাদের অন্য আসন দেয় না।

এই প্রকারে বিপ্লববাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখি যে ভারতীয় বিপ্লববাদ সর্ব্বাংশে অন্য দেশের বিপ্লববাদের সহিত মিলে না। বরং দেখি ভারতীয় বিপ্লববাদ অনেক বিষয়ে কাঁচা ছিল বা আছে; এখনও অপূর্ণতা ও অপরিপক্কতা অবস্থা প্রাপ্ত। কিন্তু ব্যক্তিগত সাহস ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ভারতীয় বিপ্লবীরা কাহারও কাছে হার মানে না। (১ কেবল দেখা যায় যে, ভারতীয় বিপ্লববাদ চিন্তাশীলতার অভাবে বন্ধাবস্থায় অবস্থিত। ইহা দেখিয়াই অনেকে মনে করিতেছেন যে ভারতীয় স্বাধীনতাবাদ অন্তিমকাল প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু ইহা ঘোর ভ্রান্তি মাত্র।

বিপ্লববাদীদের চরিত্র

আমাদের স্বাধীনতাবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাই যে—ইহা পূর্ণ-মুক্তির দূত নহে। এক্ষণে বিপ্লবীদের স্বরূপ কি প্রকার ছিল বা আছে? ভারতীয় বিপ্লববাদী বা বঙ্গ-প্রদেশীয় বিপ্লববাদী সাধারণের নিকট কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে; অথবা তাহাদের চরিত্র একটা হেঁয়ালী-পূর্ণ যে সাধারণের বুদ্ধির অগম্য থাকিয়া লোকের ধারণা। বঙ্গ-প্রদেশীয়

বিপ্লবাদীর চরিত্র মূলত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লববাদীর চরিত্র হইতে পৃথক নহে; তবে আমি এখানে বঙ্গ-প্রদেশের কথা কহিতেছি, সেইজন্য বাঙ্গালী বৈপ্লবীদের কথাই বর্ণনা করিতেছি। সুতরাং ইহাকে প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট বলিয়া অভিযোগ করিবার কোন হেতু হইবে না। বঙ্গ-প্রদেশের বৈপ্লবীরা কি প্রকারের জীব, লোক এখনও উপলব্ধি করিতে পারে নাই। অনেকের কাছে বঙ্গীয় বিপ্লবীরা "আষাঢ়ে গল্পের" মাল-মশলা হইয়া আছে। অনেক প্রকার আজগুবি ও রোমান্টিক গল্প তাঁহাদের নামে প্রচারিত আছে। সাধারণের ধারণা—ইহারা অদ্ভুতকর্ম্মা, ক্ষিপ্রহস্ত, কৌশলপূর্ণ ও মাতৃভয়শূন্য। সত্য বলিতে, ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন্ সাহসিক কর্ম্ম না ইহারা করিয়াছেন! বিপ্লববাদ প্রচার করা, বোমা প্রস্তুত করা ও তাহার ব্যবহার করা, বিদেশী সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশ করা, গোয়েন্দার বিপক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা, স্বীয় প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়া, লাঠির বদলে লাঠি চালান, গুলির উপরে গুলি চালান, অস্ত্র আমদানির চেষ্টা করা, মরুভূমিতে গিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে কার্য্য করা, দেশী সিপাইদের মধ্যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য সুয়েজ কানালের নিকট কান্তারার মরুভূমিতে শত্রুগুলি উপেক্ষা করিয়া কার্য্য করার প্রচেষ্টা, মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া রাত্রিতে সুয়েজ কানালে সাঁতারের উদ্যম, আরও অনেক প্রকারের সাহসিকতা প্রদর্শন ভীরুতা-অপবাদগ্রস্ত বঙ্গভাষী যুবকবৃন্দ দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল! সাধারণ বঙ্গভাষীদের নিকট ওসব গুপ্তকথা। কারণ তাঁহারা এক জগতে বাস করেন ও বিপ্লবীরা অন্য জগতে বাস করেন।

প্রকাণ্ড সভাসমিতি ও কাগজ পত্রাদিতে যাহা নিয়া হৈ চৈ হয় তাহাই সাধারণের নিকট ইতিহাস; আর বিপ্লবীদের কর্ম্ম যবনিকার অন্তরালে ও তাহাদের জগৎসাধারণের চক্ষুর অগোচরে থাকে, সেই জন্যই তাঁহাদের

ইতিহাস অপ্রকাশিত থাকে। তবে বিভিন্ন লোকের মুখে শুনিয়া ইহাই উপলব্ধি করিয়াছি যে, সাধারণে (যে কোন রাজনীতিমতাবলম্বী লোক হউক না কেন) যুবকদের কার্য্যের জন্য বাহবা দিয়াছেন, যুবকেরা একটা কিছু সাধারণ বাঙ্গালীর ক্ষমতা-বহির্ভূত সাহসের কর্ম্ম করিলেই লোকের মনে গৌণভাবে একটা সহানুভূতি বা প্রশংসা জাগিয়া উঠিয়াছে। (১) এই জন্যই বিপ্লববাদ সকলে গ্রহণ না করুন, বিপ্লবীদের সাহসের কার্য্য বঙ্গ-প্রদেশের জাতীয় গৌরব ও শ্রদ্ধার স্থল হইয়াছিল। বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছি যে, বঙ্গীয় বিপ্লবী যুবকেরা বাঙ্গালী জাতির সারস্বরূপ ও স্পর্দ্ধার স্থল। ইহা যিনি অস্বীকার ক'রন তিনি সত্য স্বীকার করেন না। এই জাতীয় স্পর্দ্ধাতে হিন্দু ও মুসলমান ভেদ নাই। এমনও দেখিয়াছি যে বাঙ্গালী-মুসলমান প্রথমে মুসলমানী চাল করিয়া আমাকে উত্তর দিয়াছিল, "বাঙ্গলা ভুল গিয়া বাবু"। তৎপরে পঞ্জাবী মুসলমানের সহিত ঝগড়া করিয়া বুক ফুলাইয়া আমার সম্মুখে বলে, "আমরা বাঙ্গলা-দেশের লোক, আমাদের দেশের ছেলেরা কলিকাতায় ইংরেজকে বোমা মারিতেছে, আমরা কি দশ টাকা মাহিনায় ইংরেজের সিপাহীগিরি করিব ?" (এই ঘটনাটি যুদ্ধের সময় জার্ম্মানিস্থিত কয়েদী ভারতীয় সিপাই ও খালাসীদের মধ্যে ঘটিয়াছিল)। ইহাও সত্য কথা যে, বঙ্গের মনুষ্যত্বও ইহারাই জাগাইয়া দিয়াছেন। এই জন্যই আফগানসীমান্ত বাসী পাঠানরাও বাঙ্গালার বাহবা করে এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কাবুলে যখন একদল ভারতীয় বৈপ্লবিক ডেপুটেশন এন্‌ভার পাশা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তখন তিনি সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালী বিপ্লবীদের কথাই জিজ্ঞাসা করেন। (২) ইহাদের সাহসের জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাঙ্গালীর খাতির বৰ্দ্ধিত হইয়াছে।

বৈপ্লবিক চরিত্রের উৎস

এহেন বাঙ্গালী যুবা কোন্ প্রেরণার বলে বলীয়ান হইয়া নিজেকে কোরবাণী করিত ও মৃত্যু-ভয়কে তুচ্ছ করিত? কোন্ নৈতিক বলে ইহারা অনুপ্রাণিত হইয়া অদ্ভুতকর্ম্মা হইয়াছিলেন? কোথা হইতে বল আসিয়াছিল? কোন্ মন্ত্র ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল? ভারতের ইতিহাসে দেখি যে মহারাষ্ট্রীয় জীবন প্রভাতের অগ্রে নামদেব, তুকারাম ও স্বামী রামদাসের ধর্ম্মচর্চ্চা, শিখ জাতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বাবা নানক হইতে গুরুগোবিন্দ সিংহ পর্য্যন্ত অষ্ট গুরুর কর্ম্ম ও উপদেশ, আর বঙ্গে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন হইতে নব বৈদান্তিকদের বেদান্তচর্চ্চা দ্বারা বঙ্গে মহা তেজপূর্ণ নৈতিক শক্তির সঞ্চার হয়। এই নৈতিক শক্তি বঙ্গে বিপ্লববাদে আত্ম-ত্যাগের মহাপ্রেরণারূপে আবির্ভাব হয়। এস্থলে ইহা উল্লেখ্য যে, যদিচ ব্রাহ্মসমাজ ও তৎপূর্ব্ব আন্দোলনাদি বঙ্গে নূতন আলোক আনয়ন করিয়াছিল, মুখ্যভাবে গীতোক্ত রাজনীতি বেশীর ভাগ বঙ্গভাষী বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সহচরকে সাহস দিবার জন্য যেরূপ "ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ" উপদেশ বিপ্লবীরা দান করিতেন, তদ্রূপ আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" তত্ত্বজ্ঞান তাঁহাদের নৈতিক তেজ আনয়ন করিত। (১) পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জাতীয় স্বাধীনতা-রূপ বিপ্লবীপন্থা বিপ্লবীদের নিকট ধর্ম্মস্বরূপ হইয়াছিল। এই ধর্ম্মতেজই তাঁহাদের সর্ব্ব কর্ম্মের সহায় হইয়াছিল। এস্থলে আমি সাধারণের কথা বলিতেছি, বিশেষতঃ যাহারা বিপ্লবপন্থার মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন তাঁহাদের কথা বলিতেছি, খলিত পদের ও আদর্শচ্যুত অথবা সুবিধাবাদীর কথা বলিতেছি না।

বঙ্গের বর্ত্তমান কালের ইতিহাস তিনবার মহা প্রেরণায় অনুপ্রাণিত

হইয়া বঙ্গভাষী যুবক সমাজকে উদ্বেলিত করিয়াছিল। প্রথম, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময়; দ্বিতীয়, আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেনের সময়; তৃতীয়, বিপ্লববাদীদের যুগে। শেষোক্ত কথাটা এক্ষণে বেশী "বড কথা" বলিয়া শুনায় কিন্তু ভবিষ্যতের ইতিহাস ইহার সিদ্ধান্ত করিবে। মহাপ্রভুর সময়ে বঙ্গে অনেকে মহা আদর্শে মাতিয়াছিলেন ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু সে আন্দোলন ধর্ম্মক্ষেত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের আদর্শে বঙ্গের নবীন যুবক প্রচলিত ধর্ম্ম ও সামাজিক সংস্কার ভাঙ্গিয়া নবভারত স্থাপন করিবে বলিয়া মাতিয়াছিলেন। তাঁহাদের গৃহ ও সমাজের তাডনা ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত বটে কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলনের লোকেদের ন্যায় জীবনের সহিত "ছিনি-মিনি" খেলিতে হইত না, তাঁহারা রাজনীতির ধারে যাইতেন না। চৈতন্যদেবের দল হুসেন শাহের বিপক্ষে যাইতেন না; অথবা কেশবচন্দ্রও ইংরেজ শাসন-কর্ত্তাদের বিপক্ষে যাইতেন না; বরঞ্চ "রাজভক্তি" কেশবচন্দ্রের নববিধান ধর্ম্মের সাইনবোর্ডে ক্ষোদিত ছিল। এই দুই পন্থাই "Render unto Caesar, what is Caesar's and unto God what is God's" নীতি অবলম্বন করিতেন। এই জন্যই ইহারা গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে বাধা ও নির্য্যাতন প্রাপ্ত হইতেন না। কিন্তু বিপ্লববাদীদের পন্থা অন্য প্রকারের ছিল। "Render unto Caesar, what is Caesar's" এই খানটাতেই তাহাদের সঙ্গে ঝগডা। ঘরের গঞ্জনা, গভর্ণমেন্টের নির্য্যাতন ভোগ ও প্রাণহানি প্রতিপদে তাঁহাদের আছে। একে তো কার্য্য গুপ্ত, সাধারণের সাহায্য নাই, অর্থ-সাহায্যের প্রত্যাশা নাই, প্রকাশ্য আন্দোলনের সমস্ত সুযোগ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত, গুপ্ত কার্য্যের সমস্ত দোষে তাঁহারা দোষী, তাঁহাদের নেতাদের ও সভ্যদের চরিত্রের নির্ম্মলতা দেখাইয়া লোককে মুগ্ধ করিবার ও সহানুভূতি আকর্ষণ

করিবার সুযোগ তাঁহাদের নাই, কাজেই তাঁহাদের কার্য্যে জীবনের মর্য্যাদাও নাই, তাহার উপর তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের কু-নজরে পড়েন, সেইজন্য সমাজের লোক তাঁহাদের সহিত ভয়ে মিশে না। এইসব কারণে সমাজের কোন্ স্থানে তাঁহাদের কার্য্যের কদর হইয়াছে ?

কিন্তু আবার বলি, বঙ্গে বিপ্লববাদীদের যতই দুর্ভাগ্য হউক না কেন, এই যে স্বাধীনতাবাদ-তরঙ্গ বঙ্গে আসিয়াছে তাহার প্রভাব বঙ্গের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। এ কার্য্য বাঙ্গালী জাতির রক্তমাংসের সহিত জড়িত হইয়া আছে। বিপ্লবীদের কার্য্য ভারতীয় ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া যায় না। বরং যে সংস্কার গবর্ণমেণ্ট হইতে পাওয়া যাইতেছে তাহা বিপ্লবীদের কাজের গৌণ ফল। (১) এ কথা অস্বীকার করা ইতিহাসকে অস্বীকার করা হইবে। ভারতীয় বৈপ্লবিক যুবক ভারতে এক নূতন যুগ আনিয়াছে, ভারতীয় রাজনীতিতে এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে, এক নূতন আলোক আনিয়াছে। ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের খুব বেশী দৌড় ইণ্ডিয়া আফিসের ধারে অনুনয় বিনয় করা ও লাথি খাওয়া, আর বৈপ্লবিক যুবকেরা পৃথিবীর অনেক পরাক্রান্ত গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুভাবে (ally) কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে।

এস্থলে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গের বিপ্লবী ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীদের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা। বঙ্গের উপর সমালোচনা নিখিল ভারতীয় বিপ্লবীদের উপরও প্রযুক্ত হয়। বঙ্গের কিশোর বয়স্ক যুবা যে তেজে তেজীয়ান হইয়া অদ্ভূতকর্ম্মা হইয়াছে, অন্যান্য প্রদেশের যুবকের মধ্য হইতেও সেই প্রকার তেজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছে। এস্থলে দুইএকজনের নাম উল্লেখযোগ্য—যথা, আমেরিকার "গদর"-পার্টির কর্ত্তার সিং, সোহন সিং ও পিঙ্গলে। প্রথমোক্তটির ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরে ফাঁসী হয় ও শেষোক্ত দুইটির বর্ম্মায় ফাঁসী হয়। (২) তৎপরে বার্লিন হইতে

পারস্যে প্রেরিত বসন্ত সিং, কেদারনাথ ও করসাস্প (পার্শি যুবক); ইহাদের পারস্যে ইংরেজ গুলি করিয়া মারিয়াছে। দেশে আরও অনেক যুবক অতি তেজস্বিতার সহিত স্বাধীনতার নামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যে তেজ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত, ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী ইত্যাদি দেখাইয়াছিলেন, কিশোরবয়স্ক কর্ত্তার সিং, সোহন সিং ও বসন্ত সিং ইত্যাদিও তাহাই দেখাইয়াছিলেন। মন্দের দিকের দোষ সর্ব্বত্রই সমান। বরঞ্চ বিগত যুদ্ধের সময় বাহিরে বাঙ্গালীরই বদনাম হইয়াছে। পঞ্জাবী-বিপ্লবীরা বলেন যে, যুদ্ধের সময় বিপ্লবোত্তমের চেষ্টায় পঞ্জাবীরা প্রাণ দিয়াছে, আর বাঙ্গালীদের মধ্যে কেহ কেহ টাকা চুরি করিয়াছে! কথাটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের দোষ ত্যাগ করিয়া সমষ্টির গুণ গ্রহণ করিলে গুণের দিকেই পাল্লা ভারী হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "ঘরে বাইরে" নামক পুস্তকে দুইজন বিপ্লবীর চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন—সন্দীপ ও বালক অমূল্য। সন্দীপ বক্তা ও স্বদেশসেবক দলের বড় এক পাণ্ডা। তাহার মুখে ত্যাগের ভাণ ও অন্তরে ভোগের ইচ্ছা। কিন্তু আমি অন্ততঃ এ প্রকার বিপ্লবী বাঙ্গালার ভিতর দেখি নাই। "পাকা হরীতকী" খাইয়া ফকিরিগিরি করিয়া দেশোদ্ধারের কর্ম্মের নামে লোকের মনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উৎপাদন করেন অথচ অন্তরে ভোগলালসা বিদ্যমান এ প্রকার বিপ্লবী বঙ্গে আমি দেখি নাই। বঙ্গে একবার অরবিন্দ দ্বারা "ভবানীমন্দির" স্থাপন করিয়া সাধুগিরি করিয়া বিপ্লববাদ প্রচার করার কথা উঠিয়াছিল বটে; (২) কিন্তু তাহা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। তবে বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতির প্রথমোচ্ছ্বাসে জন-কতক যুবক গেরুয়া পরিয়া লোক ভজাইবার জন্য এদিক-ওদিক গিয়াছিল বটে—কিন্তু তাঁহারা সন্দীপের চরিত্রের লোক ছিলেন না। অন্যদিকে অমূল্যের চরিত্রে যথার্থই বঙ্গের কিশোরবয়স্ক বিপ্লবীর চরিত্র ফুটিয়া

উঠিয়াছে। সন্দীপ অন্য কোন পন্থাবলম্বী হইতে পারে কিন্তু বৈপ্লবিক নহে। তাহার চরিত্রে বৈপ্লবিকের চরিত্র অঙ্কিত হয় নাই। আমি যতদূর জানি বিপ্লবীরা মর্কট বৈরাগ্যের ভেকধারী নহেন। তাঁহারা স্বাভাবিক জীবন অবলম্বন করেন। তবে অনেকেই জীবনের আদর্শ অতি উচ্চে ধরিয়াছেন। শুনিয়াছি, পরে চরিত্রের এই মাপকাঠি লইয়া দলাদলিও ছিল। একদলে নূতন ব্যক্তিকে সভ্য হইবার সময় কঠোর নৈতিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত না। অর্থাৎ এ দলে সর্ব্বপ্রকার চরিত্রের লোককে দলভুক্ত করা হইত; কিন্তু অন্য দলের বৈপ্লবিক চরিত্রের উপর কঠোর দৃষ্টি ছিল। (২)

বঙ্গে বিপ্লবাদের দ্বারা যে বন্যা আসিয়াছিল তাহাতে উপযুক্ত নেতার অভাবে আজ ভাঁটা পড়িয়াছে। বাঙ্গালার বৈপ্লবিক আন্দোলনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী বা আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের মত মহাপুরুষ অবতীর্ণ হন নাই বলিয়াই জাতীয় উচ্ছ্বাসের বন্যার দ্বারা কোন স্থায়ী জাতীয় কর্ম্ম সংস্থাপন করা যাইতে পারে নাই; শক্তির পূর্ণ ব্যবহার বঙ্গে হইতে পারে নাই। বঙ্গের বা ভারতের বিপ্লববাদে কোন অতি-মানবের উদয় হয় নাই, ইহাই তাহার দুর্ভাগ্য।

আলিপুরের মোকদ্দমার পর বিপ্লববাদের ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হয়। এই সময়ে আমি দেশত্যাগী হই। আমার সহিত দেশের আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্পর্ক ছিল না। সুদূর আমেরিকাতে সংবাদ-পত্র ছাড়া আর কোন প্রকারে বৈপ্লবিক সংবাদ পাওয়া যাইত না। কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস আমাকে কালিফোর্ণিয়া হইতে লিখিলেন যে, দেশ হইতে অমুক (২) আসিয়াছেন। তিনি বলেন, দেশে খুব ভাল কার্য্য হইতেছে। পরে আর একটি ভদ্রলোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। (৩) তাঁহার খবর এই যে, দলের পুরাতন লোকেরা

সকলেই কার্য্য করিতেছেন। গ্রামে গ্রামে সমিতি স্থাপন করা হইতেছে। কর্ম্মক্ষেত্র অতি বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর চরিত্রের কিছু উন্নতি হইয়াছে কিনা আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে বেশী কথাপ্রিয় ও হুজুগে বাঙ্গালী আজ মুখ বন্ধ করিয়া কাজ করিতেছে; ইহার চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি আছে? ইহার কাছ থেকে দলাদলির সংবাদ পাই নাই। সে খবর যখন পাইয়াছিলাম তখন সব ফুরাইয়া গিয়াছে। তৎপরে জগৎব্যাপী যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে। এই সঙ্গে দেশ ও বিদেশস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরাও সাড়া দিয়া উঠিলেন। তাঁহারাও জাতীয় বিপ্লবের জন্য যে সুযোগের অনুসন্ধান করিতেছিলেন তাহা পাইলেন। এই সময়ে বাঙ্গালার বৈপ্লবিক জীবনে এক নূতন বন্যা উপস্থিত হয়, তাহাতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট টলটলায়মান হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট

(ক)

পৃষ্ঠা ৬—ফুটনোট ১—বঙ্গে মধ্যবিত্তশ্রেণী উদ্ভূত হইলে তাহার—আদর্শও তদনুযায়ী হয়। এই জন্যই রামমোহন দ্বারা আনীত ফরাসী-বিপ্লবের চিন্তার ধারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত ফরাসী জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান দেখাইতে যাইয়া ইংলণ্ড যাত্রাকালে উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে জাহাজে হোঁচট খাইয়া রামমোহন কিঞ্চিৎ খোঁড়া হইয়া যান।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, রামমোহন লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত রামমোহন স্মৃতি-বার্ষিকীতে ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাতে প্রকাশ করেনঃ ছয়খানা ফার্সী পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, রামমোহন দিল্লীর নামেমাত্র বাদসাহকে শীর্ষস্থানীয় করিয়া ইংরেজের বিপক্ষে একটি নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। রামমোহনের আদর্শ তাঁহার মধ্যশ্রেণীয় শিষ্যদের দ্বারা বিস্মৃতিতে নিমজ্জিত করা হয় নাই। বাস্তাই পতনের দিন উপলক্ষে একবার তাঁহারা কলিকাতার অক্টর্লনি মনুমেণ্টের উপরে ফরাসী ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করিয়া ফরাসী-বিপ্লবের স্মৃতি-দিবস পালন করেন। রামমোহনের চেষ্টা বাঙ্গালার হিন্দুর দ্বিতীয় বারের স্বাধীনতার প্রচেষ্টা।

প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল, নন্দকুমারের দ্বারা। তিনি প্রথমে ইংরেজের পক্ষপাতী ছিলেন; পরে যখন দেখিলেন, ভারতীয়েরা সর্ব্বক্ষমতা হারাইতেছে তখন তিনি এই পরিকল্পনা করেন যে, বাদসাহ সাহ্‌ আলমকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় অন্যান্য শক্তিদের সংযুক্ত করিয়া

ইংরেজের বিপক্ষে তাহা পরিচালনা করিতে হইবে। এইজন্য তিনি পুণার পেশওয়ার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। আলীবর্দ্দি খাঁর সময় থেকে বাঙ্গালা পেশওয়ার চৌথ-পদ্ধতির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু সাহ্ আলম দ্বারা বাঙ্গালায় দেওয়ানী ইংরেজ কোম্পানীকে প্রদান করায় তাহার ব্যতিক্রম হয়। এই কারণে পেশওয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। পেশওয়ার প্রতিনিধি ও নন্দকুমারের প্রতিনিধি জগমোহন দত্ত ফরাসী চন্দননগরে আসিয়া মিলিত হইতেন। * ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ ব্যাপারটা সন্দেহ করিয়া তাহার সেক্রেটারী নবকৃষ্ণকে গোয়েন্দারূপে নিযুক্ত করে। নবকৃষ্ণ সমস্ত গুপ্ত-সংবাদ হেষ্টিংস্কে জানাইয়া দেয়। ফলে, জগমোহন দত্ত জেলে নিক্ষিপ্ত হন এবং নন্দকুমারকে একটা বিলাতী আইনের ধারানুযায়ী বিচার করিয়া ফাঁসীকাষ্ঠে লম্বমান করিয়া দেওয়া হয়

পৃষ্ঠা ৬— ফুটনোট ২— রাজনারায়ণ বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নবগোপাল মিত্রের কার্য্য একযোগে পরিচালিত হইত। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ "সঞ্জীবনী সভা" নামক একটা গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করেন। রাজনারায়ণ বসু ইহার সভাপতি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নবগোপাল মিত্র ইহার সভ্য ছিলেন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'জ্যোতি দাদা এক পোড়ো বাড়ীতে এক গুপ্ত-সভা স্থাপন করেছেন। একটা পোড়ো বাড়ীতে তার অধিবেশন, ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম ('আত্মপরিচয়'

---

*N.N. Ghosh—*Maharaja Navakrishna—A Study.* কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবাবী আমলের বাঙ্গলা'; T. P. Mitra—*Trial of Nanda Kumar*-এর *Introduction* by P. Mitra দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৮)। এই বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি' এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর', "প্রবাসী," কার্ত্তিক ১৩৫৪ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৬—ফুঃ নোট ৩—জাতীয় মহামেলা কার্য্যতঃ "হিন্দু মহামেলা"তে পর্য্যবসিত হয়। একবার একজন পত্রপ্রেরক National Paper-এ এক পত্র প্রেরণ করিয়া সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান—কেন এই প্রতিষ্ঠানের "জাতীয়" শব্দের পরিবর্ত্তে "হিন্দু" নামকরণ হইয়াছে। ইহার প্রত্যুত্তরে সম্পাদক বলেন, এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতের হিন্দু সংহতির জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কারণ The Hindus certainly form a nation by themselves (ভারতে হিন্দুরা নিশ্চিত একটি নেশন)। হিন্দু সমাজে মধ্যবিত্ত-শ্রেণী উদ্ভূত হইলেই তাহা নিজেকে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই ধ্বনি উত্থিত করে। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হয়, হিন্দু বুর্জোয়ারাই সর্ব্বপ্রথমে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পৃথক করিয়া ভারতে নিজেদের স্বতন্ত্র নেশন বলিয়া দাবী করে। এই বিষয়ে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের "জাতীয়তার নবমন্ত্র" পৃঃ ৪২ দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ৬—ফুঃ নোঃ ৪—ভূদেববাবুর ভাগিনেয় চন্দননগর নিবাসী ৺তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে পুত্র সমেত আমাদের কার্য্যে যোগদান করেন। তাঁহার কাছ হইতে বক্ষ্যমাণ কথা শুনিয়াছি: বঙ্কিমবাবু যখন হুগলীতে কাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে হেমবাবু প্রত্যেক শনিবারে তথায় আসিতেন। (হুগলী তাঁহার শ্বশুরালয় ছিল।) ভূদেববাবু তথায় চাকরী করিতেন। ইহারা দেশকে জাগাইবার জন্য নানা পরামর্শ করিতেন। এই উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ", হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত", এবং ভূদেববাবুর "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস"

পরামর্শ করিয়া লিখিত হয়। 'ভারত সঙ্গীতে'র কবিতা সর্ব্বপ্রথম যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার সুর অতি চড়া ছিল। সেইজন্য তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া কাগজে প্রকাশিত হয়। এই সঙ্গে বিদ্যাভূষণকে দেশ-প্রেমোদ্দীপক নানা পুস্তক লিখিবার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং তিনকড়িবাবুকে হুগলী এবং চন্দননগরের আশেপাশে ব্যায়ামাগার স্থাপন করিবার আদেশ দেওয়া হয়। তিনকড়িবাবু ভারতীয় সংবাদসমূহ ফরাসী কাগজে প্রকাশ করিতেন। এইজন্য তিনি ইংরেজের কোপে পতিত হন এবং অবশেষে সাত বৎসর পণ্ডিচারীতে লুকাইয়া থাকিতে বাধ্য হন।

পৃঃ ৬—ফুঃ নোঃ ৫—সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের বিষয়ে শোনা যাইত যে উভয়ে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর এবং সুরেন্দ্রনাথ যখন স্বদেশের কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন সেই সময়ে ইঁহারা স্বাধীনতা আন্দোলনে তৎপর হইয়াছিলেন। যুবকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য 'ছাত্র-সমিতি" স্থাপিত হয়। এই স্থানেই সুরেন্দ্রনাথ "ম্যাট্‌সিনির" কর্ম্ম বিষয়ে এক উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তিনিই ম্যাট্‌সিনিকে ভারতে পরিচিত করেন। তৎকালীন নরমপন্থী নেতা কৃষ্ণদাস পাল সুরেন্দ্রনাথকে **hot-headed disciple of Mazzini** (গরম মস্তিষ্কবিশিষ্ট ম্যাট্‌সিনির শিষ্য) বলিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন। অনুমান ১৯০৪ খৃঃ লেখক যখন প্রচার উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন সেই সময়ে গড়বেতার হাইস্কুলের জাডার রায়বংশীয় হেড মাষ্টার লেখককে বলিয়াছিলেন—"আমি যখন ঘাটালে ছাত্র ছিলাম তখন এক ব্যক্তি আমাদের মেসে আসিয়া আপনার মতন কথা কহিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা তিনি প্রেরিত।"

আনন্দমোহনের কর্ম্মের প্রথমাবস্থায় বিপ্লব দ্বারা স্বাধীনতা আনয়ন

করার ধারণা ছিল। কিন্তু পরে, সমাজ-সংস্কার সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন এই ধারণা তাঁহার জন্মিয়াছিল। এই কথা তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যা ভগ্নী খৃষ্টিনকে বলিয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা ৬—ফুটনোট ৬—আজকাল কেহ কেহ তিতুমিঞার ওয়াহাবী আন্দোলনকে একটি বৈপ্লবিক আন্দোলন বলিয়া গণ্য করেন। চব্বিশ-পরগণার বারাসত নামক স্থানে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ সৈয়দ আহম্মদ এবং তাহার শিষ্য মীর নিসের বা তিতুমিঞার অধীনে ফারাজীদের এই উত্থান হয় (Thornton-এর ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরে দীদু মীরের অধিনায়কত্বে ফারাজীরা আন্দোলন করেন। ইহা ইংরেজের বিপক্ষে আন্দোলন বটে। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতাকল্পে এই আন্দোলন সৃষ্ট হয় নাই। ইহা স্থানীয় হিন্দুদের বিপক্ষে গিয়াছিল। অনুমান ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পুরাতন "বঙ্গবাসী" পত্রিকাতে এই বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে স্থানীয় মুসলমানদের কবিতাদি এবং ঘটনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, এই আন্দোলন ইংরেজের বিপক্ষে গিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রধানতঃ Direct action-এর চোট পড়িয়াছিল হিন্দুর উপরে।

পৃঃ ৭—ফুঃ নোঃ ১—মেদিনীপুরের নেতা ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন বসু ও তাঁহার সহোদর "ফাঁসির" সত্যেন ছিলেন ৺রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইহারা ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের লোক। কটকের নেতৃস্থানীয় ছিলেন ৺ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। ইনি পরে "বেদান্তবাগীশ" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি এবং উড়িষ্যার বিখ্যাত সাহিত্যিক বিশ্বনাথ কর ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের লোক। ইঁহারা বৈপ্লবিকদলে একসময়ে ছিলেন। "নব্য-ভারত" পত্রিকায় ও অন্যান্ত স্থানে প্রবন্ধাদি দ্বারা ধীরেন্দ্রবাবু জাতীয়তাবাদের অনেক মালমসলা প্রদান করেন। উড়িষ্যার ব্রাহ্ম-

সমাজের আচার্য্য ও নেতা মধুসূদন রাও মহাশয় আন্দোলনের সহানুভূতি সম্পন্ন লোক ছিলেন। বালেশ্বরের দাসবংশীয় একজন উড়িয়্যাভাষী জমিদার বৈপ্লবিক দলভুক্ত ছিলেন। ইনিও ব্রাহ্মসমাজের লোক ছিলেন। কলিকাতায় ইঁহার সহিত আমি নেতা প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিই। তৎপর, আড়বেলিয়ার হেড্ মাষ্টার ও পরে কিশোরগঞ্জের "জাতীয়" বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার সুরেন্দ্রনাথ সেন তৎকালে ব্রাহ্মসমাজের ভক্ত ছিলেন। ৺দেবব্রত বসু (পরে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) ব্রাহ্ম পরিবারের লোক ছিলেন। অরবিন্দ ও তাঁহার ভ্রাতা ব্রাহ্ম-বংশের লোক ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাস ব্রাহ্ম-বংশীয় ছিলেন এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের সৃষ্টির সময় ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁহার শ্যালক সুরেন্দ্রনাথ হালদার ব্রাহ্মসমাজের লোক ছিলেন। পরে, প্রমথনাথ মিত্র দ্বারা আন্দোলনে আনীত ব্যারিষ্টার বি, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম পরিবারের লোক। প্রথম যুগের দলভুক্ত সরলা দেবীও ব্রাহ্মপরিবারের লোক ছিলেন। শহীদ কানাইলাল দত্তের অগ্রজ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত; কানাইলালের জীবনে তাঁহার প্রভাব পড়ে; কারণ তিনি হিন্দুর পূজাপদ্ধতির ধার ধারিতেন না (ব্রজবিহারী বর্মণ কৃত "বিপ্লবী কানাইলাল" দ্রষ্টব্য)। শ্রীপ্রভাত চন্দ্র গাঙ্গুলী (কানাইয়ের দাদার ভায়েরা-ভাই) লেখককে বলেন, কানাইয়ের মৃত্যু দণ্ড হইবার পর, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অনুরুদ্ধ হন যে, কানাইয়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যেন তাহার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়া আসেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় যখন কানাইয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা শুনিলেন তখন তিনি বলেন, "আমি গিয়া কি করিব? মৃত্যুদণ্ডের পর তাহার শরীরের ওজন যখন বাড়িয়া গিয়াছে, তখন আমি তাহার জন্য আর কি প্রার্থনা করিব?" হেমচন্দ্রের মাতুল খণ্ডেশ্বরের জমিদার

রাজনারায়ণ বসুর গুণানুগ্রাহী ছিলেন। হেমচন্দ্র (কানুনগো) বেশীর ভাগ সময়ে মাতুলালয়ে থাকিতেন। সেইজন্য তাঁহার জীবনে উদার ভাব সঞ্চার হইয়াছিল। প্রমথনাথ মিত্রের ছাত্রাবস্থায় লণ্ডনে অবস্থিতির সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহার সম্মতিক্রমে সপরিবারে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। লেখক নিজে উদারমতবিশিষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার বংশের পরিচয় অতি পূর্ব্ব সময় থেকে। লেখক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছ হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম প্রচার কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়া পড়াশুনা করিতে-ছিলেন। লোকমুখে শুনিয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, আমি তাহাকে ভিত্তি করিয়া নূতনভাবে একটি প্রচারকমণ্ডলী সৃষ্টি করিব। কিন্তু লেখক পরে ম্যাট্‌সিনির প্রবন্ধাবলী ও স্বামী বিবেকানন্দের *From Colombo to Almora* নামক পুস্তক পাঠে এই উপলব্ধি করিলেন যে রাজনীতিক সংস্কার না হইলে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার হয় না। এই ধারণা লইয়া তিনি ১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দ বৈপ্লবিক-আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। লেখকের জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্পর্শ থেকে মস্কোতে লেনিনের সহিত পরোক্ষভাবে সংস্পর্শের মধ্যে ভাবধারার একটা ক্রম-বিকাশ আছে। অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় ছাত্রাবস্থা থেকেই বৈপ্লবিকদলের কর্ম্মী ছিলেন। তিনি কিছুদিন রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তিনি পরে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন।

পৃঃ ৮—ফুঃ নোঃ ১—রাজনারায়ণ বসু, হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের দল, শিবনাথ শাস্ত্রীর দলকে ঠিক বৈপ্লবিক সমিতি বলা যাইতে পারে না। তাঁহারা দেশের স্বাধীনতা চাহিতেন বটে, দেশ সেবার ও ভক্তির আদর্শ প্রচার করিতেন বটে কিন্তু যথার্থ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা তাঁহাদের ছিল না।

রাজনারায়ণ বসুর দলের আর একজন সভ্য হইতেছেন ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস। ইনি শিবনাথ শাস্ত্রীর দলেও ছিলেন। (এই তথ্য তিনি লেখককে স্বয়ং বলিয়াছেন।) শাস্ত্রীর দলের সভ্যেরা প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া তাহা হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেন। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল—গভর্ণমেণ্টের চাকরী না করিয়া দেশসেবায় আজীবন নিয়োজিত করা। এই সংবাদ দ্বারা এই তথ্য পাওয়া যায় যে, তৎকালীন নবোত্থিত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের রাজকর্ম্মচারী হওয়াই একমাত্র পন্থা ছিল। এই উপায়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এই দেশে একটা মধ্যবিত্তশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রলোভন হইতে যুবকদের নিবৃত্ত করাই তখনকার দেশহিতৈষীদের একটা জাতীয় লক্ষ্য হইয়াছিল।

৺প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় বলিতেন, ১৯০১ খৃষ্টাব্দ বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির স্থাপনের পূর্ব্বে, কয়েকবার তিনি বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে চারবার তাঁহার এই উত্তম ব্যর্থ হয়। ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মানহানি" মকদ্দমায় জেল হইলে বাহির হইতে হাজার কতক লোক লইয়া কলিকাতায় আসিয়া জেল হইতে সুরেন্দ্রনাথকে উদ্ধার করা তাঁহাদের দলের একটা উদ্যম ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি বরিশালে গিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতার নেতারা তাঁহাকে প্রতিশ্রুত Sign (সঙ্কেত) পাঠাইল না বলিয়া এই উত্তম অঙ্কুরে বিলোপ প্রাপ্ত হয়।

শেষে তিনি অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহযোগে বৈপ্লবিক দলের নেতা হন। পরে তিনি বলিতেন, এইবার তাঁহার উত্তম স্থায়ী হইয়াছে। ইতিহাসের দ্বন্দ্ব-নীতিজনিত-বস্তুবাদই (Historical and Dialectical materialism) এই প্রচেষ্টায় শেষে সাফল্য আনিয়াছিল।

প্রমথনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক ছিলেন। এই

সময়ে ক্ষীণদেহ বাঙ্গালীর শারীরিক ব্যায়াম করা একটা জাতীয় লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইত। তিনি বিপ্লবী-আন্দোলনের এই দিকেই বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কাজেই যেসব যুবকেরা বিপ্লববাদ প্রচার ও Propaganda of Act করিতে চাহিতেন তাঁহারা শেষে দলের মুখপাত্রস্বরূপ "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশ করেন। মিত্রমহাশয় দ্বারা পৃষ্টপোষিত "অনুশীলন সমিতি" ও অন্য যুবকদের "যুগান্তর" সম্প্রদায় বহু পরে পৃথক ধারা গ্রহণ করে।

পৃঃ ৮—ফুঃ নোঃ ২—মেদিনীপুরের একটি স্কুলের একজন অতি বৃদ্ধ পণ্ডিত ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুও আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুদের কাছে বলিতেন, 'তোমাদের আর উপায় নাই। জঙ্গলে গিয়া পল্টন তৈয়ার কর। তিনি সময়ে সময়ে এত গরম ভাবে কথা বলিতেন যে, বন্ধুরা তাঁহার ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দিতেন। এই মানসিক প্রস্তুতি দ্বারাই এই অতিবৃদ্ধ পণ্ডিত আমাদের কর্মে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। জ্ঞানবাবুর সহিত প্রথমে তাঁহার এই বিষয় আলোচনা হইয়াছিল। তৎপর আমরা যখন উভয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি তখন তিনি আঁতকাইয়া উঠিয়া বলেন —"কবে হবে, কোথায় হবে।" আমি হাসিয়া বলি, "হবে কি মহাশয়।' তিনি পরে আমাদের সঙ্গে নির্ভয়ে মেশামেশি করিতে থাকেন।

পৃঃ ৮—ফুঃ নোঃ ৩—স্বামী বিবেকানন্দের আইরিশ একেশ্বরবাদীয় খৃষ্টান (Unitarian Christian) বংশীয়া ভগ্নী নিবেদিতা (Miss Margaret E Noble) ইঁহার পিতার নিবাস ছিল আলষ্টারে। তিনি একজন একেশ্বর বাদীয় পাদরী ছিলেন। ভগ্নী নিবেদিতা আয়র্লণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু লণ্ডনেই তাঁহাদের বসতবাটি ছিল। তিনি নিজেকে ইংরেজ না বলিয়া আইরিশ জাতীয় বলিয়াই স্পর্দ্ধা করিতেন। তাঁহার পিতা একজন আইরিশ ন্যাশান্যালিষ্ট ছিলেন। তাঁহার জাতীয়তাবাদীয় ঘরে উৎপত্তি হইয়াছিল

বলিয়াই তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদীয় হইতে পারিয়াছিলেন। এই জন্যই শোনা যাইত কুখ্যাত কার্লাইল নামক বাঙ্গালায় পররাষ্ট্রসচিব ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে জিজ্ঞাসা করেন—ভগ্নী নিবেদিতা আইরিশ "ফেনিয়ান" দলভুক্ত কিনা।

বাঙ্গালার পুলিশ তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। মাদাম হার্বাট নামক একজন ফরাসী মহিলা ভগ্নী নিবেদিতার জীবনী লিখিবার জন্য ভারতে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে আসেন। তাঁহাকে পণ্ডিচারিতে শ্রীঅরবিন্দ বলেন: যখন বাঙ্গালায় বৈপ্লবিক কর্ম্ম পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় পরিষদ (National Council) সংগঠিত হয়, তখন পরিষদের পাঁচজন নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ভগ্নী নিবেদিতা অন্যতম ছিলেন। এতদ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি বৈপ্লবিক-আন্দোলনের সহিত প্রথমাবস্থায় ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পুলিশ আমাকে ধৃত করিবার পর আমার মকদ্দমার সময়ে যখন কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট সুইনহো ১০,০০০ হাজার টাকা জামীন তলপ করেন তখন তিনি এই জামানৎ টাকা দিতে রাজী হইয়াছিলেন। এইজন্য ইংরেজ সমাজের মুখপত্র Englishman তাঁহাকে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া গালি দিয়াছিল। অবশ্য এই জামানৎ টাকা প্রয়োজন হয় নাই। লেখকের আত্মীয় ৺চারুচন্দ্র মিত্র এবং ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য জামিনদার হন। দ্বিতীয়টি হইতেছেন জাপানের একজন চিত্রকলা বিদ্যার শিক্ষক, অধ্যাপক ওকাকুরা। মিস ম্যাকলাউড (Miss Macleod) নামক স্বামীজীর আমেরিকান শিষ্যার সহিত তাঁহার জাপানে আলাপ হয়। তিনিই ওকাকুরাকে ভারতে আনয়ন করেন। মিস মাকলাউড লেখককে আমেরিকায় বলেন, "আমিই ওকাকুরাকে ভারতে পরিচিত করিবার জন্য দায়ী"।

কলিকাতায় নামজাদা লোকেরা ওকাকুরাকে সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

পৃঃ ১০—ফুঃ নোট ১—ইঁহারনাম যোশী। ইঁহাকে অরবিন্দ ওবারীন কটক হইতে আনিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় অরবিন্দের সহিত থাকিতেন। আমরা তৎকালে বিশেষতঃ অরবিন্দের পরিচিত প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয়কে "বিপ্লবী" বলিয়া ভাবিতাম। এই জাতির প্রত্যেককেই তৎকালে আমরা শিবাজী ও তনাজি মালসুরের প্রতীক বলিয়া ভাবিতাম। এই সময় বরদা হইতে "কুলকুর্ণী" নামক আর একজন মহারাষ্ট্রীয় যুবক অরবিন্দ দ্বারা আমদানি হয়। ইনি নাকি মুরারী রাওএর আখড়ার লোক। ইনিও আমাদের বড় বড় বৈপ্লবিক কথা বলিতেন। ইনি নাকি অনেকের কাছে তিলক মহোদয়ের ভাগিনেয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। কটকের যোগেশ ঘোষ নামক একজন বৈপ্লবিক নেতার বোম্বাই কংগ্রেস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যখন আমার সহিত কটকে সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি এই কথা আমায় বলেন—"আমি বোম্বাইতে মহারাষ্ট্রীয় কোন কোন প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকালে বলিয়াছিলাম, আমার তিলকের ভাগিনেয়ের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যুত্তরে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, কুলকর্ণী তিলকের ভাগিনেয় হতে পারে না! (**Kulakarni, a Tilak's nephew is impossible.**)

পরে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যোশী দিল্লী হইতে যুগান্তর আফিসে আমাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন এবং কাগজ সম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মের সহিত সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক হন। এই সময়ে বরোদা হইতে একজন হেড্‌মাষ্টার কলিকাতায় আসেন। তাঁহাকে আমরা যোশীর কথা বলিলে তিনি বলেন, যোশী ভাল লোক কিন্তু কুলকর্ণীর বিষয় কিছু জানিনা। কুলকর্ণীও ঐ বৎসরে কলিকাতায় আসেন। উদ্দেশ্য ছিল হাড় জোড়া দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা। এই উদ্দেশ্যে যুগান্তরে বিজ্ঞাপনও প্রদত্ত হইয়াছিল। যখন আমি "তোমার মামা তিলকের খবর

কি” বলিয়া ব্যঙ্গ করিতাম, তখন সে মুখ টিপিয়া হাসিত। এই প্রকারে আজগুবী গল্পে বিশ্বাসী (credulous) বাঙ্গালীর ঘাড়ে নানাপ্রকারের বরোদার উদ্ভট ও ধাপ্পাবাদী গল্প চাপান হইয়াছিল।

পৃঃ ১০—ফুঃ নোট ২—বেনারস কংগ্রেসে যখন বাঙ্গালার তরফ হইতে দেবব্রত বসু মহারাষ্ট্রীয় নেতার সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন তিলক মহোদয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

পৃঃ ১১—ফুঃ নোট ১—ভগ্নী নিবেদিতার “ম্যাট্‌সিনির আত্মজীবনী” নামক ছয়খণ্ড পুস্তক তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। ইহার প্রথম খণ্ডটি তিনি বৈপ্লবিক সমিতিকে প্রদান করেন। ইহা সমগ্র বাঙ্গালায় ঘুরিত এবং পঠিত হইত। এই পুস্তকের শেষে “গেরিলাযুদ্ধ” কি প্রকারে করিতে হয় তৎবিষয়ে একটি অধ্যায় আছে। তাহা টাইপ করিয়া চারিদিকে প্রেরিত হইত; উদ্দেশ্য গেরিলাযুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা করা। এই যুদ্ধ পদ্ধতিই আমাদের লক্ষ্য ছিল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আমার কারাবাসের পূর্ব্বে, ভগ্নী নিবেদিতা ম্যাট্‌সিনির বাকী পাঁচখানি পুস্তক এবং পিটার ক্রপট্‌কিনের দুইখানি পুস্তক—

(1) **Memoirs of a Revolutionist**

(2) **In Russian and French Prisons.**

আমাকে উপহার প্রদান করেন। তিনি বলেন, “জেলে যাইবার পূর্ব্বে ক্রপট্‌কিনের পুস্তকসমূহ পাঠ করিও।” এই সঙ্গে রুষ-বিপ্লবের স্বরূপ, ইহা যে ধনীদের বিরুদ্ধে গরীবদের বিপ্লব-প্রচেষ্টা এবং ক্রপট্‌কিন সম্বন্ধে নানা কথা আমাকে বলেন। এই পুস্তকগুলি আমি দলের একজন পুরাতন কর্ম্মী কেশব গুপ্তের নিকট জিম্মা রাখিয়া জেলে যাই। পরে, শ্রুত হইলাম, বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী কালে এই পুস্তকগুলি এক এক স্থানে

পুলিশ দ্বারা ধরা হইত। ভগ্নী খৃষ্টিন (Miss Grinstidle) আমার আমেরিকায় বলেন, ওই পুস্তকসমূহের এক একখানি ধরা পড়ে আর নিবেদিতা বলিতেন, আমার একটি পুস্তক ধরা পড়িয়াছে। যাঁহার কাছে আমি পুস্তকগুলি জমা রাখিয়াছিলাম, তিনি বোধ হয় এইগুলি স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত হওয়ায় তিনি নিরুদ্দেশ হন।

পৃঃ ১১ ফুঃ নোট ২—যে ভিত্তির উপরে আনন্দমঠের রোমান্স কল্পিত হইয়াছিল তাহা একবারে অসত্য! নাগা সন্ন্যাসী এবং মজনু ফকিরের দল বাঙ্গালাদেশ, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব ভাগে লুণ্ঠিত নরহত্যা ও নারীধর্ষণ করিত। এই লুণ্ঠন দমন করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অথচ বাঙ্গালাদেশে আনন্দমঠ উপলক্ষ্য করিয়া নানা রোমান্টিক গল্পও সৃষ্ট হয়। ঢাকার রমনার কালীবাড়ীর মহারাষ্ট্রীয় স্বামিজী নাকি বলিতেন, সন্ন্যাসী যোদ্ধারা "ওঁ বন্দেমাতরম" এই রণধ্বনি করিত!

বাঙ্গালায় নাগা ও ফকিরদের উৎপাত বিষয়ে যামিনীমোহন ঘোষের "**Sanyasi and Fakir Raiders in Bengal**" দ্রষ্টব্য।

"আনন্দমঠ" নভেলে হিন্দুয়ানীর কিছুই নাই। ইহাই সমালোচকদের মন্তব্য যাহা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। আনন্দমঠের সন্তানেরা ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মত অথবা নাগা সন্ন্যাসীদের মতও নয়। "সন্তান" সম্প্রদায় ইউরোপের মধ্যযুগের নাইট টেমপ্লারদের অনুকরণে কল্পিত।

হাওড়া জেলা হাইস্কুলের হেডমাষ্টার কামদেবী মহাশয় বঙ্কিম শত-বার্ষিকী স্মৃতি সভায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন—কেহ কেহ বলেন, আনন্দ-মঠ ভিক্টর হুগোর পুস্তকের অনুকরণে লিখিত। পরে আমি তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার এই উক্তির অর্থ কি? ইহাতে তিনি বলেন, ৺অক্ষয়কুমার সরকার আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি ভিক্টর হুগোর 'The year' 93" নামক পুস্তক লইয়া বঙ্কিমকে বলি—"Here is a romance without a hero, you must write such a novel" ইহা নায়কবিহীন একটি নভেল, তুমি এই প্রকারের একটি নভেল লিখ, এই বলিয়া উক্ত পুস্তকটি বঙ্কিমবাবুর হস্তে প্রদান করেন। ইহার পর আনন্দমঠ প্রকাশিত হয়।

পৃঃ ১২ ফুঃ নোট ১—ইহার নাম হইতেছে সেরম্যান এডি। ইনি Y.M.C.A.-র প্রচারক ছিলেন। রুষ-বিপ্লবের পরে শোনা যায় ইনি বোলচেভিকবাদ গ্রহণ করেন।

পৃঃ ১২—ফুঃ নোট ২—অধ্যাপক কাকাসু ওকাকুরা। 'হরি" (১) নামক একজন আর্টের ছাত্রের সমভিব্যহারে শ্রীমতি ম্যাক লাউডের সঙ্গে ভারতে আসেন। উভয়েই বেলুড় মঠে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। অধ্যাপক ওকাকুরা সেই সময়ে Ideals of the East নামক একটা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ভগ্নী নিবেদিতা (Miss Margaret Noble) দ্বারা পাণ্ডুলিপিটি সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ওকাকুরা বলিয়াছেন যে, এসিয়া মহাখণ্ডের কৃষ্টি এক। এই অধ্যাপকটি একটি আজগুবি গল্প প্রচার করিলেন যে, এসিয়ার সমস্ত স্বাধীন দেশগুলি এই ভূখণ্ডে ইউরোপীয় আধিপত্য বিনষ্ট করিবার জন্য সংঘটিত হইয়াছে, "ভারত কেবলই ঘুমায়ে রয়"। এই জন্য ভারতকে স্বাধীন করিয়া এই সংঘের মধ্যে আনিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ভারতে মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য কলিকাতায় জনকতক নামজাদা লোক লইয়া একটি

১। পরে বাঙ্গালাদেশেই হরির মৃত্যু হয়।

ভাসাভাসা মণ্ডলী সংগঠিত হয়। ইহার মধ্যে, যতদূর অবগত আছি, ৺হেমচন্দ্র মল্লিক (৺সুবোধচন্দ্র মল্লিকের খুল্লতাত), ৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগ্নী নিবেদিতা প্রভৃতি ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তিনি বলেন, নিবেদিতা রাজনীতিতে যাইয়া তাঁহার আন্দোলনকে বিপদগ্রস্ত করিবেন।

এই সব কথা আমি নিবেদিতার আমেরিকান সহকর্মী ভগ্নী গ্রিনস্টিডলের (Miss Grinstidle) কাছ হইতে শ্রবণ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনি কেন নিবেদিতার রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব রাখিতে আপত্তি করিতেছেন?" প্রত্যুত্তরে স্বামীজী বলেন, "নিবেদিতা কি রাজনীতি করিয়াছে? বিপ্লবোদ্দেশে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি। আমি কামান প্রস্তুত করিব। Sir Hiram Maxim-এর সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছি—কিন্তু ভারত গলিত হইয়াছে—India is in Putrefaction এই জন্যই আমি একদল কর্মী চাই, যাহারা ব্রহ্মচারী হইয়া দেশের লোককে শিক্ষাদান করিয়া এইদেশকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিতে পারিবেন। (১)

স্বামীজীর মৃত্যুর পর, নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। তাঁহার বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা বাঙ্গালায় স্বদেশহিতৈষীতার ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যদের

১। ৺সখারাম গণেশ দেউস্করের কাছে হইতে পরে আমরা শুনিয়াছিলাম, স্বামীজী তাঁহাকেও এইকথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি দেখিয়া যাইবেন ভারত একটি বারুদের স্তূপ হইয়া আছে। তিনিজীবদ্দশায়ই বিপ্লব দেখিয়া যাইবেন বলিয়া আশা রাখিতেন। এই ভারত আর ভুল করিয়া বিদেশীকে ডাকিয়া আনিবে না বলিয়া দেউস্করকে প্রত্যুত্তর দেন।

সংস্পর্শে আসিয়া রুশ বৈপ্লবিকনেতা পিটার ক্রপট্‌কিনের সহিত পরিচিত হন। এইজন্য তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে সামাজিক কথাও আসিয়া পড়িত। (১) এইসব বক্তৃতার ফলে, ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। নিবেদিতার বরোদায় বক্তৃতা উপলক্ষে গমন কালে তথায় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের সহিত পরিচয় হয়। তিনিই অরবিন্দকে কলিকাতায় দলের কথা বলেন। ইহার ফলে অরবিন্দ কলিকাতায় আসেন এবং পূর্ব্বোক্ত দলটি পূর্ণ বৈপ্লবিক দল রূপে পুনঃ সংঘটিত হয়। এই সংঘটনটি স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে অরবিন্দ আর একটি আজগুবি গল্প বাঙ্গালায় আসিয়া প্রচার করিলেন। সমগ্র ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, কেবল ভীরু বাঙ্গালী সুপ্ত আছে! এই গল্পের ফলস্বরূপ নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিকসংঘের শাখারূপে পাকাপাকিভাবে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বাঙ্গালায় গুপ্ত-বৈপ্লবিক সমিতি সংস্থাপিত হয়। এই সমিতির সভাপতি হন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র, (২) সহকারী সভাপতিদ্বয় ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস, কোষাধ্যক্ষ হন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছাত্রদের পরিচালক ও ব্যায়ামাগারের অধ্যক্ষ হন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২ পৃঃ ফুঃ নোট ২—যতীনবাবু বরোদায় সৈন্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, তিনি সেখানের পশ্চিমের কনোজিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত, ভাল হিন্দি তিনি বলিতে পারিতেন।

১। কলিকাতার টাউন হলে নিবেদিতা-প্রদত্ত **Dynamic Religion** নামক একটি বক্তৃতা শুনিয়া ৺বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার বন্ধুদের বলিয়াছিলেন—"ইহা **dynamite.**"

২। ইনি নৈহাটি মিত্র বংশের লোক।

তিনি নাকি গাইকোয়াডের পার্শ্বরক্ষক সিপাহীশ্রেণীতে ছিলেন। (আমরা তাঁহার উপরস্থ কর্মচারীর সহিত একত্রে রণবেশে সজ্জিত ফটোগ্রাফ দেখিয়াছিলাম।) যতীনবাবু আপনার সার্কুলার রোডস্থিত ব্যায়ামের আখড়া ও কর্মীদের থাকিবার বাড়ীর অধ্যক্ষ ছিলেন। এইস্থানটি তথাকার পুলিশ ফাঁড়ীর সন্নিকট এবং গড়পারের অপরদিকে অবস্থিত ছিল। এই বাড়ীতে সস্ত্রীক যতীনবাবু, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য বারীন ঘোষ প্রভৃতি তরুণ কর্মীরা থাকিতেন। এইস্থানে প্রমথনাথ মিত্র এবং ব্যারিষ্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, জ্যোতিষ চন্দ্র সমাজপতি, দেবব্রত বসু, জেনারেল এসেম্বলী কলেজের অধ্যাপক নলিনী মিত্র, ভবিষ্যতের অনুশীলন সমিতির স্থাপয়িতা সতীশচন্দ্র বসু, আত্মোন্নতি সমিতির তরুণ সভ্যবৃন্দেরা আসিতেন। প্রথমযুগের আর একটি বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন অধ্যাপক শ্রীশ সেন। তাঁহার বন্ধু সাহিত্যিক অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও দলের একজন সভ্য ছিলেন। অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথ মিত্রের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তিনি এবং জ্যোতিষবাবুও দলভুক্ত ছিলেন কিন্তু পরে জ্যোতিষ বাবুকে এবং সরলাদেবীকে দল হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। প্রথম যুগে, তাঁহার 'হিন্দু ও মুসলমান সমস্যা' বক্তৃতাতে উভয়ের জাতিতাত্ত্বিক ও কৃষ্টিগত একত্ব, 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে "ইংরেজ বনাম বাঙ্গালী" প্রবন্ধগুলি, স্বদেশী গান প্রভৃতি স্বাধীনতা-স্পৃহার উদ্দীপনার অনেক মালমসলার যোগান দেয়। এইসঙ্গে হেদায়াতুল্লা এবং মুজিবর-রহমান নামে দুইজন যুবকও আখড়ায় আসিতেন।

১৯০৫—১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার বি এম. চ্যাটার্জি নামক ঢাকাবাসী একজন ভদ্রলোক মিত্র মহাশয় কর্তৃক দলে আনীত হন। ব্যারিষ্টার আথানেসিয়াস অক্ষয় কুমার ঘোষ কখনও দলের সভ্য হন নাই।

কিন্তু মিত্রের অনুরাগী হিসাবে দলের পার্শ্বে থাকিতেন এবং কিছু কিছু সংবাদও রাখিতেন।

পৃঃ ১৪ ফুঃ নোট ১—১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে "গান্ধীবাদ" নামে একটা মতবাদ চলিয়াছিল। কিন্তু তাহার বিশ্লেষণ করিলে উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দেশসমূহের utopion socialism হইতে ধার করা রাজনীতিক ও অর্থনীতিক পন্থাসমূহ প্রকাশ পাইবে। ভারতে এইসব উপায় দ্বারা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে গান্ধীজি-পরিচালিত জাতীয়তাবাদের অভিযান হইত। পূর্ব্বেকার নিষ্ক্রিয় নরমপন্থীয় কংগ্রেস-নীতি এবং বিপ্লবীদের সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টার মধ্যে গান্ধী-পরিকল্পিত উপায়ে জাতীয়তাবাদের আন্দোলন দ্বারা জনসাধারণ সাম্রাজ্য-াদের বিপক্ষতা চারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

আজকাল "গান্ধী-সোসালিসম্" নামে একটা রব উঠিয়াছে। ইহা মার্ক্সবাদের বিপক্ষেই ধ্বনিরূপে উত্থিত হইতেছে। কিন্তু ইহা এখনও উদার জাতীয়তাবাদ বলিয়াই ঘৃণ্য হইতে বাধ্য।

পৃঃ ১৫ ফুঃ নোট ১—অসহযোগ আন্দোলন ও তৎপরের আইন অমান্য আন্দোলন এবং "গান্ধ বাদ" নামে বাজারে যাহা প্রচলিত আছে তাহার কোনটাতেই ভারতীয় বা হিন্দুর ভাবধারা নাই। অহিংসবাদ বেদের পরের যুগ হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু ইতিহাসে দৃষ্ট হয় এই মতাবলম্বী রাজারা (অশোক ব্যতীত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। ভারতের অনেক অহিংসবাদী রাজা—যায় অশোক পর্য্যন্ত জোর করিয়া স্বীয় মত দণ্ড প্রজাদের উপর চালাইয়া দিয়াছেন। আজ্ঞাভঙ্গ হইলে কেহ কেহ কঠোর দণ্ড প্রদানও করিয়াছেন। একদল ঐতিহাসিকের মত, জৈন ও বৌদ্ধ রাজাদের কঠোরতার বিপক্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় প্রজারা বিদ্রোহ করিয়াছিল।

'পরম-ভাগবত' বৈষ্ণব গুপ্ত-সম্রাটেরা অবিরত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন এবং কঠোরভাবে প্রজা শাসন করিতেন। আর বঙ্গ ও মগধের 'পরম-সৌগত' বৌদ্ধ পাল রাজারা তাহাদের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছিল। ভারতীয় অহিংসবাদ বিষয়ে সাধারণের অদ্ভুত ধারণা আছে। ইংরেজ আমেরিকান কোয়েকার সম্প্রদায়ের ও টলস্টয়ীয় মতের সহিত গান্ধীবাদীয় অহিংসবাদের সম্পর্ক আছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভগবৎ-গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অহিংসবাদ কোথায়? অথচ প্রত্যেকেই স্বীয় মতের পরিপোষকতার জন্য ইহার নানা অর্থ (কদর্থ?) করেন।

গান্ধীবাদীয় অহিংস-আন্দোলনের মূল কোথায় তাহা লেখক ১৯২৬ খৃঃ গৌহাটি নিখিল ভারতীয় নির্য্যাতিত রাজনৈতিক বন্দীদের কনফারেন্সের অভিভাষণে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমেরিকার থোরোর Civil Disobedience (আইন-অমান্য নীতি), রুষীয় টলষ্টয়ের অহিংস-নীতি, ইংলণ্ডের খৃষ্টীয় সোসালিষ্টদের Cottage Industry (কুটির শিল্প) এবং আমেরিকার Single Taker হেনরী জর্জ্জের Industrial Capitalism (মূলধনীয় শিল্পপ্রসার প্রচেষ্টা) রূপ অর্থনীতির প্রতিরোধার্থ Handicraft & Cottage Industry (হস্ত ও কুটির শিল্প) পুনঃ প্রচলনের আন্দোলন, ফ্রান্সের সিণ্ডিকালিষ্ট শ্রমিকদলের সশস্ত্র বিপ্লব অসম্ভব বলে Passive Resistance (নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ), রুষ আন্দোলন প্রচেষ্টার সংমিশ্রণে গান্ধীবাদের সৃষ্ট হইয়াছে এককথায়, উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের Utopian-Socialism বলিয়া যাহা চলিত, একবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে যেসব মত ও পথ পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা এখন ভারতে 'গান্ধীবাদ' নামে চলিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে রুষে Peoples Socialist পার্টি বলিয়া এই প্রকারের একটি ক্ষুদ্র দলেরও উদ্ভব হইয়াছিল। গান্ধীবাদের কিছুই বেদ ও কোরাণ হইতে উদ্ভূত নহে। অথচ, ইহাই ভারতের একমাত্র

'জাতীয়তাবাদ' বলিয়া সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ইহাকেই বলে শ্রেণীস্বার্থ। গান্ধীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণদের পূজা করার কথাও মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পায়। তিনি "কল্কি-অবতার" এই কথাও উঠিয়াছিল।

পৃঃ ১৬ ফু. নোট ১—জাতীয়তাবাদের এই ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছিলেন, "It is the resusciation of the Aryan in the Hindu."—*A Wakening of India.* নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৬ ফুঃ নোট ২—ইহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা মজিবর রহমন সাহেব।

পৃঃ ১৭ ফুঃ নোট ১—এই বিষয়ে খগেন্দ্রচন্দ্র দাস নামে একজন তরুণ কর্ম্মীর সহিত দেবব্রতবাবুর আলোচনা হয়। খগেনবাবু বলেন, "আপনারা একতরফা কর্ম্ম করিতেছেন মুসলমানদের লইতেছেন না।" প্রত্যুত্তরে দেবব্রতবাবু বলেন, "আমাদের দলে মুসলমান আছে" বলিয়া হুগলীর ইমামবাড়ীর মৌলভী সাহেবের নিকট খগেনবাবুকে প্রেরণ করেন। খগেন্দ্রবাবু বলেন, মৌলবী সাহেব তাঁহার সহিত ভাসাভাসা কথা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় প্রদান করেন।

খগেন্দ্রচন্দ্র দাস ছাত্রাবস্থায় প্রথমে সদ্য জাপান-প্রত্যাগত রমাকান্ত রায় দ্বারা স্থাপিত একটি ছাত্রসংঘের মধ্যে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার এক নিকট-আত্মীয় আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সেই সম্পর্কে আমার সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং তিনি বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি "ছাত্র-ভাণ্ডারের" সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ছাত্রদের মধ্যে কর্ম্ম করিতেন। অনুমান ১৯০৫-১৯০৬ খৃঃ White-Away Laidlaw নামক সাহেবদের দোকানের সম্মুখে Picketing লইয়া যে গোলমাল হয়, তাহাতে খগেন্দ্র

পিকেটাররূপে তথায় ছিলেন এবং হস্তে আহত হন। কিন্তু অন্য লোক হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়া স্বীয় স্বদেশ প্রেমের পরাকাষ্ঠা বলিয়া সেই হস্ত দেখান। সুরেন্দ্রবাবু বলেন 'এই হস্ত সোনাদ্বারা বাঁধাইয়া দিব"। ১৯০৬-১৯০৭ খৃঃ তিনি যোগেন্দ্র ঘোষের সমিতি হইতে স্কলারসিপ পাইয়া জাপান যান। আমেরিকায় তিনি ছাত্রজীবন সমাপ্ত করেন। ১৯১২ খৃঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর কলিকাতায় 'কোমাগাটা মারু" সংক্রান্ত ব্যাপারে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কয়েক সপ্তাহের জন্য তিনি জেলবাস করেন এবং তাঁহার চাকুরী যায়। উপস্থিত উনি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ-এর সংস্থাপয়িতা এবং পরিচালক। খগেনবাবুর বিভিন্ন আত্মীয়েরা—যথা অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ও স:ত্যন্দ্র-নাথ সেনও বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। খগেনবাবুর বাড়ীতেই শ্রীমাখনলাল সেনের সহিত লেখকের প্রথম পরিচয় হয়। অনেক দিনের বিতর্কের পর মাখনবাবু বৈপ্লবিক মত গ্রহণ করেন এবং আমাদের দলে যোগদান করেন। লেখক জেলে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার কাছ হইতে পার্টির চাঁদা আদায় করিয়াছেন। বোধহয় পরে ইনি কর্ম্মোপলক্ষে ঢাকায় গিয়া অনুশীলন সমিতির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। পুলিন দাসের দ্বীপান্তরের পর তিনিই এই সমিতির নেতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন। পরে তিনি কলিকাতায় ৺যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েরও সহযোগী হইয়াছিলেন। ইনি কয়েকবার পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হন এবং কারাদণ্ড ভোগ করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইনি ঘোর গান্ধীপন্থী হন, তদবধি ইনি কংগ্রেস-সেবী।

পৃঃ ১৮ ফুঃ নোট ১—প্রফুল্লচন্দ্র চাকী বগুড়া জেলার বিহার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামটি মহাস্থান গড় নামক প্রাচীন বংগা-

বংশের সন্নিকটবর্ত্তী। তাঁহার পিতার নাম ৺রাজনারায়ণ চাকী। ইনি ১২৯৫ সালের, ২৭শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবারে (১০।১২।১৮৮৮ খৃঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। নামুজা I.P.M.E. School হইতে পাশ করিয়া রঙ্গপুর Zilla School-এ ১৯০৫ সালে ৩য় ক্লাসে পড়িতেন। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিবার পর জেলা স্কুল হইতে বিতাড়িত হইয়া রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। সেখানে ১৯০৬ সালে ২য় ক্লাসে পড়েন। রঙ্গপুরের তৎকালীন প্রবীণ উকিল ৺দুর্গাপ্রসাদ নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া তিনি অধ্যয়ন করেন (এই সংবাদ প্রফুল্লের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চাকির কাছ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।)

বগুড়ার নেতা শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়—যিনি এককালে বৈপ্লবিক দলের উত্তর-বঙ্গীয় শাখার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন তিনি, - লেখককে বলিয়াছেন প্রফুল্ল তাঁহারই recruit অর্থাৎ তাঁহা দ্বারাই প্রফুল্ল বৈপ্লবিকদলের সংস্পর্শে আসেন।

রঙ্গপুর হইতে হেমচন্দ্র দাস তাহাকে ব্যামফিল্ড ফুলারের হত্যার উদ্দেশ্যে যে প্রচেষ্টা চলে তৎকর্ম্মে সহযোগিতা করিবার জন্য রঙ্গপুর হইতে তাঁহাকে লইয়া আসেন। প্রফুল্ল চাকীর বয়স তখন সতের বৎসর। তাঁহাকে লইয়া হেমবাবু ষ্টেশন হইতে আমার বাড়ীতে প্রথমে আসিয়া প্রচেষ্টার অসফলতার সংবাদ জানাইয়া যান এবং বলেন, ফুলারের নাগাল পাওয়া গেল না, সে অতি সাবধানে রক্ষিত হইয়া বিলেত যাইতেছে। তৎপর প্রফুল্লকে লইয়া হেমবাবু তাঁহার উত্তর-কলিকাতাস্থিত মাতুলালয়ে যান। আমিও মধ্যাহ্নে স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে "বেঙ্গলী আফিসে" গিয়া এই সংবাদ দিই। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলেন, It is providential ইত্যাদি। বোধ হয় অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিবার জন্য আমি যে জোর তাকাদা দিতেছিলাম তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন বলিয়াই এই উৎফুল্লতা।

ক্ষুদিরাম বসু মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার কোন এক গ্রামের বালক। মেদিনীপুর আখড়ায় তিনি আসেন এবং সত্যেন বসুর সহিত কার্য্য করেন। একবার কোন কর্ম্মের উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে এক পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলেন। আমার জেল গমনের পর তিনি মজঃফরপুরের কর্ম্মের জন্য প্রফুল্লের সহিত প্রেরিত হন। ইউরোপে আমার সহকর্ম্মী সৈয়দ ওয়াহেদ আমায় বলিতেন, বাসন্তিবাবু প্রভৃতি বাঙ্গালীদের অনুরোধে তিনি তাঁহার ভগ্নীর বাড়িতে উভয়কে লুক্কায়িত রাখেন। কিশোর ও তরুণ বয়স্ক বালক-বালিকারাই দুঃসাহসের কর্ম্ম করিতে পারে—ইহা রুষ ও ভারতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত হইয়াছে।

অল্পবয়স্ক তরুণরা নির্ম্মল চরিত্র ও দ্বিধাশূন্য হয় বলিয়াই নেতার বাক্য তৎক্ষণাৎ মানিয়া লয়। প্রফুল্ল কিছুদিন ইডেন হস্পিটাল রোডের কোণ এবং কলেজ ষ্ট্রীটের উপর শিব মন্দিরের অপর পারে উপস্থিত খালি জমিতে অবস্থিত একটি বাড়ীতে যখন যুগান্তর আফিস এবং মেস ছিল তখন তথায় থাকিত, এবং আত্মোন্নতি সমিতিতে ব্যায়াম করিত। একদিন তথাকার কোন তরুণ তাহাকে কোন বিষয়ে ঠাট্টা করিয়াছিল। ইহাতে সে বিরক্ত হইয়া আমাকে বলে, আখড়ার ছেলেরা কি খারাপ! এই সময়ে দুই একদিন প্রফুল্লর মাথায় টেরী কাটা দেখিয়া আমি বারীনকে বলিয়াছিলাম—বারীন, প্রফুল্লর মাথায় যে টেরী উঠিয়াছে! তৎপর তাহার মাথা হইতে টেরী অন্তর্হিত হয়। বোধ হয় বারীন তাহাকে আমার কটাক্ষ বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন। এতদ্বারাই প্রমাণিত হয় যে কি প্রকারে নৈতিক কঠোরতা দ্বারা গঠিত হইলে বালকেরা অসমসাহসিক কর্ম্ম করিতে পারে।

পৃষ্ঠা ১৮ ফুট নোট ২—খুলনাস্থিত সুধীর সরকার। আন্দামানে জেল খাটিয়াছেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে জামালপুর হাঙ্গামা হয় এবং হিন্দুরা

বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। বারোয়ারীর ঠাকুর ভাঙিয়া দেওয়া হয়। তখন কলিকাতায় আত্মোন্নতি সমিতির আখড়া থেকে জনকতক যুবক জামালপুরে উপনীত হন এবং তথাকার কোন জমিদারের কাছারীতে বোধ হয় গৌরীপুরের) অবস্থান করেন। তাঁহারা রাস্তা দেখিয়া বেড়াইতে-ছিলেন এমন সময়ে মুসলমান জনতা ভিড় করিয়া তাঁহাদের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ফেলে। তখন তাঁহারা প্রাণরক্ষার জন্য রিভলবারের গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করেন। তাহাতে জনতা ছত্রভঙ্গ হয় এবং তাহারাও বাসায় ফিরিয়া যান। পরে, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিতে আসেন। পুলিশ কর্ম্মচারীটির কাছারী তল্লাস করিবার সময় তিনি হাতে একটা পুটলী সহ বাহির হইয়া যাইতে থাকেন। ইহাতে কর্ম্মচারীর সহিত শ্রীশ ঘোষ নামক একটি যুবকের বচসা হয় এবং শেষে হাতাহাতি হয়। ইহাতে উভয়েই আঘাত প্রাপ্ত হয়। পুলিশ যখন বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, শ্রীশ ঘোষ, ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতিকে গ্রেফতার করে তখন সঙ্গীদের পরামর্শে সুধীর কাছারীর পশ্চাৎ দিক দিয়া পলায়ন করে।

হাঙ্গামা যখন তুমুলাকার ধারণ করে তখন স্থানীয় নেতারা মন্দির-প্রাঙ্গনে স্ত্রীলোক, বালক ও অন্যান্যদের জড় করিয়া সুধীরের হস্তে একটা ভাঙ্গা বন্দুক দিয়া হিন্দুদের রক্ষা করিতে বলে। ইংরেজ পুলিশ কর্ম্মচারী দ্বারা পরিচালিত উন্মত্ত মুসলমান জনতা প্রায় রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত এই মন্দির (ইহার চারিধারে ইটের পাঁচিল ছিল। বোধ হয় এই প্রাঙ্গনটি এক্ষণে সিনেমা গৃহ হইয়াছে) আক্রমণ করিতে থাকে এবং সুধীরকে ক্রমাগত গুলির শব্দে তাহাদের তাড়াইতে হইয়াছে। শেষে উন্মত্ত জনতা চলিয়া গেলে তাঁহারা (নেতারা) সুধীরকে তথা হইতে বিদায় করিয়া দেন।

সুধীর বাকী রাত্রিটা মাঠ ভাঙিয়া প্রত্যুষে মাঠে একটা মুসলমান

চাষীর সাক্ষাৎ লাভ করে। তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহার সহিত পরিধেয় বস্ত্র বিনিময় করিয়া সে মৈমনসিংহ সহরে উপনীত হয়। তৎকালে তথায় ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের অধিনায়কত্বে জেলার রাজনীতিক সম্মেলন হইতেছিল। তথায় যাইয়া সুধীর লেখক কোথায় আছেন তাহা অনুসন্ধান করেন। স্বেচ্ছাসেবকদলের নেতা তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দেন। আমি সেই সময়ে 'রেমিটেণ্ট ফিভার' দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দলের সভ্য মুক্তাগাছার আচার্য্য চৌধুরী বংশীয় হেমেন্দ্র আচার্য্য চৌধুরীর বাড়ীতে ছিলাম। সেই রাত্রিতেই সুধীরকে কলিকাতায়-পাঠান হয়। পরে সুধীর আলীপুর বোমার মকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়া আন্দামানে দশ বৎসর জেল খাটেন।

শ্রীশ ঘোষের বাড়ী খুলনায়। ইনি আন্দামানে নির্বাসিত হন। তথায় তাঁহার Bone tuberculosis হয়। খালাস হইবার পর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পুলিশের উৎপাতে কোন স্থানে আশ্রয় পান না। অবশেষে কিছুদিন কনখলের রামকৃষ্ণ মিশনে রোগীরূপে থাকেন। পরে দেহ ত্যাগ করেন।

পৃষ্ঠা ১৮ ফুঃ নোট ৩—ইহার নাম প্রমথনাথ দত্ত। কলিকাতার সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ দত্ত বংশের অন্যতম। ইনি সমিতির প্রথমাবস্থা থেকে দলভুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বীয় বন্ধু ফকীরচন্দ্র পালের সহিত আমেরিকায় যান। উদ্দেশ্য ছিল, সামরিক-বিদ্যা শিক্ষা করিবেন। ইহার পূর্ব্বে বোম্বাই শাখা হইতে কেটকার নামে (ইনি পরে ভারতে ডাঃ কেটকার নামে পরিচিত হন) এক যুবককে মহারাষ্ট্রীয় দল আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ইনি তথায় গিয়া একটা Test Case করিবেন যে, পরাধীন জাতির লোক স্বদেশের

স্বাধীনতার জন্ত কোন স্বাধীনদেশের গভর্ণমেণ্টের কলেজে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা লাভ করিতে পারে কিনা? প্রমথ আমেরিকায় গিয়া কেটকরের সন্ধান করেন। তৎকালে তিনি Cornell Universityতে ভর্ত্তি হইয়াছেন। কেটকার প্রমথকে জানান যে, তাঁহার উদ্দেশ্যে অকৃতকার্য্য হওয়ায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছেন।

অবশেষে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রমথ প্যারিসে আসিয়া তথাকার ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সাহায্যে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের Legion d'etrangers (বিদেশী সিপাহীর পলটন) মধ্যে ছদ্মবেশে ভর্ত্তি হন। পলটন হইতেই আমার সহিত পত্রালাপ করিতে থাকেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ছদ্মবেশে আমি তখন আমেরিকায় উপনীত হইয়াছি। প্রমথ ফরাসী আফ্রিকার কর্ম্ম-স্থল হইতে আমায় পত্র লেখেন যে, একটা পর্ব্বতের পাদদেশে তাঁহাদের পলটন অবস্থিত আছে; গ্রামে কাফ্রীদের বাস, সভ্য লোকের দর্শন মিলে না। তৎপর, ফরাসীএসিয়ারসাইগন সহর হইতে আমাকে পুনরায় এক পত্র লিখেন,তাঁহার পলটন এইস্থলে বদলী হইয়াছে। ভারতীয় রাজ-নীতি সম্বন্ধে তিনি লিখেন, কার্জনকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার মাথায় "বোমার পাক" তখনও ঘুরিতেছে (It still shimmering in my brain.)।

পাঁচ বৎসর বাদে সৈনিক জীবনের চুক্তি শেষ হইলে ইনি প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনি পলটনে Non-Commissioned Officer পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইসব বিষয়ে তিনি অন্যান্য বৈপ্লবিকদের ন্যায় নিউ-ইয়র্কের আইরিশ বৈপ্লবিক নেতা এবং Gaelic America পত্রিকার সহকারী সম্পাদক George Freeman-এর তত্ত্বাবধানে চলিতেন। ফ্রিমান মহোদয় ভারতবন্ধু ছিলেন এবং জীবনে অনেক প্রকারের রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আমেরিকায়

প্রবাসীরূপে বাস করেন। আমি যখন ক্রিম্যান মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, প্রমথ কেন পলটনে Commission নিলনা (এইটাই আমরা বরাবর চাহিতেছি) তখন তিনি প্রত্যুত্তর করেন, যাহা শিক্ষালাভ করিবার প্রয়োজন তাহা সে লাভ করিয়াছে, Commission হইবার তাহার দরকার নাই। প্যারিসে সে ভারতীয়দের সঙ্গে থাকে। তথা হইতে একজন তুর্কি ভদ্রলোক কনস্টান্টিনোপলে তাহাকে লইয়া যায়, উদ্দেশ্য ছিল, তাহার সম্পা নায় একটি ইংরেজ গর্ভর্ণমেণ্ট-বিরোধী সংবাদপত্র প্রকাশ করিবেন। ইহা ১ম জগৎব্যাপী যুদ্ধের পূর্ব্বে। কিন্তু কন্স্টান্টিনোপলে এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। এই সময়ে এইস্থলে প্রথম ভারতীয়-প্রবাসী "জেহানে-ইসলাম" সম্পাদক আবুসৈয়দ নামে একজন পঞ্জাবের লোকের অতিথিরূপে অবস্থান করেন। এই সময়ে দাউদ আলি নামে ইনি পরিচিত ছিলেন। গোঁড়া ভারতীয়-মুসলমানেরা তাহাকে বোধ হয় মুসলমান হইতে পৃথক করিবার জন্য তাহার পৈতৃক উপাধি "দত্ত" এই সঙ্গে যোগ করিয়া দেয়। এইজন্য আজ পর্যন্ত "দাউদ আলি দত্ত" নামে তিনি অনেক ভারতীয়ের কাছে পরিচিত আছেন।

আমি যখন কনস্টান্টিনোপলে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে গ্রীস হইতে যাই তখন প্রমথ তথায় ছিল না বৈপ্লবিকেরা তাহাকেই ইরানে পাঠাইয়াছেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে আবদুর রহমান পেশোয়ারী নামক একজন ভারতীয়ের কাছ হতে শ্রবণ করি যে, ইংরেজেরা যখন শিরাজ সহর আক্রমণ করে, তখন গুলির আঘাতে সে পায়ে আঘাতগ্রস্ত হইয়াছে; কিন্তু বাঁচিয়া আছে কিনা তাহার সঠিক সংবাদ ইনি দিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত পেশোয়ারী আলিগড় কলেজের ছাত্র এবং ডাঃ আনসারীর সহিত বল্কান যুদ্ধে তুর্কীতে যান। তথায় সামরিক শিক্ষালাভ করিয়া পলটনে

Sub-lieutenant হন (ইনি অ্যাডমিরাল রোফবের সহিত তুর্কি-ইরান সীমান্তে কিছুদিন সামরিক কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন)। প্রমথর সঙ্গে কনসটান্টি-নোপেলে পরিচয় হইয়াছিল, তাই তিনি এইটুকু সংবাদ দিতে পারিয়াছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইরান হইতে পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে বার্লিনে উপস্থিত হন। ইনি আমেরিকার গদর পার্টির পক্ষ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তুর্কীতে যান এবং তথা হইতে ইরানে যান। ইংরেজ আক্রমণের ফলে, ইনি একটি পাহাডী কৌমের মধ্যে ইরানী বলিয়া ছদ্মবেশে লুক্কাইত হন। ইনি আমাকে বলেন, প্রমথ একটি পাহাডী জাতির মধ্যে লুকাইয়া আছে, তাহাকে বাহির করিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু এই চেষ্টা করিবার কোন উপায় তখন বার্লিন হইতে করা অসম্ভব ছিল। অবশেষে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমরা যখন মস্কোতে যাই তখন মস্কোর ফরেন অফিস দ্বারা এই চেষ্টা সফল হয়। প্রমথ আমাদের দলভুক্ত বলিয়া দাবী করিয়া মস্কোর ফরেন অফিসকে তাহাকে ইরান হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অনুরোধ করেন। জুন-জুলাই মাসে এই অনুরোধ করা হয় এবং সেপ্টেম্বরের শেষে প্রথম মস্কোতে উপস্থিত হন।

এই সময় হইতে তিনি রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাকে বার্লিনে জানান। পরে, লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের Oriental Seminary-তে বাঙ্গলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। তথায় তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি তথায় বিবাহ করিয়াছেন এবং একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। তাহার নাম **Igor Datta**। তিনি স্বীয় কর্ম্মে আজও নিযুক্ত আছেন।

পৃষ্ঠা ১০৯-র নোট ৪—সুশীল সেন শ্রীহট্টের বালীয়াচঙ্গ নামক স্থানের অধিবাসী। কিশোর বয়সেই তিনি কলিকাতার স্বদেশী আন্দোলনের

সংস্রবে আসেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার একটা গোলমালে তাহাকে পুলিশ ধরে এবং অল্পবয়স্ক বালক বলিয়া বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিবার হুকুম ম্যাজিষ্ট্রেট দেয়। ইহা আইন-বিরুদ্ধ হুকুম—এইজন্য কলিকাতায় বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। বিপিনচন্দ্র পাল সুশীলকে কলেজ স্কোয়ারে একটা প্রকাশ্য সভায় এই নির্যাতনের জন্য অভিনন্দিত করেন।

শুনা যায় সুশীল একটা "স্বদেশী ডাকাইতি" ব্যাপারে আহত হইয়া মারা যায়। নৌকাতে তাহাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া সঙ্গ দের পালাইবার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। মৃত্যুর কথা তাহার মাতার নিকট গোপন রাখা হয়। আমার প্রবন্ধে তাহার বাড়ীর লোকেরা এই ঘটনা অবগত হন। ইহাই তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অভিযোগ করিয়াছিলেন।

তাঁহার আর এক ভ্রাতা শ্রীবীরেন্দ্রনাথও নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরিত হন।

পৃষ্ঠা ১৮ ফুঃ নোট ৫—৺যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নবদ্বীপ জেলার কয়া নামক গ্রামের লোক। তাঁহার মামা শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের জামাতা। ললিতবাবুর এই সূত্রে দলের সঙ্গে সংযোগ হয় এবং বোধ হয় সেই সূত্রেই বৈপ্লবিক দলে যতীন্দ্রনাথেরও প্রবেশ লাভ হয়।

খৃষ্টাব্দ ১৯০৬-১৯০৭ সালে তিনি এক ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন বা হত্যা করেন। এইজন্যই তাঁহার "বাঘা যতীন", নামকরণ হয়। ৺অন্নদা কবিরাজ মহাশয়ের কাছ হইতে আমি প্রথমে এই ব্যাপার শ্রবণ করি। এই সময়েই মাজুরাবাসী ৺হীরালাল রায় মহাশয়ও কাশীতে একটা হাতের লাঠি দিয়া বাঘ তাড়াইতে গিয়া

সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। বাঙ্গালীর এই অসমসাহসিকতার কথা লইয়া কাশীতে বেশ সাড়া পড়িয়া যায়। এতদ্বারা বাঙ্গালীর সুনামই তথায় হয়। বাঙ্গালীর শৌর্য্যের অভাব নাই তাহা এই দুই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইল বলিয়া তখন ঘোষিত করা হইত। যুগান্তরে এই বিষয়ে সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল।

লেখক, যতীন্দ্রনাথকে দলের প্রথম নিখিল বঙ্গীয় সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে দেখেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতায় নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তখন এই সম্মেলন হইয়াছিল। ইহা দলের প্রথম সম্মেলন। পর বৎসর আমার জেলের পর আরও একবার অধিবেশন হইয়াছিল।

এই সম্মেলনে কোন্ নেতা কোন্ জেলায় বিপ্লবে নেতৃত্ব করিবেন তাহা নির্ধারিত হয়। কিন্তু যাঁহারা এই কর্ম্মের ভার লইয়াছিলেন, ১৯২৫ সালের পরে বাঙ্গালা পর্য্যটন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে জীবিত যাঁহারা ছিলেন, তাহাদের কাহার কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হয়। কিন্তু তাঁহারা আর সে মানুষ নাই, সকলেই নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছেন।

পৃষ্ঠা ২১ ফুঃ নোট ১—১৯২৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ছয় মাস পর আমাদের অন্যতম নেতা ৺অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার মহাজন বাকে আমাদের ডাকিয়া পাঠান। তিনি আমাকে প্রথমেই বলেন :—আপনি জেলে যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন— "আমি জেলে চলিলাম, কিন্তু আমার 'যুগান্তর' কাগজ যেন জীবিত থাকে।" এই বলিয়া আমার জেলে যাইবার পর হইতে অল্প কথায় যুদ্ধ পর্য্যন্ত পার্টির সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া অবগত করান। ইহার মধ্যে সত্যের খাতিরে কতিপয় কথা এইস্থলে ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি।

প্ররোচনায় সে এই কর্ম্ম করিয়াছে, এই স্বীকারোক্তিটিতে এই তথ্য প্রকাশ পায়।

সামসুল হুদার মৃত্যুর বিষয়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিম্নলিখিত অদ্ভুত ঘটনা আমাকে বলিয়াছেন এবং বোধ হয় পুরাতন কোন কোন কর্ম্মীও তাহা অবগত আছেন: আলীপুর মকদ্দমার তদ্বীর করিয়া হুদা গভর্ণমেণ্টের বড় খয়েরখাঁ হইয়া উঠেন এবং তাহার পদোন্নতিও হয়। ইহাতে তাহার হিন্দু সহযোগীদের ঈর্ষ্যা উৎপাদন হয়। পূর্ণ লাহিড়ী, শশী বাবু প্রভৃতি হিন্দু ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারীরা চক্রবর্ত্তীকে বলেন—আলীপুর মকদ্দমায় জড়িত অমুক একটা লম্বা স্বীকারোক্তি করিয়াছে। উহাতে সে আপনাদের জড়াইয়াছে। হয় আপনারা হুদাকে ইহজগত হইতে অপসারিত করান, তাহা না হইলে আপনাদের ধরিব, এই বলিয়া একটি লম্বা স্বীকারোক্তি কাগজ তাঁহারা তাঁহাকে দেখান। ইহার ফলে যতীন্দ্রনাথের হুদাকে সরাইবার চেষ্টা। এতদ্বারা এক ঢিলে দুই পাখীই মারা হইল।

তৎপর চক্রবর্ত্তী বলেন, বার্লিন কমিটির সংবাদ যখন ভারতে পার্টির কাছে পৌছাইল তখন সাজসাজ রব পড়িয়া গেল। তখন আমি সব বৈপ্লবিকদেরবলি—তোমাদের মধ্যে যতীনই bestman সেই নেতৃত্ব গ্রহণ করুক। তাহার পর, যতীন্দ্রনাথের বালেশ্বরে যুদ্ধ ও মৃত্যু হয়।

পৃষ্ঠা ২২—ফুঃ নোট ১—অনুশীলন সমিতির উদ্ভব এই প্রকারে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত নেতাদের মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁহাকে দল হইতে অপসারিত করা হয়। সেইসঙ্গে অপার সার্কুলার রোডের আখড়া ও কর্ম্মীদের বাসাবাড়ী উঠাইয়া দেওয়া হয়। কর্ম্মীদের গ্রে ষ্ট্রীট অঞ্চলে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় বারীন ও অবিনাশ

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন : বারীনেরা কাগজে লিখিয়া মুরারীপুকুরের বাগানে গেল, কাগজ চালাইবার ভার আমার উপর পড়িল। আমি কার্ত্তিক দত্তদের লইয়া ভার গ্রহণ করিলাম। দেখা গেল, দেনা অনেক হইয়াছে অথচ রসিদাদি দেখিয়া বুঝা গেল, অনেক টাকা আসিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মীরা গ্রহণ করিয়াছে। একা কাগজওয়ালার কাছেই ৩০০০ টাকা দেনা ছিল! তাহা আমাকে পরিশোধ করিতে হয়। সেই ব্যক্তি সীতারাম ঘোষে ষ্ট্রীটে বাস করে। যদি চান তাহার সঙ্গে আমি আলাপ করাইয়া দিতে পারি (চক্রবর্ত্তী এই রাস্তায়ই এই সময়ে বাস করিতেন)। এই বিষয়ে অবিনাশ ভট্টাচার্য্যের বিবৃতি দ্রষ্টব্য। তিনি বলেন, কোন দেনা পড়িয়া থাকে নাই। টাকা তখন যথেষ্ট আসিত।

আমার তখন প্রশ্ন এই যে, দল কেন অখণ্ডভাবে রহিল না। ইহাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন : আলীপুর মকদ্দমার পর অখণ্ড কেন্দ্রীভূতদল ভাঙ্গিয়া যায়। এক এক মণ্ডলী স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই আমার সঙ্গে পরামর্শ করিত। আমিই সকলকার মধ্যে Connecting link হই।

এতদ্বারাই বোধগম্য হয়, আলীপুর মকদ্দমার পর বৈপ্লবিক পার্টির অখণ্ডতা ভগ্ন হইয়া উত্তর বঙ্গ পার্টি, পূর্ব্ব-বঙ্গের অনুশীলন এবং পশ্চিমবঙ্গ বা 'যুগান্তর' পার্টির উদ্ভব হয়।

ইহাও বোধগম্য হয় যে, যুগান্তর পত্রিকার পরিচালকদের মণ্ডলীটি যাহা খাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল তাহার কর্ম্মীদের কারাবরণ হওয়ায়, চক্রবর্ত্তী মহাশয় যতীন্দ্রনাথকে নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। সামসুল হুদার মৃত্যু এবং যতীন্দ্রনাথের একজন তরুণ সহকর্মীর মৃত্যুর পূর্ব্বে ধর্ম্ম-তাবাধিক্যে যতীন্দ্রনাথের

ভট্টাচার্য্য থাকিতেন। উক্ত অঞ্চলের একটি মাঠে খেলাধূলা করা হইত। পরে ১৯০৩-১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পার্টির সভ্য সতীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার অন্যান্য বন্ধুরা রামবাগানে একটি আখড়া স্থাপন করেন। শেষে, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সিমলা অঞ্চলে মদন মিত্র লেনের একটা মাঠে আর একটা বড় আখড়া তিনি স্থাপন করেন। পার্টির আখড়া স্থাপন ও পরিচালনার ভার সতীশ বাবুর হস্তেই ন্যস্ত হয়। নূতন সভ্যদের আমরা তাঁহার কাছেই ব্যায়াম শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইতাম।

এই নূতন আখড়াটির নাম সতীশবাবু দেন "অনুশীলন-সমিতি"। একবার আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এই নাম কোথা হইতে পাইলেন। ইহাতে তিনি প্রত্যুত্তর দেন, "পূর্ব্বে আমাদের এক ক্লাব ছিল তাহার নাম ছিল, 'অনুশীলন-সমিতি'। আসলে, একসময়ে আমার পৈতৃক বসতবাটির সম্মুখে ৺নারায়ণচন্দ্র বসাকের একটি আখড়া ছিল। ৺পালওয়ান রামমূর্ত্তিও তথায় আসিতেন বলিয়া শোনা যায়। নারায়ণ-বাবু বলিতেন রামমূর্ত্তিও তাঁহার শিষ্য" সতীশবাবু এই আখড়ার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বিবৃতিতে যে পুরান অনুশীলন সমিতির কথা বলিয়াছেন, তাহা কৃষ্টি, নৈতিক ও সমাজসেবা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। তাহা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না।

সতীশবাবু ব্যায়ামচর্চ্চার দিকে বেশী ঝোঁক দিতেন বলিয়াই মিত্র মহাশয়ের স্নেহ তাঁহার উপর ছিল এবং এই আখড়াকে সাহায্য করিবার জন্য সকলকে তিনি বলিতেন। একবার দেউস্কর ও আমি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পার্টিকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলেন, মিত্র সাহেব অনুশীলনকে সাহায্য করিবার জন্য বলিতেছেন।

তৎপর, ১৯০৫-১৯০৬ সালে মৈমনসিংহের "সুহৃদ সমিতি"র স্থাপয়িতা কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় অকস্মাৎ এক মধ্যাহ্ন সময়ে আমার কাছে

আসিয়া উপস্থিত হন এবং বৈপ্লবিক কর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁহাদের গল্পের প্রধান মশলা (Stock-in trade) ছিল ময়মনসিংহের কোন জমিদার পাঁচ লক্ষ টাকা দেশের কর্ম্মে দান করিবেন। আমি তাঁহার সহিত দেবব্রত বসুর আলাপ করাইয়া দিই। পরে কেদারবাবু মিত্র মহাশয়ের কাছে গিয়া আলাপ করেন।

কেদারবাবু যে-জমিদারের বিষয় ইঙ্গিতকরিয়াছিলেন তিনি হইতেছেন গৌরীপুরের স্বনামধন্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরী। তিনি জাতীয় শিক্ষার জন্য (National Council of Education) প্রতিষ্ঠান স্থাপনার্থ পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেন।

এই ইঙ্গিত বিষয়ে দেবব্রতবাবু ও আমি মিত্র মহাশয়কে বলি, যদি এই জমিদারের কাছ হইতে কিছু সংগ্রহ করা যায় দেখা যাক্। তিনি বলিলেন, চিত্তর (৺চিত্তরঞ্জন দাস) সহিত এই জমিদারের আলাপ আছে, তাঁহাকে বলিতে হইবে। সেই দিনই মিত্র মহাশয়ের বাটীতে পার্টির খরচের জন্য চিত্তরঞ্জনের কিঞ্চিৎ অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি ছিল। আমরা তাঁহার অপেক্ষায় তথায় বসিয়া আছি। চিত্তরঞ্জন আসিলে মিত্র মহাশয় যখন এই উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জনকে এই জমিদারের সংস্পর্শে আসিতে বলিলেন, তখন তিনি উত্তর প্রদান করিলেন, **Unless you shoot his manager you cannot do any-thing with him ;** কিন্তু বহু পরে ১৯০৭-১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যুগান্তর পত্রিকার সাহায্যকল্পে সুবোধচন্দ্র মল্লিকের পত্র লইয়া বারীন্দ্র ও আমি এই জমিদারের কাছে যাই এবং এই ম্যানেজারের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি আমাদের ১০০ টাকা দেন। কিন্তু এই টাকা মনিঅর্ডারে আসিবার পর রাত্রিতেই এক চোর বাক্স ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়।

তৎপর, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ১৯০৫-১৯০৬ বা তৎপরে, বিপিনচন্দ্র পাল ও মিত্র মহাশয় পূর্ব্ব-বঙ্গ পরিভ্রমণকালে আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক উকিল ও

শ্রীপুলিনচন্দ্র দাস নামক একজন তরুণ শিক্ষকের সহিত পরিচিত হন। এই দুইজনকে লইয়া মিত্র মহাশয় ঢাকায় অনুশীলন সমিতি স্থাপন করেন। এই প্রকারে কলিকাতার অনুশীলন সমিতি ও ঢাকার অনুশীলন সমিতি মিত্র মহাশয়ের খাস তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। আন্দোলনের বাকী অংশ যাহা বাঙ্গলা, উড়িষ্যা জুড়িয়া শাখা স্থাপন করিতেছিল তাহা ক্রমশঃ আমাদের কর্ম্মের দ্বারা কেন্দ্রীভূত হইয়া অরবিন্দের ও পরে অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। অথচ সকলকার উপরে ছিলেন মিত্র মহাশয়। কার্ব্বোনারি সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অনুযায়ী এই প্রকারে বিচ্ছিন্নভাবে কর্ম্ম করিবার প্রথা বৈপ্লবিক সমিতির গোড়া হইতেই ছিল। এই জন্যই পরে আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হইতে পারে নাই। কিন্তু দল যে একই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, কলিকাতায় আসিয়া পুলিনবাবু কানাইলাল ধর লেনস্থিত পার্টি কর্মীদের বাসায়ই থাকিতেন এবং আজও আমরা পুরাতন সহকর্মীর মনস্তত্ত্ব লইয়াই কথাবার্ত্তা বলি।

পৃঃ ২৩—ফুট নোট ১—এই বিষয়ে উপরে ব্যক্ত হইয়াছে। এই টাকা প্রদানের পর মিত্র মহাশয় বলিলেন, তাঁহার নিকট পাঁচ মাসের চাঁদা পাওনা, আর দিলে কিনা ৩০ টাকা!

পৃষ্ঠা ২৪—ফুট নোট ১—পাবনা সম্মিলনী দলে উপরোক্ত মুনসেফ চক্রবর্ত্তী, অন্নদা কবিরাজ প্রভৃতি ছিলেন। ইহাদের দ্বারাই রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী প্রভৃতি উত্তর-বঙ্গের বড় বড় নেতৃস্থানীয় উকিল, ৺কতিপয় জমিদার আমাদের দলভুক্ত হন। 'বঙ্গ-ভঙ্গ" আন্দোলনই তাঁহাদের আমাদের কাছে আনয়ন করে।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পার্টির কলহের কথা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথ পার্টি হইতে অপসারিত হইবার পর নাট্যাচার্য্য

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির সহিত আলাপ করেন। আমাদের পার্টির আখড়ায় ঘোড়ায় চড়া শিক্ষালাভ করিবার কালে একবার পড়িয়া গিয়া আমার মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল। তৎপর কোন কারণ উপলক্ষে গিরীশ বাবুর কাছে যাইলে স্বামী সারদানন্দ আমাকে দেখাইয়া গিরীশবাবুকে বলেন—এরা যতীন বাড়ুয্যের চেলা। তাহাতে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, যতীন খুব জোয়ান, না? উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর মনস্তত্ত্বানুযায়ী পালওয়ান বাঙ্গালীর প্রতি গিরীশবাবুর বেশ অনুরাগ ছিল। মিত্র মহাশয়ও এই মনস্তত্ত্বের অধীন ছিলেন। এইজন্য তিনি প্রচার অপেক্ষা আখড়া স্থাপনের বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। এই লইয়াই আমাদের সহিত তাঁহার মতভেদ হয়।

আমি যখন পার্টিতে প্রবেশ করি তখন যতীন্দ্রনাথ তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। পূর্ব্বেকার আখড়ার ছেলেরা যতীন্দ্রনাথকে দেখিয়া ভয়ে জড়সড় থাকিত। আমরা তাঁহাকে শিবাজী কি গ্যারিবল্ডিরূপে ভাবিতাম। তাঁহার বলিষ্ঠ ও সুদীর্ঘ চেহারা, অশ্বারোহণে পটুতা, গম্ভীরভাবে কথাবার্ত্তা বলা প্রভৃতি আমাদের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিত। এ হেন লোক কেন বহিষ্কৃত হইলেন তাহা স্বভাবতই আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করি। ইহার উত্তরে এবং পরের অনুসন্ধানে যে মূলতথ্য আমরা সংগ্রহ করি তাহা বাঙ্গালীর জাতীয়চরিত্রের একটি কলঙ্ক। উত্তরে যতীনবাবুর বিপক্ষে নানা প্রকারের কুৎসিত দোষারোপ প্রদান করা হয় এবং অর্থের অপব্যবহার করার নালিশও থাকে। পরে, যতীনবাবু ও দলের ঝগড়া মিটাইবার জন্য বিদ্যাভূষণের জ্যেষ্ঠপুত্র অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যেরা অনুসন্ধান করেন এবং ইহা আবিষ্কৃত হয় যে, দোষারোপ করা সম্পূর্ণভাবে অন্যায় হইয়াছে।

যতীনবাবু যখন বিদ্যাভূষণের কাছে যাতায়াত করিতেছিলেন, তখন গুজব উঠিল তিনি একটা বড দল গঠন করিতেছেন। এই বিষয় সন্ধান করিবার জন্য দেবব্রত ও আমি একবার শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার বাড়ীতে যাই। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হাসিয়া বলিলেন, ইঁহারা initiated হইতে আসিয়াছেন। পুত্র অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে ছুতা করিয়া পিতাকে তথা হইতে উঠাইয়া লইলেন। যাহাই হউক, যতীন্দ্রনাথের বিষয়ে কথা উঠিলে তিনি বলিলেন, টাকার অপব্যবহারের কথা তোলা ভুল; সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপক্ষেও এই প্রকারের কথা উঠিয়াছিল। তিনি বলিতেন, নানাস্থানে ঘুরি, নানাকর্ম্মে টাকা খরচ হয়। কি প্রকারে সব হিসাব রাখিব? এই বিষয় ব্যতীত, তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিলেন, কি প্রকারে তিনি গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়াছেন। তিনি যে স্থানে গিয়াছেন, তথায় লোকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি একবার গেলেই তৎস্থান জ্বলিয়া উঠে! ১০,০০০ নাগা সন্ন্যাসী বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত আছে। তাহারা তাঁহাকে তাহাদের মোহান্ত করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করেন, কারণ তিনি তাহাদের সঙ্গে মিশিলে পুলিশের নজর তাহাদের উপরে পড়িবে ইত্যাদি। যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, ম্যাটসিনির জীবনী কেন তিনি সম্পূর্ণ করেন নাই। উত্তরে তিনি বলেন, "ম্যাটসিনির জীবন অসফলতার জীবন; এই কথা এই দেশের ছেলেদের জানিতে দিতে চাইনা, এই জন্যই তাঁহার জীবনের Sequel শেষাংশ লিখি নাই। আদর্শ অতি উচ্চে না ধরিলে, কিঞ্চিৎ অগ্রসরও হওয়া যায় না! ১০০ খানা লিখিত পাণ্ডুলিপি আমার বাক্সে পড়িয়া আছে। দেশ তৈয়ারী হয় নাই বলিয়াই আমি তাহা প্রকাশ করি নাই।" পরে তিনি

গ্যারিবল্ডীর স্ত্রী আনিটার জীবনী প্রকাশ করেন। পুনঃ তিনি বলেন "তোমরা ম্যাট্‌সিনির জীবনী পড়িতে চাও, কিন্তু দেশের ম্যাট্‌সিনিকে বুঝ, যে দেশের জন্য কাঁদিয়াছে, নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে তাহাকে জান" ইত্যাদি।

আমরা তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার কালে এই ধারণা লইয়া উঠিলাম যে, তিনি বাঙ্গলার ম্যাট্‌সিনি বলিয়া নিজেকে মনে করেন এবং যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁহার অনুরাগ আছে। এইজন্য পরে আমরা উপহাস করিয়া বলিতাম, "তা বেশ! তিনি বাঙ্গালার ম্যাট্‌সিনি আর যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার গ্যারিবল্ডী।"

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাঙ্গালার বৈপ্লবিক সমিতির স্থাপয়িতার কেহ ছিলেন না। যতীন্দ্রনাথের সম্পর্কে তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রেরা কিছুদিন আমাদের উপর মুড়লীও করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কার্য্য যখন জোরে চলিতে লাগিল তখন তাঁহাদের প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। আমাদের সহিতে আলাপের পর কিছুদিন বাদ বিদ্যাভূষণ উদরী ব্যায়রামে অস্ত্রোপচারে মৃত্যু মুখে পতিত হন। অন্নদা কবিরাজ তাঁহার আত্মীয় ছিলেন। তিনি আমাদের বলিতেন, বিদ্যাভূষণ মৃত্যু-শয্যা হইতে তাঁহাদের বলিয়া গিয়াছেন, "এই প্রকারে বিছানায় শুইয়া মরিও না।"

বিদ্যাভূষণের সহিত সাক্ষাতের পর, দেবব্রতর কাছ হইতে শুনিয়াছিলাম, যতীন্দ্রনাথকে লইয়া বিদ্যাভূষণ মিত্র মহাশয়ের কাছে গিয়াছিলেন। কিন্তু শুনিলাম, উভয়ের মধ্যে প্রীতি সম্পাদিত হয় নাই। কিন্তু পরে যখন ১৯০৩-১৯০৪ সালে অরবিন্দ আবার কলিকাতায় আসিলেন, তখন যতীনবাবু দলে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। প্রথম থেকে আপার সার্কুলার রোডের আখড়া উঠিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত হইতেছে দলের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কর্ম্মের চরম হইতেছে এই সময়ে। অরবিন্দ, যতীন্দ্রনাথ, বারীন্দ্র, অবিনাশ, পরে নিখিলেশ মৌলিক (উপস্থিত স্বামী ভবানন্দ) প্রভৃতি তৎকালে গ্রে ষ্ট্রীটের উপর একটা বড় ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতেন।

এই সময়ে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন জোর চলিতেছে। আমাদেরও কার্য্যে বাণ ডাকিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দেবব্রত উড়িষ্যায় গিয়া কর্ম্মস্থল স্থাপন করিয়াছেন। তথায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিশ্বনাথ কর, যোগেশ ঘোষ প্রভৃতিকে লইয়া কটকে কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। পরে বারীন্দ্র, যতীন্দ্রনাথও তথায় গিয়াছিলেন। এই সময়ে আমাকে যতীন্দ্রনাথ উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন। তথায় সরলা দেবী ৺মধুসূদন দাসের সাহায্যে তাঁহার পালিতা কন্যার সহযোগে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন এবং আমাদের কর্ম্মের গুহ্য ব্যাপার জানিবার জন্য সচেষ্ট আছেন। বিশ্বনাথ কর একদিন আমাকে বলিলেন, সরলা দেবী আমাদের দলের সব খবরই জানেন দেখিতেছি! এই প্রকারে কটকে তৎকালে আমাদের সহিত তাঁহার tug of war চলিতেছিল।

এই সময়ে ইংরেজীতে "No compromise" নামক একটি পুস্তিকা লিখিত হইয়া সমস্ত বাঙ্গালায় বিতরিত হয়। শোনা গিয়াছিল, অরবিন্দ স্বয়ংই ইহা লিখিয়াছিলেন। ইহাই হইতেছে, সর্ব্বপ্রথম গোপনে এবং বেনামীতে বৈপ্লবিক পুস্তিকা প্রচার। তৎপর, অরবিন্দ ও তাঁহার ভ্রাতা বরোদায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের সহিত পার্টির লোকদের আবার কলহ বাধিয়া উঠে। এই সময়ে বিদ্যাভূষণের জ্যেষ্ঠপুত্র অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সহকারী সভাপতি ছিলেন। এই সময়ে কর্ম্ম নূতনভাবে সংগঠিত হইয়াছিল। তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতার সহানুভূতি ছিল যতীন্দ্রনাথের দিকে। কলহের কারণ জিজ্ঞাসা

করিলে সখারাম গণেশ দেউস্কর আমাকে বলেন, কার্য্যকরী-সমিতিতে যতীন্দ্রনাথের কর্ম্মই ছিল দেবব্রতকে আক্রমণ করা। উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাকে কার্য্যকরী সমিতি হইতে সরাইয়া সমিতিতে তাঁহার একাধিপত্য করা। ক্রমশঃ কথাটা সভাপতি মিত্রের কাছে যায়। জানিনা, কি সব নালিশ হইয়াছিল। বিদ্যাভূষণের কনিষ্ঠ পুত্র আমাদের বলিয়াছিলেন, মিত্র মহাশয় যখন Ultimatum দিলেন, "তোমরা আমাকে চাও, কি যতীনকে চাও, তাহা আমাকে বলিবে" তখন আমরা যতীন্দ্রনাথকে সরাইতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু ইহার ফলে সুরেন্দ্রনাথ নিষ্ক্রিয় হন। কারণ তিনি বলিলেন, এমন autocratic লোকের অধীনে কর্ম্ম করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এই সঙ্গে পাবনার দলও সরিয়া দাঁড়াইলেন। এই প্রকারে পার্টির ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হয়।

এই সময়ে যতীনবাবু নিজে একটি পৃথক দল করিতে চেষ্টা করেন। কে কাহার দ্বারা initiated, সেই সন্ধান দ্বারা তিনি কর্ম্মীদের হস্তগত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাকে এই জন্য কাহার দ্বারা দীক্ষিত হই তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যখন বলিলাম, "আপনারা ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অথচ গুপ্তকথা প্রকাশ করিলে আপনারাই ভৎ'সনা করিবেন" তখন তিনি বলিলেন "তাহা ঠিক"।

এই দলাদলির ফলে অরবিন্দ যে মাসে ১০০ টাকা করিয়া দিতেছিলেন তাহা বন্ধ হইয়া যায়, কর্ম্মীদের বাসা উঠাইয়া দেওয়া হয়। আমরা জনকতক শ্মশান জাগাইয়া রাখিতে থাকি।

ইতিমধ্যে অবিনাশ বাবু কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অন্নদা কবিরাজ মহাশয় একবার তাঁহার অখিল মিস্ত্রি লেনস্থিত বাসায় আমাকে লইয়া যান। তিনি কার্য্যে কেন ভাটা পড়িয়াছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করায় কবিরাজ তাঁহাকে চক্ষু টিপিয়া ইসারা করেন। ইহার অর্থ

আমি বুঝিলাম—এই লোক পর, ইহার সহিত ভিতরের কথা কহিবেন না। যাহা হউক, অবশেষে পাবনার দলের লোকের সহিত দেবব্রত ও দেউস্করের সাক্ষাৎ করাইয়া দিই। দেবব্রতের গ্রে ষ্ট্রীট অঞ্চলের পৈতৃক বাড়ীতেই এই আলাপ হয়। সখারাম বাবু যতীন্দ্রের সহিত বিবাদের কারণ সব খুলিয়া বলেন। কিন্তু ইহার পরও তাঁহারা আমাদের সঙ্গে মিলিলেন না।

ইত্যবসরে একটা ঘটনা উপস্থিত হয় যাহাতে অরবিন্দকে কলিকাতায় আনাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে বলিয়া কবিরাজ আমাকে বলেন। চীনদেশ হইতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কলিকাতায় আসেন। ইনি চীন বৈপ্লবিক দলের একজন প্রতিনিধি। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সাহত চৈনিক বৈপ্লবিকদলের সম্বন্ধ স্থাপন করা। তিনি বলিলেন, ভারতীয়েরা এক কোটি টাকা চাঁদা দিক, চৈনিকরাও এক কোটি টাকা দিবে। এই সম্মিলিত অর্থে একটা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া ভারত ও চীনের মধ্যে সদ্ভাবের যোগাযোগ স্থাপন করা হইবে। এই উপায় গ্রহণ করিলে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের নজর এই বৈপ্লবিক সংহতির উপর পড়িবে না। কবিরাজ বলেন, এই চৈনিক ভদ্রলোকের সহিত ধর্ম্মমহামণ্ডলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কথা বোধ হয় বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।

এই সময়ে কার্য্যের তাগিদে দেবব্রতকে আমরা পাটনায় অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর কাছে পাঠাই। তথায় তিনি তখন অস্থায়ী মুন্সেফরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কার্য্যে দলাদলি রাখা উচিত নহে বলিয়াই আমাদের এই প্রচেষ্টা হইয়াছিল। অবিনাশবাবু দেবব্রতকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া গ্রহণ করেন। কার্য্যের কথায় তিনি বলেন, "আপনাদের

সহিত মিলিবার কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল আপনারা কি করিতেছেন তাহা জানিবার জন্যই কথাবার্ত্তা (উপরোক্ত) চালাইয়াছিলাম।" যাহাই হউক, পুনর্মিলন হইল না। কিন্তু এই আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়া কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্রে মিশামিশি হইতে লাগিল।

এই সময়ে কালীঘাটে একটি উগ্র বৈপ্লবিক দল উদ্ভুত হয়। ইহারা সকলেই বর্ষীয়ান ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহাদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন ৺হরিদাস হালদার (ইনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে ঘোর অহিংসবাদী হইয়াছিলেন), ইঁহার আত্মীয় গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, "কাব্যতীর্থ" উপাধিধারী একজন কালীমন্দিরের পুরোহিত। এই পণ্ডিত মহাশয় একটি "স্বদেশী রামায়ণ" রচনা করেন। এই পুস্তকের কতক-গুলি গান পরে "স্বদেশী সঙ্গীত" বলিয়া বাজারে প্রচার হয়। যথা: "স্বদেশে ধূলি স্বর্ণরেণু বলি রেখ রেখ মনে এই ধ্রুব জ্ঞান", "একবার ফিরে এস, ফিরে এস গো" ইত্যাদি। এই স্বদেশী রামায়ণ কথকতা দ্বারা প্রচার করা হইত। এই কথকতা বাঙ্গালায় জনপ্রিয়। হয়। প্রথমে একজন কথক নিযুক্ত হন, পরে হালদার মহাশয়ের এক ভাগিনেয় কথক হন। উভয়েই কালীঘাটের লোক ছিলেন।

এই সময়ে ছায়াচিত্র দ্বারা আমরা প্রচার-কর্ম্ম আরম্ভ করি। ইন্দ্রনাথ নন্দী ও অধর চন্দ্র লস্কর এই বিষয়ে অগ্রণী হন।

পৃঃ ২৪ — ফুঃ নোট ১—এই সবকর্ম্ম বিষয়ে পাবনা সম্মিলনের সহিত সহযোগিতা স্থাপনে উভয় দলের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে থাকে। এই কালে আমি অবিনাশবাবুকে বলি, আপনি পাটনায় আছেন, আপনার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী মুকুন্দবাবুর সহিত রাজনীতিক সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা কেন করিতেছেন না? তিনি ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, নিশ্চয়ই ঘোর স্বদেশী।

অবিনাশ বাবু উত্তর প্রদান করেন, মুকুন্দ বাবু ঘোর স্বদেশী। কিন্তু অতি-উচ্চস্তরে অবস্থিত আছেন। আমার দ্বারা approach করা সম্ভব নহে।

পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গের শানাই বাজিয়া উঠিলে অবিনাশ বাবু প্রভৃতি সভাপতি প্রমথ মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যতীন্দ্রবাবুর সহিত বিবাদের বিষয় আলোচনা করেন এবং নিঃসন্দেহ হইয়া আমাদের সঙ্গে পূর্ণ হৃদয়ে মিলেন। ইহার ফলে, উত্তর-বঙ্গের কর্ম্মীরা আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন।

এই সময়ে অরবিন্দ তাঁহার "ভবানী মন্দির" পরিকল্পনা সফলকাম করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ভ্রাতাকে পুনঃ কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। এই উপলক্ষে ৺সুবোধচন্দ্র মল্লিকের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। তাঁহার এক নিকট-আত্মীয় অরবিন্দের বিশেষ বন্ধু এবং বরোদা দলের নাকি এক চাঁই ছিলেন।

এই যোগাযোগের ফলে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কানাইলাল ধর লেনে কর্ম্মীদের থাকিবার জন্য একটি তেতলা বাড়ী ভাড়া করা হয়। এই প্রকারে বৈপ্লবিক সমিতির ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে ১৯০৮-৯ সাল পর্য্যন্ত নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতির কর্ম্ম অর্থ-নৈতিক ও মানসিক বল বিষয়ে খুব ভাল অবস্থা ছিল।

এক্ষণে যতীন্দ্রনাথের কথা পুনরুল্লেখ করা যাউক। দলাদলির ফলে, তাঁহার মন অন্যদিকে চলিয়া যায়। তিনি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। শোনা যায়, তিনি সোহং স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেনারস কংগ্রেসের প্রদর্শনীক্ষেত্রে তাঁহার সহিত দেবব্রতের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে কর্ম্মে পুনরাগমন করিবার জন্য দেবব্রত আহ্বান করেন। অনুমান হয়, অরবিন্দও এই অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন।

আমাদের কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্ম মহামণ্ডলের সহিত পরিচিত ছিলেন। যখন যতীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী হইলেন তখন তাঁহাকে কোন মঠের মোহান্ত করিয়া স্থিতি করাইবার কথা হয়। একদল বলিলেন, মহামণ্ডলের প্রধান উদ্যোক্তা তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে সুবিধা হইলে তাঁহাদের একজন লোক তিনি গ্রহণ করিবেন। কিন্তু শেষে দেখিলাম যতীন্দ্রনাথ "নিরালম্ব স্বামী" নাম ধারণ করিয়া স্বীয় পৈত্রিক ভূমিতে আশ্রম স্থাপন করেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, যতীন্দ্রনাথ আলিপুর মকদ্দমায় জড়িত হইয়া অভিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু নির্দোষ বলিয়া খালাস পান।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ১৯২৮ খৃঃ বর্দ্ধমান ছাত্র ও যুবসম্মেলনের পর আমি বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলি ও কতিপয় ছাত্র লইয়া স্বামী নিরালম্বের আশ্রমে যাই। তিনি "চান্না" নামক স্বগ্রামের বাহিরে আশ্রম করিয়া বাস করিতেন। ইতিপূর্ব্বে বর্দ্ধমানের কতিপয় যুবকের কাছে তাঁহার কথা বলিয়াছিলাম। তাঁহারাও স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিত। আমি যাইলে, তিনি আমায় চিনিতে পারেন এবং আমার ঘোড়া থেকে পড়িয়া মাথা ভাঙ্গার কথা এবং আমাকে পার্টির আফিসে লইয়া আসার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। আমি তাঁহাকে বলি, মহাশয়, আপনার সহিত পার্টির কি বিবাদ হইয়াছিল তাহা আমরা অবগত নহি। আমরা কেবল হুকুম তামিল কারতাম, আমাদের কেবল "দাদা ও গদা" শিক্ষাদান করা হইয়াছিল। এই জন্য বুড়ো বয়সে আপনার কাছে মার্জ্জনা চাহিতে আসিয়াছি। এই বিষয়ে হেমদাস তাঁহার পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কি ঠিক? তাঁহার প্রত্যুত্তরে স্বামীজী বলিলেন, 'উহাই ঠিক'। বারীন রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র এবং K. D. Ghose-এর পুত্র বলিয়া. বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বংশের লোক বলিয়া

নিজেকে মনে করিত এবং জগতকে সেইভাবে দেখিত" এই বলিয়া তিনি নীরব হন। তৎপর, আমি বলিলাম, আমরা দেবব্রত বাবুর কাছ হইতে সমস্ত শুনিয়া বলিয়াছিলাম, "আপনারা যতীনবাবুর উপর অবিচার করিয়াছেন"। ইহা দেবব্রতও স্বীকার করেন। স্বামীজীও বলেন, "দেবব্রতর সঙ্গে আমার এক রেলওয়ে ষ্টেসনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে স্বীকার করে যে আমার উপর অবিচার করা হইয়াছিল"

তৎপর রাজনীতির কথা উঠায় তিনি বলিলেন, "আজ অরবিন্দ এই কথা স্বীকার করিবেন না যে, আমিই তাঁহাকে রাজনীতিতে আনয়ন করি। আমি তিলকের কাছে শুনিতাম আর তাহা অরবিন্দকে বলিতাম। তিনি বলিতেন, 'তাই নাকি?'" ইহাতে আমি বলিলাম, "মহাশয়, আপনারা বরোদা হইতে আষাড়ে গল্প আমদানী করিয়াছিলেন, আজও ছেলেমহলে সেই সব গল্প চলিতেছে আপনারা বিপ্লবের কিছুই জানিতেন না, কেবল আনন্দমঠ-পড়া গল্প করিতেন। আমি যে বিপ্লব করিলাম, বিপ্লব দেখিলাম, প্রত্যক্ষ করিলাম। তাহা অন্য জিনিব ইহাতে তিনি নিরুত্তর হন।

শেষে আমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করি, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে আমি বলি, এক্ষণে আপনি আমাকে কি প্রকারে কর্ম্ম করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। ইহাতে তিনি বলেন, "তোমার কর্ম্মের সংবাদ আমি রাখি। শ্রমিক আন্দোলন চলুক এবং এই সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ চলুক অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদীর কর্ম্মও মধ্যে মধ্যে সম্পাদিত হউক।

তিনি আমাকে চিনিলেন এবং আমাদের কর্ম্মের খবরও রাখিতেন কিন্তু পুনঃ পুনঃ বলিলেন, "গাঙ্গুলী মহাশয়কে চিনিতে পারিলাম না। ইহার কারণ গাঙ্গুলী যতীনবাবুর কার্য্যের সময়ে একজন তরুণ ছাত্র

মাত্র ছিলেন ও আখড়ায় যাতায়াত করিতেন। তিনি আত্মোন্নতি সভার সভ্যরূপে সার্কুলার রোডের আখড়ায় যাইতেন। তৎকালে ইন্দ্রনাথ নন্দীই ইঁহাদের প্রধানরূপে আখড়ায় যাইতেন।

পরদিন প্রাতে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বর্দ্ধমানে প্রত্যাবর্ত্তন করি। মাঠে আসিয়া সঙ্গী ছাত্রেরা বলিলেন, বাপরে! ইনি কেবল চাবুক হাতে আছেন। ইতিমধ্যে এই ছাত্রেরা আমাদের উভয়ের কথোপকথন শুনিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "একবার কর্ম্মী ছেলেরা বাসা হইতে অদৃশ্য হয়। কয়দিন বাদে তাহারা ফিরিয়া আসে। আমি তাহারা কোথায় গিয়াছিল জিজ্ঞাসা করায় কেহ কিছুই বলেনা, সকলেই মুখ বন্ধ করিয়া থাকে। শেষে আমি চাবুক হাতে করিয়া বলি—বলো নাহলে চাবুক পেটা করি"। ইহাতে শেষে তাহারা স্বীকারোক্তি করে যে তাহারা ডাকাইতি করিতে গিয়াছিল। ইহাই বাঙ্গালায় প্রথম রাজনৈতিক ডাকাইতি।" বোধহয় ১৯০২ সালে ইহা সংঘটিত হয়। আমি এই হাসির কথা শুনিয়াছিলাম যে, দলের তরুণেরা তারকেশ্বর লাইনের কোনস্থানে ডাকাইতি করিতে যায়; কিন্তু তথায় কেবল কয়লা থাকিতে দেখে। দেবব্রত বলিয়াছিলেন, কোন এক সভ্য ভগ্নী নিবেদিতার কাছে হইতে তাঁহার রিভলভার ধার চাহিতে গিয়াছিলেন। কেন তিনি এই দ্রব্য চাহেন কৌতূহলবশতঃ নিবেদিতা এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সভ্যটি গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলেন। এই প্রচেষ্টাই বোধ হয় নিরালম্ব স্বামী ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

ছাত্রেরা উপরোক্ত **Exclamation**-এর পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন ইনি অকৃতকার্য্য হইলেন। ইহাতে আমি উত্তর করি, 'তোমরাই বুঝ, এই প্রকারের মেজাজ থাকিলে বাঙ্গালায় কি ছেলে বশ করা যায়?"

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্রে, পড়িলাম নিরালম্ব স্বামী কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। আজ তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্য কাশী বিদ্যাপীঠের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার আশ্রমে থাকেন।

পাবনার নেতৃস্থানীয় অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কাছ হইতেই প্রথমে Mass Movement-এর কথা শ্রবণ করি। যখন আমি অন্নদা কবিরাজের সহিত প্রথম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি তখন কথাপ্রসঙ্গে প্রথম মিত্র মহাশয়ের কর্ম্ম-পদ্ধতির বিষয় বিবৃত করি। আমি বলি, মিত্র সাহেব চান যে, দুর্বল বাঙ্গালী ব্যায়ামাদি করিয়া শারীরিক সবলতা লাভ করুক। তাহাতে তিনি বলেন, মিত্র সাহেব এই উপায়ে কত লোক পাবেন? দেশে যে তৈয়ারী মাল আছে, তাহাদের সঙ্গে লইবার চেষ্টা করা হউক। দেশের কৃষকেরা সবল, তাহাদের মধ্যে কার্য্য করা হউক। আমাদের দেশের (পাবনা) কৃষকেরা একবার বিদ্রোহ করিয়াছিল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জমিদারের বিপক্ষে পাবনায় উত্থান হয় একদিনে ৯০ খানি কাছারি তাহারা জ্বালাইয়া দিয়াছিল। ইহারই ফলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম Bengal Tenancy Bill গভর্ণমেণ্ট দ্বারা পাশ করা হয়। তাহাদের শরীর সবল, আমিই পাবনা থেকে ৫০,০০০ লোক দিব ইত্যাদি।

অবিনাশ চক্রবর্ত্তী পাবনার ভেরেঙ্গা গ্রামে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সব জজ ৺মাধব চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গোষ্ঠী উত্তর-বঙ্গের একটি বিশিষ্ট বংশ। তিনি অস্থায়ী মুনসেফরূপে চাকরী করিবার সময়ই বৈপ্লবিকদলের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ১৯০৪-১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরে হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৯১৪-১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার বৈপ্লবিকদের সহিত তিনি "অন্তরীণ" হন। পরে তিনি

আর একজন বৈপ্লবিক নেতা প্রভাস চন্দ্র দের সহযোগে "মহাজন এণ্ড ট্রেডিং ব্যাঙ্ক" স্থাপন করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর বাদে এই ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়। তাঁহার বন্ধুদের চেষ্টায় তৎপরে Port Trust এর Assessor-এর পদ দুই বৎসরের জন্য পান। প্রভাসবাবু তরুণ বয়সে আত্মোন্নতি সমিতিতে ব্যায়াম করিতেন। যুদ্ধের সময়ে কুচবিহার কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি অন্তরীণ ছিলেন। এক্ষণে রাণী-ভবানী কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বাদ দিয়া বাঙ্গালার বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না। যখন দেশের লোক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করিতে ভয় পাইত, তখন এই ধনাঢ্য ও উচ্চবংশের এবং উচ্চ রাজকর্ম্ম পদে প্রতিষ্ঠিত যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। একবার তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—আপনারা জানেন, আমার কত টাকা আছে? আপনারা কাজ করুন, আমি টাকা দেব'। এইকথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার ছিল দেশমাতৃকার কর্ম্মে উৎসর্গীকৃত জীবন। বর্ষীয়ান কর্ম্মীদের নিকট শুনিয়াছি, তিনি অন্ততঃ ৭০,০০০ হইতে ৮০,০০০ টাকা বৈপ্লবিক কর্ম্মে দান করিয়াছিলেন। শেষে নিঃস্ব ও কপর্দ্দকশূন্য শোচনীয় জীবন যাপন করিয়া এই জগত হইতে অন্তর্ধান করেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া Servant অফিসে ৺শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, "তোমরা অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর সব টাকা লইয়া তাহাকে নিঃস্ব করিয়াছ"।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যখন বিপ্লববাদের উপরোক্ত তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয় এবং কানাই ধর লেনে কর্ম্মীদের বাসা স্থাপিত হয়, তখন হইতে আমরা তাঁহার নেতৃত্বাধীনে চলিতাম। এই সময়ে প্রমথনাথ মিত্র ছিলেন

আমাদের কাছে নির্গুণ নিরাকার পরব্রহ্মস্বরূপ. আসলে মস্তকোপরি থাকিতেন অরবিন্দ ও অবিনাশ। ইহার মধ্যে অবিনাশ বাবুর সহিত আমাদের নিত্যকর্ম সম্বন্ধে বেশী যোগাযোগ ছিল। তবে তিনিও অরবিন্দের অধীনস্থ ছিলেন। এই বিষয়ে কোন লিখিত ব্যবস্থা ছিল না, Natural Selection দ্বারাই ইহার গতি নির্দ্ধারিত হইত। যাঁহারা যুগান্তর কাগজ পরিচালনা করিতেন, তাঁহারাই অরবিন্দের বেশী ঘনিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু বেশীরভাগ কর্ম্মী অবিনাশ বাবুর সহিত মিশিবার সুবিধা পাইতেন। নেতাদের এই আসন বোধ হয় লোকের অবিদিত মনের (Unconscious Mind) পর্দায় এই যুক্তির দ্বারা ঠিক হইত যে, সাধারণের নিকট সম্মান প্রাপ্তির দাঁড়িপাল্লা দ্বারা এই পর্য্যায় নিরূপিত হয়।

অরবিন্দের পণ্ডিচারীতে গমনের পর, অনুমান হয়, অবিনাশ বাবুর হস্তেই নেতৃত্বের ভার পড়ে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বালেশ্বরের জঙ্গলে মৃত্যু পর্য্যন্ত যুগান্তরের কর্ম্মীদের দ্বারা যে ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার নেতৃত্ব করিতেন তিনি। ১৯১৫ খৃঃ যুদ্ধের সময় যখন চারিদিকে ধর পাকড় সুরু হইল, তখন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা হয় তিনি যেন দেশ হইতে বাহিরে পালাইয়া যান। তাঁহার কনিষ্ট ভ্রাতা আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমরা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, তুমি পালাইয়া যাও, বার্লিনে ভূপেন প্রভৃতি আছেন।" কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তর করেন—'আমি যদি ফাঁসী যাই তাহা হইলে আমার বংশ গৌরবান্বিত হইল বলিয়া মনে করিব। আমি পালাইব না।' বরং তিনি আমায় পুনঃ পুনঃ বলিতেন, অরবিন্দ পালাইয়া গেলেন।"

দেশে প্রত্যাগমন করিবার পর, তাঁহার সহিত আমার অনেকবার সাক্ষাৎ হয়। বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ে অনেক মিথ্যা

কথা প্রচার হইতেছে, তাই তিনি বলিতেন, "আমি আপনার জীবনী লিখিয়া যাইব।" একবার তাঁহাকে আমি বলি, "আমি কার্য্য করিতে চাই, এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি কিন্তু দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।" তিনি জবাব দেন, "শপথ আপনি কোন লোকের কাছে দেন নাই, দেশকে দিয়াছেন, দেশের কার্য্য করিয়া যান"। কিন্তু তিনি আমার নূতন মত বিষয়ে বলেন, "আপনার লেখা প্রাঞ্জল কিন্তু দেশ তাহা গ্রহণ করিবে না"। অবশেষে, বোধহয় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বা ইহার কাছাকাছি সময়ে, একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার বাড়ী আসিয়া তিনি বলেন, "দেখুন, যে কার্য্যটা আমরা সে যুগে করি নাই, সেই কর্ম্ম করিতে চাই। বঙ্কিম মুখার্জী কোথায়, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই" আমি "উত্তর করি, সেই বিষয়ে চিন্তিত হইবেন না, তাঁহাদের কর্ম্ম তাঁহারা করিতেছেন"। ইহাই তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

একবার, তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলাম, "মহাশয় আপনারা উচ্চ আদর্শযুক্ত ভাল লোক, আপনারা Idealist (আদর্শবাদী) কিন্তু Realityর (বাস্তবিকতার) জ্ঞান আপনাদের নাই। এক্ষণে অনুভব করিতেছি, আপনারা কেবল "আনন্দমঠ" পড়িয়া বিপ্লব করিতে গিয়াছিলেন এবং আমাদেরও তদনুরূপ বুঝাইয়াছিলেন কিন্তু বিপ্লব জিনিসই আলাদা—ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এই সত্য বুঝাইতে আমাকে দেশে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। সাধারণে যাঁহারা দেশের রাজনীতির সন্ধান জানেন তাঁহারা এই বিষয়ে অবগত আছেন। লেনিন যাহা বলিয়াছেন—বিপ্লব একটা Science (বিজ্ঞান); ইহা কাল্পনিক ও ভাবপ্রবণতার উপর নির্ভর করে না, ইত্যাদি বুঝাইতে আমার বার বৎসর লাগিয়াছে। আজ 'কমুনিষ্ট' ও সোসালিষ্ট দেশে ছড়াছড়ি,—হড়াহড়ি এবং মারামারি

করিতেছে। আজ গান্ধীজী হইতে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত Casteless and Classless Society এবং সাধারণের জন্য Socio-economy কর্ম্মপদ্ধতির কথা বলিতেছেন। কিন্তু একদিন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উভয়ে "Equality of man" (মানবের সাম্য) যে অসম্ভব ব্যাপার এই বলিয়া আমাকে উপহাস করিয়াছিলেন।

পৃঃ ২৪ ফুঃ নোট ২—সখারাম গণেশ দেউস্কর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বংশীয়। এই বংশ মহারাষ্ট্রাধিপত্য কালে সাঁওতাল পরগণায় তালুক পাইয়া কর্ম্মাটারে বাস করেন। এই বংশ এখনও তথায় আছেন; পূর্ব্বে এই স্থান বাঙ্গালার মধ্যে ছিল। এই জন্যই তিনি বলিতেন: বর্দ্ধমানের রাজবংশ প্রভৃতি বহু শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালায় বাস করিয়াও নিজেদের "বাঙ্গালী" বলেন না কিন্তু আমি Proud to call myself a Bengalee (আমি নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করি)। তিনি দেওঘরে প্রথমে শিক্ষকতা করিতেন। তথায় বারীন তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি বাঙ্গলায় সুসাহিত্যিক ছিলেন এবং অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি "হিতবাদী" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক "দেশের কথা" আজও গভর্ণমেণ্ট দ্বারা নিষিদ্ধ (banned) হইয়া আছে। তিনি বাঙ্গালায় মহারাষ্ট্রীয় বীরদের পরিচয় প্রদানের জন্য শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করেন।

তিনি সমিতির প্রথম হইতেই ইহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং আপার সার্কুলার রোড বাসভবনে কর্ম্মীদের মধ্যে বক্তৃতা দিতেন। সেই স্থানেই আমার সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ১৯০৪ ৫ সালে তিনি কর্ম্মীদের লইয়া পাঠ-চক্র করিতেন। তাহাতে তিনি ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতেন।

তিনি এই পাঠ-চক্রে "সোসালিসম্" সম্বন্ধে পুস্তকসমূহ কলিকাতাস্থিত Imperial Libraryতে গমন করিয়া পড়িতে বলিতেন। ইহার ফলে, একজন যুবক (হরিশচন্দ্র শিকদার) তথায় গিয়া গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ ম্যাকফারলেনকে* গিয়া বলেন, "আমি সোসালিসম্ সম্বন্ধে পুস্তক পড়িব, আমাকে এই পুস্তক বাহির করিয়া দিন।" ইহাতে ম্যাকফারলেন বলেন: My dear boy, don't read these bad books I will give you better books to read" (প্রিয় বালক, ওই সব খারাপ পুস্তকসমূহ পড়িও না, আমি তোমাকে ভাল বই পড়িতে দিব)। ইহার পর, আমি গিয়া ক্যাটালগ খুঁজিয়া সোসালিষ্ট পুস্তক বাহির করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু হোরেশ হাইণ্ডম্যানের *History of British Socialist Democratic Party* নামক একটি চটি পুস্তিকা কেবল পাই।

এই সময়ে আর একজন ছাত্র গিয়া লাইব্রেরীর suggestion খাতায় ম্যাটসিনির আত্মজীবনী ক্রয় করিবার অনুরোধ জানায়। তাহাতে সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষের কাছে তাহার তলব হয় এবং তাহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

পৃঃ ২৪ ফুঃ নোট ৩—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় উত্তর-কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৺রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতষ্পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল ভবানী। কালীচরণের মৃত্যুতে নিজবংশের যে পরিচয় "সন্ধ্যা" পত্রিকাতে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন,

---

* ম্যাকফারলেন কার্জনের পেটোয়ারূপে কলিকাতার এই পদ পাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সেই একদিন গিয়াছে আর আজ কি অবস্থা! আজ ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্টের কাছে সোসালিসম্ সংক্রান্ত পুস্তক কি খারাপ বই?

তাহাতে তাঁহার বংশকে বন্দ্যোকূলের শ্রীরাম ঠাকুরের 'সন্তান" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

তিনি ছাত্রাবস্থায় কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন এবং ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। এই সময়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট যাতায়াত করিতেন। পরে, প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু অতি অল্পদিন বাদেই রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর সভ্য হন। শেষে তিনি উক্ত মণ্ডলীর সন্ন্যাসী হন, কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায় মুণ্ডিতমস্তক, গেরুয়া বসন ও নগ্নপদ থাকিতেন। এই অবস্থায় তিনি Sophia নামক ইংরেজীতে একটী মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। মাদ্রাজ ও পরে করাচী হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকায় তিনি খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিতেন। কিন্তু তাঁহার মতের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, হিন্দু জাতীয়তা বা ভারতীয় আচার তিনি কখন ত্যাগ করেন নাই। শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মণ্য আচার রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, খৃষ্টান ধর্ম্মকে বেদান্তের উপর ভিত্তি স্থাপিত করিতে হইবে। তাঁহার প্রিয় শিষ্য ৺কার্ত্তিকচন্দ্র পাল মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন, 'তিনি বলিতেন, কাশীতে যেমন সর্ব্ব দেবতাই স্থান পাইয়াছেন, তেমন যীশুখৃষ্টেরও তথায় স্থান পাওয়া চাই।"

শেষে কিন্তু করাচীর বিশপ তাঁহাকে Ex-Communicate-করে অর্থাৎ খৃষ্টীয় মণ্ডলী হইতে অভিচ্যুত করে। অপরাধ এই—বেদান্তবাদ প্রভৃতি Heathenism (অখৃষ্টীয়বাদ) তিনি প্রচার করিতেছেন। এই ঘটনাটি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হয়। তৎপর, তিনি "Twentieth Century" নামক একটি মাসিক পত্রিকা সিমলা ষ্ট্রীট হইতে বাহির করিতে থাকেন।

ইতিপূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগ হইয়াছে। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত দর্শন বিষয়ে বক্তৃতাদি করিয়া এই দুই স্থানে উক্ত দর্শন পাঠ করিবার জন্য একটি অধ্যাপকের পদের সৃষ্টি করান। দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই, বোধ হয় ঈপ্সিত অর্থ সংগ্রহ হয় নাই। এই সময়ে অকস্মাৎ আমার সহিত তাঁহার ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে পুনঃ সাক্ষাৎ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইংলণ্ডে কি দেখিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইংলণ্ডের লোকেরা নিজেদের "ব্রাহ্মণ" মনে করেন আর আমাদের "শূদ্র" বলে।

ইহার পর, তিনি "সন্ধ্য" নামক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহা সন্ধ্যাবেলা বাহির হইত এবং প্রথমে বিশেষ ভাবেই নরমপন্থীয় ছিল। পরে আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ গরমপন্থীয় যুবকদের সঙ্গে মিশিয়া এবং দেশের লোকের মেজাজও গরম হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রিকার সুরও গরমপন্থী হয়। শেষে, তিনি রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হন কিন্তু জামিনে খালাস পান। এই সময়ে, তিনি অস্ত্রোপচারের ফলে কাম্বেল হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সাধারণে একটি প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার শব দাহ করে।

এইস্থলে একটী তর্কের কথা উল্লেখ করিতেছি। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আমি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখি তাঁহার মাথায় হিন্দুর 'টিকি" রহিয়াছে। ইহাতে আমি তাঁহাকে ঠাট্টা করায়, তিনি বলিলেন, উহা রাখা প্রয়োজন। পরে লোকমুখে শুনিলাম, তিনি হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় "হিন্দু" হইয়াছেন। পণ্ডিত ৺পঞ্চানন তর্করত্ন এই কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, তিনি লেখক ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শানুযায়ী এই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

তিনি যে শেষে হিন্দুধর্ম পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার যেসব গুণগ্রাহীরা এখনও জীবিত আছেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াই এই তথ্য এই স্থলে আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা হিন্দুমতে, কালীঘাটে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ করেন। এই সময়েই আমার সহিত তর্কের সময় তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি কখনও যীশুকে 'অবতার' বলেন নাই। তিনি নিরামিষাশী এবং খাদ্য ও আচারে ছুৎমার্গী ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর শেষ সময় তিনি বৈপ্লবিক মতবাদী হইয়াছিলেন। একবার "সোনার বাঙলা" নামক বৈপ্লবিক ইস্তাহারের এক সংখ্যা তাঁহার প্রেস হইতে আমি ছাপাইয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বাঙ্গালার বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিষয় কিছুই জানিতেন না বলিয়া অনুমান হয়। ইহার কারণ, তিনি ও তাঁহার বন্ধু গোবিন্দ বাবু মজাফরপুরের উকিল এইসময় আমাকে বলেন-"ভূপেন, তুমি অরবিন্দদের সংশ্রব ছাড়িয়া দাও তোমাকে কেন্দ্র করিয়া আমরা একটা গুপ্ত-বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করিতে চাই।"

আমার জেল যাইবার দিন সকালে তাঁহার কাছ হইতে বিদায় লইতে যাই। তিনি সজল নয়নে আমাকে বিদায় দেন। তাঁহার এক পূর্ণ জীবনীর পাণ্ডুলিপি করাচির তাঁহার এক খৃষ্টান শিষ্যের নিকট আজও রহিয়াছে, মুদ্রণের কোন চেষ্টা হয় নাই। তাঁহার এক আলেখ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চিত্র গ্যালারীতে প্রদান করিবার জন্য অনেকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাই। পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তারা বলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর, পরিষদে এই উদ্দেশ্যে একটা মন্তব্যও গৃহীত হইয়া আছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ এই আলেখ্য পরিষদকে দান করিল না! বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়, একসময়ে দেশও তাঁহাকে বিশেষ

সম্মান দিয়াছিল; কিন্তু সামান্য এই খরচার ভার বহন করিতে আজ কেহ স্বীকার পায় না।

পৃষ্ঠা ১৪ ফুটনোট ৪—অন্নদা কবিরাজ মহাশয় পাবনার সিরাজগঞ্জ মহকুমার লোক। অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর সহকর্ম্মীরূপে আমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। শেষে তিনি দয়ানন্দ স্বামীর শিষ্য হন এবং তাঁহার অপমৃত্যু হয়।

পৃষ্ঠা ২৪ ফুটনোট ৫—মনে পড়ে সর্ব্বসমেত ৪০০ টাকা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া যায়। অন্যত্র হইতে নিশ্চয়ই আর একশত টাকা পাওয়া যায়।

পৃষ্ঠা ২৫ ফুটনোট ১—ইহার নাম মণীন্দ্রনাথ লাহিড়ী। ইনি বারীনের সঙ্গে ফুলার বধের জন্য চারিদিকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। গৌহাটিতে ইনি ঘরে বসিয়া রিভলভার লইয়া নাড়াচাড়া করিবার কালে এক হস্ত দিয়া গুলিভেদ করিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে তাঁহাকে হাসপাতালে যাইতে হয়। তথায়, ডাক্তার ব্যাপার দেখিয়া বলে, "ফুলারকে মারিতে এখানে আসিয়াছ কি?" ইহাতে উভয়ে গৌহাটি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইহার পর, মনীন্দ্র কলিকাতায় আসেন এবং আমার সঙ্গে দেখা হইলে তাঁহার ক্ষতটি দেখিতে চাহিলে অতি অনিচ্ছায় সেই স্থল আমায় দেখান। পরে, ইনি একদল ছেলে লইয়া মেদিনীপুরে যান এবং তথায় 'স্বদেশী' কর্ম্মের শত্রুদের উত্তম মধ্যম প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন এবং এক খয়ের খাঁকে সেই "দাওয়াই" দিয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা ২৫ ফুটনোট ২—যুগান্তর পত্রিকা বিষয়ে অনেক আজগুবি গল্প বাজারে আজ প্রচারিত হইয়াছে। যখন কানাইলাল ধর লেনস্থ পার্টি অফিসের তেতলায় উক্ত নেতারা এবং অন্যান্য

কর্ম্মীরা "যুগান্তর" কাগজ পরিচালনার জন্য শেষ সিদ্ধান্ত করিতে ছিলেন, সেই সময়ে এই কাগজের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ব্যাপারটা সকলে এড়াইয়া যান। আমি তখন নেতাদের জিজ্ঞাসা করি, "এই কাগজের দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবেন"? ইহাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় উত্তর করিলেন, "Ask yourself before you ask others" (অন্যকে প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করুন)। আমি ইহার প্রত্যুত্তরে বলি—'আমি নিজে এই দায়িত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ রাজী"। কিন্তু তৎকালে আর কেহই এই বিষয়ে সাড়া দেন নাই।

কিন্তু আজ এই পত্রিকার জন্ম ও পরিচালনা বিষয়ে বাজারে নানা অদ্ভুত ও মিথ্যা কথার প্রচার হইতেছে। আমাকে কটাক্ষ করিয়া বিশিষ্ট স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কেহ কেহ নানা কথা লিখিয়াছেন। যেন, আজকালকার সাধারণে গুপ্ত-সমিতির সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছেন। একদল তরুণ "যুগান্তর"কে অতীন্দ্রিয় স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে ইহা একটা Mystic পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। না জানি, ইহাতে কি অদ্ভুত লেখা হইত। হায়রে! এই তরুণেরা যদি যুগান্তরের প্রতি তখনকার ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ ও নাকশিটকানীর কথা জানিতেন। এই পত্রিকা সাপ্তাহিক ছিল, ১০০০ কপি ছাপা হইত। ইহার মধ্যে ১৮ খানা কপি কলিকাতায় বিক্রয় হইত! তাহাও আমরা দোকানে গিয়া গছাইয়া আসিতাম বিক্রয়ের হকার প্রাপ্ত হওয়া যাইত না, যেহেতু ইহা কেহ ক্রয় করে না। অবশেষে, 'সন্ধ্যা" পত্রিকার মুসলমান হকার-সর্দ্দার এই পত্র বিক্রয়ের ভারগ্রহণ করেন। উপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে যাইয়া অনুরোধ করায় তিনি হকারের সহিত আমার আলাপ করাইয়া দেন। কিন্তু শুনিয়াছি এই লইয়া উপাধ্যায় আমাদের প্রতি কটাক্ষও করিয়াছিলেন। তখন "সন্ধ্যা' ও সুবোধ মল্লিক এবং অরবিন্দ

পরিচালিত ইংরেজা দৈনিক পত্রিকা বন্দেমাতরম্-এর মধ্যে দলাদলি চলিতেছে। আর্থিক কারণে উভয় দলের মনান্তর হয়। কিন্তু আমি ইহার বাহিরে ছিলাম। পরে, উপাধ্যায় কোন কারণে রাজসাহী গমন করাতে আমাকে তাঁহার অবর্ত্তমানে উক্ত পত্রিকার সম্পাদনায় দায়িত্ব দিয়া যান। ইহাতে লেখক সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি ও অনেকে আমায় অনুযোগ করেন। এমন কি, সুবোধ মল্লিক আমায় বলেন, "মহাশয় ওই স্থানে যাইবেন না।" াকন্তু ইহাদের অর্থনীতিক ও ব্যক্তিগত দলাদলি কেন আমাদের স্পর্শ করিবে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। সমিতির অনেক বিশিষ্ট সভ্য উপাধ্যায়ের গুণগ্রাহী ছিলেন।

পৃষ্ঠা ২৬ ফুটনোট ১—পুনঃ, আজগুবী গল্প বিষয়ের একটি নমুনা দিতেছি। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে উত্তর-কলিকাতার কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে একজন ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন: "ভূপেন বাবু! আপনি আমায় চিনেন না আমি আপনাকে চিনি। আমি ও হরিশ যুগান্তর পত্র বাহির করিয়াছিলাম"। হরিশ তখন দলের একটি অতি তরুণ সভ্য ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স অনধিক বিশ বৎসর হইবে। তিনি ফাই ফায়মাজ খাটিতেন। আমার মকদ্দমার সময়ে পুলিশ তাঁহাকে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছিল কিন্তু তিনি সেসব প্রত্যাখ্যান করেন। পরে একটা মকদ্দমায় তাঁহার তিন বৎসর জেল হইয়াছিল। তিনি এখনও জীবিত আছেন।

"যুগান্তরের" ভাষা সম্বন্ধে অন্নদা কবিরাজের নিকট শুনিয়াছিলাম, দিনাজপুরের Senior pleader মহাশয় কটাক্ষ করিয়াছিলেন: "এই পত্রিকার ভাষা দেখিয়া অনুমান হয় যেন লেখকেরা সবে ইংরেজী পড়া ছাড়িয়া বাঙ্গলা লিখিতে শিক্ষা করিতেছে!" এতৎ ব্যতীত, অন্যান্যেরাও

ভাষার অশুদ্ধতা লইয়া ব্যঙ্গ করিতেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ "হিতবাদী" "বঙ্গবাসী" প্রভৃতি কাগজগুলার বিনিময়ে আমাদের পত্রিক প্রেরণ করিত না। এই বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যরূপ তরঙ্গ-প্রবাহের সময় আমি একবার পার্টির পুরাতন সভ্য অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ইনি 'আত্মোন্নতি সমিতির' সভ্য ছিলেন, এই হেতু পার্টির সভ্য। ইহার বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান সহরে) কাছে তাঁহার চাকরীস্থল "বঙ্গবাসী" অফিসে যাই এবং পত্রিকা সম্বন্ধে বাক্যালাপ করি। এমন সময়ে বঙ্গবাসীর সম্পাদক মণ্ডলীর বৃদ্ধ দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তথায় উপস্থিত হন। অশেষ বাবু মুরুব্বীয়ানা চালে লাহিড়ীকে বলিলেন: "ইহারা এই কাগজ বাহির করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের পশ্চাতে সখারাম দেউস্কর ব্যতীত আর কোন লেখক নাই। ইহাদের আপনি সাহায্য করুন"। তিনি পত্রিকার কত কপি বিক্রয় হইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহাকে বলাতে তিনি ঘৃণার সুরে বলিলেন: '১০ ০ কপি বিক্রয় না হইলে তাহা আবার কাগজ কি?"

অশেষ বাবুর মুরুব্বীয়ানার অর্থ বুঝিলাম না। বোধহয় যুগান্তরের পরিচালকদের বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প। এইজন্য দলের লোক হইয়াও এই তাচ্ছিল্য।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আমি মৈমনসিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বারীন্দ্রের কাছ হইতে শুনিলাম (অফিস তখন কলেজ ষ্ট্রীটে) দুর্গাদাস লাহিড়ী ও আর একজন ভদ্রলোক অফিসে আসিয়া একটা ছবির-ব্লক চাহিতে আসিয়াছিলেন এবং বঙ্গবাসী পত্র বিনিময়ে প্রেরণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। জামালপুরের ভাঙ্গা দুর্গাপ্রতিমার ফটো যুগান্তরে বাহির হইয়াছিল। তাহার ব্লক লইতেই ইহারা আসিয়াছিলেন। বারীন হাসিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

ইহার পর আমার জেল যাইবার পূর্ব্বে "সন্ধ্যা" অফিসে লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিলেন, "পত্রিকার Circulation কত?" আমি জবাব দিই, ৭০০০ কপি। তাহাতে তিনি বলিলেন: "আর কেন? কাজতো হাসিল হইয়াছে। এখন গরম গরম লেখা বন্ধ কর। আমরা কি জেল যাইতে জানি না? কিসের জন্তে জেলে যাইবে"? লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বদেশী বক্তাদের এই মনস্তত্ত্ব!

আমার মকদ্দমার সময় প্রমথনাথ মিত্রের কাছে একবার যাইলে তিনি বলিলেন: "তুমি অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায় আর অরবিন্দের সঙ্গে আমার কাছে আস, তাই কিছু বলিতে পারি না। তোমরা এমন গরম গরম লেখ কেন? দেশ কি তৈয়ার হইয়াছে?" বৈপ্লবিক দলের নেতার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইল!

পৃ: ২৬ ফু: নো: ২—প্রেসের নাম ছিল 'সাধনা প্রেস"। অবিনাশ ভট্টাচার্য্য কোষাধ্যক্ষ এবং প্রেস-সংক্রান্ত ব্যাপার তাঁহার কর্ম্মের অন্তর্গত ছিল। প্রেস বিষয়ে তাঁহার বিবৃতি পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য।

পৃ: ২৭ ফু: নো: ১—ইন্দ্রনাথ নন্দী ও আমি। নন্দী I.M.S. Surgeon Lieutenant Colonal S. Nandy-র জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি জামালপুর হাঙ্গামায় ধৃত হন। পরে, ইনি ঘরে বোমা পরীক্ষা করিতে গিয়া বাম হস্তে আঘাত পান এবং তাহা কর্ত্তিত হয়। তাঁহাকে আলিপুর মকদ্দমায় বিজড়িত করা হইয়াছিল কিন্তু প্রমাণাভাবে তিনি খালাস পান। ইনি এখনও জীবিত আছেন।

পৃ: ২৭ ফু: নো: ২—প্রবাদানুসারে ইনিই বঙ্কিম বাবুর নভেলের দেবীচৌধুরাণীর বংশধর।

পরে শুনিয়াছিলাম রাজসাহীর অধিকারী মহাশয় (ইনি কলিকাতায় উকিল এবং Honarary Magistrate ছিলেন। ইহার বন্দুক লইয়া আমরা ধাপায় ছুঁড়িবার অভ্যাস কখন কখন করিতাম) এই জমিদারকে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। অধিকারী মহাশয় স্বয়ং আমাকে এই কথা বলেন। তিনি বলেন, ' ইহাদের কাছ হইতে এত অল্প টাকা লইব কেন" ?

পৃঃ ২৮ ফুঃ নোঃ ১—বার্লিনে ৺অধ্যাপক বরকাতুল্লা সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন যে আমেরিকার কালিফোর্নিয়া অঞ্চলের, ভারতীয় শ্রমিকদের মনস্তত্ত্ব এত স্বদেশী ও অসাম্প্রদায়িক ছিল যে, মুসলমান শ্রমিকদের জন্য একটি মসজিদ প্রস্তুতের জন্য তিনি একবার শিখদের কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। ইহাতে একজন বৃদ্ধ শিখ শ্রমিক তাঁহার যাহা ব্যাঙ্কে জমা ছিল (৯০০ ডলার) তাহা তৎক্ষণাৎ দান করেন। আজকালকার কালে এই কথা কেমন লাগিবে !

পৃঃ ২৯ ফুঃ নোঃ ১—বর্ত্তমানের ভারতীয় "গণ-পরিষদ" এই প্রকারের একটা শাসনপ্রণালীর খসড়া করিতেছে।

পৃঃ ৩১ ফুঃ নোঃ ১—নদীয়া জেলার গোঁসাই-দুর্গাপুর গ্রাম। এই গ্রামের স্থানীয় জমিদারবংশীয় একটী তরুণ আর অন্যান্য যুবকেরা একটি সমিতি করিয়া কর্ম্ম করিতেছিলেন। সমিতিতে একটি স্বদেশী কাপড় বিক্রয় ভাণ্ডার, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ, লাঠি খেলার আখড়া প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। আমি তথায় গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে গ্রামাঞ্চল সমূহে প্রচারকর্ম্মে বাহির হইতাম।

পৃঃ ৩১ ফুঃ নোঃ ২—সেইযুগেগভর্ণমেণ্টের সহিত জমিদারদের "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" ব্যাপারটি জাতীয়তাবাদ দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছিল কিন্তু আজ ?

পৃঃ ৩২ ফুঃ নোঃ ১—আজ এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের ফলে দেশে গণ-চেতনা জাগ্রত হইতেছে।

পৃঃ ৩৩ ফুঃ নোঃ ১—"সোনার বাঙ্গলা" নামক প্রথম ম্যানিফেষ্টো দেশে একটা চাঞ্চল্য আনিয়াছিল। "বঙ্গ-ভঙ্গ" প্রতিবাদে কলিকাতায় যে সর্ব্বপ্রথম প্রতিবাদ-সভা টাউন হলে আহূত হইয়াছিল, তথায় এই পত্র বিস্তৃতভাবে বিতরিত হয়। এতদ্বারা সকলকার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় যে, দেশে একদল আছেন, যাঁহারা "আবেদন ও নিবেদনের থালা" বহিতে প্রস্তুত নহেন। ফুলারের উদ্দেশ্যে বোমাফেলা সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া বারীন্দ্র ও আমি যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিমুল-তলার গ্রীষ্মাবাসে গিয়াছিলাম, তখন তিনি এই "সোনার বাঙ্গলা" Pamphlet-এর কথা বলেন। তিনি বলিলেন, "ইহা Distributed in hundreds and thousands' জানিনা কে ভীড়ে আমার পকেটে ইহা পুরিয়া দিয়াছিল। যখন অম্বিকা মজুমদার ফরিদপুরের নেতা) বলিলেন, দেখুন মহাশয়, কে আমার পকেটে এই কাগজে পুরিয়া দিয়াছে, তখন আমি বলি, "রাখুন মহাশয় রাখুন, আমারও পকেটে দিয়াছে"।

সুরেন্দ্র বাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বারীন্দ্র আমাকে বলিলেন: "তোমার অবর্ত্তমানে (আমি তখন হাত পা ধুইতে গিয়াছিলাম) সুরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন দেশে গুপ্ত-সমিতি আছে কিনা; এই সব বিষয়ে ইনি এত অজ্ঞ আছেন।" আমাদের তৎকালীন নেতারা দেশাভ্যন্তরীণ কর্ম্ম হইতে এত বিচ্ছিন্ন ছিলেন! অথচ ইহার পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথ সেনের কাছ হইতে শুনিয়াছিলাম তিনি যখন হইতে প্রেরিত হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়কে বৈপ্লবিক কর্ম্ম বিষয়ে কিছু বলিলেন, তখন তিনি বলেন, আমরা এখন বড় হইয়া গিয়াছি। আমরা অরবিন্দ বাবুকে দূরে রাখিয়া কার্য্য করিব।

পৃঃ ৩৩ ফুঃ নোঃ ২—ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা বিপিন চন্দ্র পাল দিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধ একত্রিত করিয়া "Indian Nationalism" নামক একটি পুস্তিকা দ্রষ্টব্য। একটি ইংরেজ মহিলাও এই বিষয়ে একটা পুস্তক লিখিয়াছেন। পুনঃ ডঃ আনন্দ স্বামীও 'Significance of Indian Nationalism' নামে এক পুস্তক লিখিয়াছেন।

পৃঃ ৩৩ ফুঃ নোঃ ৩—আথানেসিয়াস অপূর্ব্বকুমার ঘোষ গণিত-শাস্ত্রবিদ্ ৺পি. ঘোষের পুত্র ছিলেন। ইনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং প্রমথ মিত্রের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ইনি আমাদের সঙ্গে মিশিতেন। যখন স্বদেশ আন্দোলনের সময়ে গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং বিভাগের ধর্ম্মঘট হয়, তখন বিপিনচন্দ্র পাল ও ইনি তাহা পরিচালনা করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে E. I R. ষ্ট্রাইক হইলে ধর্ম্মঘটীদের প্রথম সভা "সন্ধ্যা" অফিসের ছাদে (কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) আহূত হয়, তিনি তাহার সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় সন্ধ্যাপত্রের পক্ষ হইতে আমি রিপোর্টারের কর্ম্ম করি অর্থাৎ তৎপর দিনে পত্রিকাতে প্রকাশ করিবার জন্য সভার বক্তৃতাদি বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ করার ভার আমার হস্তে ন্যস্ত ছিল।

ব্যারিষ্টার ঘোষ ঘোর সোসালিষ্ট ছিলেন। অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি লণ্ডনে সোসালিসম্ বিষয়ে lectured from a hundred Platform (একশত স্থানে তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন)। সোসালিসম্ এবং ভারতের রাজনীতিতে তাহা কি প্রকারে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা তিনি আমায় ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন। তিনি ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না; Passive Resistance প্রভৃতি দ্বারা দেশের লোকের সাহস ও

সংহতি শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিতেন। তিনি আমাকে বলেন, "গভর্ণমেণ্টের আইন ভঙ্গ করিয়া লোকসব ময়দানে সমবেত হউক, পুলিশ গুলি ছোড়ে ছুঁড়ুক। আমিও সেই ভীড়ে যোগদান করিব ইত্যাদি।" তিনি যাহা বলিতেন, অসহযোগ আন্দোলন সময় হইতে তাহা দেশে সমূর্ত্ত হইতে থাকে।

তিনি সোসালিষ্ট হইয়াও বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীয় কর্ম্মের সহিত যোগদান করিতেন। এইজন্য, শিবাজী উৎসব উপলক্ষে তিলককে যে সম্বর্দ্ধনা করা হয় তজ্জন্য সখারাম বাবু ও আমি তাঁহাকে আমন্ত্রিত করিতে যাইলে তিনি বলিলেন, "আমি হিন্দু নহি, আমি খৃষ্টান, কিন্তু আমাদের দেশের লোক এত Fanatic (ধর্ম্মান্ধ) যে তাহাদের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জাগ্রত করিবার চেষ্টাতে আমার আপত্তি নাই।"

তৎকালীন যে সব ধর্ম্মঘট হইত তাহা তিনি পরিচালনা করিতেন। আমার মকদ্দমার দ্বিতীয় দিনে তিনি কোর্টে আমার হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

পৃঃ ৩৪ ফুঃ নোঃ ১—১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তুর্কি গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মানীর সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া মিত্রশক্তির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে সুলতান তাহার উদ্যমকে সহায়তা করার জন্য ইসলামের খলিফারূপে, "জেহাদ" (ধর্ম্মযুদ্ধ) ঘোষণা করিয়া সমগ্র মুসলমান জগতকে ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। এই সময়ে ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি ও জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট সম্মিলিত একটী ডেপুটেশান আফগানিস্থানের আমীরের কাছে প্রেরণ করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, আমীর যেন জার্ম্মানপক্ষে যোগদান করিয়া ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধে ব্যাপৃত হন।

এই ডেপুটেশনটির শীর্ষে ছিলেন হাতরাসের কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপ। ইহার সঙ্গে ছিলেন পুরাতন বৈপ্লবিক মৌলুবী বরকাতুল্লা। কনস্টান্টি-নোপলে তুর্কির সেখ উল ইসলাম ডেপুটেশনের সাহায্যকল্পে "আয়া সোফিয়া" মসজিদে একটি 'ফতোয়া' (ঘোষণা) দেন। ইহাতে তিনি জেহাদের আহ্বানে ভারতীয় মুসলমানদের সাড়া দিবার জন্য এবং ভারতীয় হিন্দুদের সহিত সহযোগিতা করিয়া ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য ধর্ম্মের অনুশাসন প্রদান করিয়া তাহা মৌলুবী বরকাতুল্লার হস্তে প্রদান করেন। এই সংবাদ অন্ততঃ জার্ম্মানী হইতে প্রকাশিত আমেরিকান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিষয়টি দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৩৯—ফুঃ নোঃ ১—ক্রপটকিন, নিবেদিতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের অন্যান্য বন্ধুরা একবার নরওয়ে দেশে গ্রীষ্মভ্রমণ কালে গিয়াছিলেন। তথায় এই কথোপকথন হয়। নিবেদিতাকে ক্রপটকিন তাঁহার যত শিষ্য ও শিষ্যা শহীদ হইয়াছেন তাঁহাদের ফটো চিত্র এক এক করিয়া দেখাইতেছিলেন এবং প্রত্যেকে কি প্রকারে শহীদ হইয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতেছিলেন। এই শহীদেরা সকলেই তরুণ বয়স্কের ছিলেন। ইহারা আনার্কিষ্ট দলভুক্ত ছিলেন। আমার জেল যাইবার পূর্ব্বে নিবেদিতা আমাকে এই গল্প বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের অনেক ইংরেজ ও আমেরিকান শিষ্য এই রুষ আনার্কিষ্ট নেতার বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিস একজিবিসনে স্বামীজির সহিত ক্রপটকিনের আলাপ করাইয়া দেন।

পৃঃ ৪০ ফুঃ নোঃ ১—এই বিষয়ে অন্যত্র প্রদত্ত সংবাদ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৪০ ফুঃ নোঃ ২—দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমগ্র বাঙ্গলা ভ্রমণ করিয়া এই উপলব্ধি করিলাম, স্বদেশীযুগে ধনীদের স্বাধীনতাস্পৃহা বলিয়া

যাহা প্রতীত হইয়াছিল তাহা মরুভূমির মরীচিকামাত্র। ইতিহাসের দ্বন্দ্বভাবজনিত বস্তুতন্ত্রবাদ বলে, ইহার পশ্চাতে ছিল—শ্রেণীস্বার্থ। বঙ্গভঙ্গ হওয়ায় জমিদারদের ভয় হইয়াছিল। চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা (Permanent Settlement in land) গভর্ণমেণ্ট রদ করিয়া দিবে, ইত্যাদি। এইজন্যই "ইংরেজকে ঠেঙ্গাও" বলিয়া রব উঠিয়াছিল। এই স্বার্থই ধনীদের বিদিত এবং অবিদিত মনে কার্য্য করিতেছিল। ইহার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া প্রথমে মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বৈপ্লবিক সমিতির নেতাকে বলিয়াছিলেন, "১০০০ টাকা দিব বোমা প্রস্তুত কর"।

পৃঃ ৪১—ফুঃ নোঃ ১—বাণ্ডিয়েরা ভ্রাতাদ্বয় অষ্ট্রিয়ার নৌ-সেনার একজন ইতালীয় অ্যাডমিরালের দুই পুত্র ছিলেন। কিন্তু এই বিদেশী রাজার ভক্তের পুত্রেরা ম্যাটসিনির শিষ্য ছিলেন এবং ইটালীর স্বাধীনতাকল্পে সন্ত্রাসবাদীয় কর্ম্ম করেন। এই কাজে ধৃত হওয়ায় অষ্ট্রিয় গুলিতে তাঁহাদের হত্যা করা হয়। বিশবৎসর বয়সের কম এই দুই তরুণের মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রদত্ত স্বীয় কর্ম্মের পক্ষে দৃপ্ত বক্তৃতা বৈপ্লবিক জগতে অতি মহান রাজনীতিক সাহিত্য।

পৃঃ ৪২—ফুঃ নোঃ ১—এই বিষয়ের আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৪৪—ফুঃ নোঃ ১—"আত্মোন্নতি সমিতি" পূর্ব্ব হইতে মধ্য-কলিকাতার জনকতক ছাত্র লইয়া গঠিত হয়। নিবারণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ইহার অগ্রণী সংস্থাপক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ঘোষ নামে একজন আমাকে বলিয়াছিলেন, "প্রথমে তাঁহারা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকট যাতায়াত করিতেন। 'বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতি' স্থাপিত হওয়াতে এই ক্লাবটি বৈপ্লবিক সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই সমিতির কথা একবার শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমার কাছে উল্লেখ করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুকিয়া ষ্ট্রীটে তাঁহার সঙ্গে আমার অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিলেন, এখন আমার সময় নাই। দুই এক কথার পর তিনি আমাকে বলেন, তুমি এখন কি করিতেছ তাহা বল। আমি আমার কর্ম্মের কথা তাঁহাকে বলি। তিনি বলিলেন, এক দল ছেলে আমার কাছে আসিত। তাহারা এতৎকল্পে ব্যায়ামাদি করিত। তাহাদের সংবাদ কি? আমি বলিলাম যে তাঁহারা কর্ম্ম করিতেছেন। তৎপর তিনি বলিলেন, "আমি ভাবিতেছি, তোমরা কি ইংরেজ তাড়াইয়া দেশ শাসন করিতে পারিবে?" ইহাতে আমি প্রত্যুত্তর করি, "মহাশয়, আগে ইংরেজকে দেশ হইতে বিদায় দিই, তৎপর ওই চিন্তা করা যাইবে।"

প্রথম যুগে ইন্দ্রনাথ নন্দী আত্মোন্নতি সমিতির বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। পরে প্রভাসচন্দ্র দে নায়ক হন। যুদ্ধের সময় ইনি কুচবিহার কলেজে অধ্যাপনা করিতেন, কিন্তু "অন্তরীণ" হন। পরে অবিনাশ বাবুর সহিত "মহাজন ব্যাঙ্ক" স্থাপন করেন। এক্ষণে রিপন কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন। এই ক্লাবের একটী B. Sc পাশ যুবকই বাঙ্গালায় আমাদের অনুরোধে ভারতে প্রথম 'বোমা" তৈয়ার করেন।

পৃঃ ৪৪ ফুঃ নোঃ ২—ইহার নাম বিভুতি চক্রবর্ত্তী এবং নদীয়া জেলায় বাস। ইনি নিবারণ ভট্টাচার্য্যের কাছে বিস্ফোরণ রসায়ণ শিক্ষা করিতেন। নিবারণ বাবু ইহা লেখককে বলেন। 'যুগান্তর' অফিসে তাঁহাকে বারীন্দ্র ও আমি একদিন বলি—বোমা প্রস্তুত করিবার জন্ম টাকা মজুত আছে কিন্তু প্রস্তুতকারকের অভাবে তাহা সফল হইতেছে না। এই কথাটা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছিল, কারণ তিনি ছিলেন একজন কেমিষ্ট। পরদিন তিনি বারীন্দ্রকে আসিয়া বলেন, "আমি বোমা প্রস্তুত করিতে রাজী আছি, কিন্তু ভূপেন প্রভৃতি কেহই যেন ইহা

জানিতে না পারে।" খরচার জন্য প্রথমে ভবানীপুরের যোগেশ চন্দ্র ঘোষ ১০০ টাকা দান করেন। বারীন্দ্র যখন তাঁহাকে একদিন বলেন, 'টাকার অভাবে বোমা প্রস্তুত হইতেছে না, তখন তিনি বলেন 'আমার একশত টাকা হাতে আছে, অনুগ্রহ করিয়া নিবেন কি?" এই কথা এই স্থলে উল্লেখ করা হইল, কারণ কর্ম্মীদের মন তৎকালে কর্ম্মে কি প্রকারের আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল তাহা এই সব দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

বোমাটি দক্ষিণ-কলিকাতায় যোগেশ বাবুর ভ্রাতার ডাক্তারখানায় প্রস্তুত হয় এবং আবরণটি যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য একজন সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির ঝামাপুকুরের কলাইয়ের কারখানায় তৈয়ার হয়। অনেকগুলি আবরণ (shell) প্রস্তুত হইয়াছিল। আজকালকার মাপকাঠিতে এই "বোমা" অস্ত্রটি অতিই হাস্যাস্পদ, কিন্তু আমরা "আনাড়ী" বলিয়া বোমার উপর অনেক বেশী ভরসা রাখিতাম এবং এই বিষয়ে অদ্ভুত ধারণাও ছিল। আজ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ। বলি! হায়রে, সেদিন এই বিষয়ে একটা মজার গল্প আমার একজন পরিচিত ব্যক্তি, যিনি পুলিশ ডিটেকটিভ বিভাগে সম্প্রতি চাকরী লইয়াছেন, তাঁহার নিকট শ্রুত হই। তিনি বলিয়াছিলেন, ডিটেকটিভ বিভাগের ভূতপূর্ব্ব বড়কর্ত্তা বলিয়াছিলেন: পূর্ব্বে আমরা নিজেদের স্বার্থে ছেলেদের বোমার মকদ্দমা করিয়া জেলে দিতাম, কিন্তু আজ কি হইতেছে?

এই বোমা লইয়াই বারীন্দ্র, পরে হেমচন্দ্র দাস কুলারের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। বোমা-নির্ম্মাণের বাকী আবরণগুলি যুগান্তর অফিসে কিছুদিন থাকে। অবশেষে আমি স্বগৃহে আনি। আমার জেল হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে নদীয়াবাসী এক সভ্য দ্বারা তাহা স্থানান্তরিত করি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন এক পুকুরে এইগুলি ডুবাইয়া রাখিবেন।

এক্ষণে, আসল বোমাটি কোথায় গেল ? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে হেম-দাস ও প্রফুল্ল আমার বাড়ী আসিয়া বলিয়া গেলেন, "দাদা পালিয়েছে" (অর্থাৎ ফুলারের নাগাল পাওয়া গেল না)। বোমাটি তাঁহারা সঙ্গে করিয়াই কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। আমার ধারণা ছিল, উক্ত দ্রব্যটিও নদীয়া জেলায় আমি পাঠাইয়া দিই কিন্তু হেমবাবু বলিতেছেন, উক্ত বোমা মেদিনীপুরে নীত হয় এবং পরে তথাকার একটি পুকুরে নিমজ্জিত করা হয়।

ইহাই হইতেছে বাঙ্গলার বোমা আবির্ভাবের আসল সত্য তথ্য। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, শ্রুত আছি চক্রবর্ত্তী স্বগ্রামে এখন বাস করিতেছেন। যোগেশবাবু, যিনি প্রথমে কটক কেন্দ্রের নায়ক ছিলেন. পরে কলিকাতায় স্বগৃহে বাস করেন, তাঁহারও সন্তান নাই ; অনুমান হয় তিনিও দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে হেমবাবু প্যারিসে গিয়া তথাকার ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সাহায্যে বোমা নির্ম্মাণ করা শিক্ষা করেন। এই বিষয়ে ৺ বর্ম্মা নামক একজন পঞ্জাববাসী ও ব্যারিষ্টার রাণা তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করেন। (১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আমার প্যারিস পর্য্যটন কালে বর্ম্মা বলিয়াছিলেন, হেমদাসকে বলিও, সে আমায় পত্র লিখে না কেন ?) হেমবাবু প্যারিস হইতে আমার সহিত পত্র বিনিময় করিতেন। তথাকার পরিস্থিতি বিষয়ে তিনি বলেন : এখানকার ভারতীয় কারবারীরা "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার সাহায্যকল্পে একটা মোটা টাকা পাঠাইবার সংকল্প করিয়াছিল, কিন্তু বিপিনচন্দ্র পালের সহিত ঝগড়া হওয়ায় তাহা স্থগিত হয়। এই কথা সুবোধ বাবুকে আমি জানাই। পুনঃ, জেনেভায় একজন মহারাষ্ট্রীয় যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নাম খাঁসী রাও। সে বলে, গোপনে রিভলভার প্রস্তুত করিতে সে শিখিতেছিল, কিন্তু এই ভারতীয়েরা হৈ-চৈ করাতে তিনি কর্মস্থল হইতে বিতাড়িত হন। তৎপর তিনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার কংগ্রেস দ্বারা প্রদত্ত ত্রিবর্ণলাঞ্ছিত জাতীয় পতাকার একটি ক্ষুদ্র নমুনা সঙ্গে লইয়া যান।

শ্রীমতী কামা তাহার উপর মুসলমানের "অর্দ্ধচন্দ্র" ও পার্শির "সূর্য্য" সংযোজিত করেন। ইহার উপর, 'বন্দেমাতরম্' শব্দটিও পতাকায় লিখিত হয়। 'তলোয়ার' নামক সংবাদপত্রে এই পতাকার ফটো থাকিত। এই পতাকা শ্রীমতী কামা সর্ব্ব সভাতে বক্তৃতাকালে উড্ডীন করিতেন। ১৯০৭ খৃঃ ষ্টুটগার্ট সহরে আহূত সোসালিষ্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতকালে কামা এই পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে সোসালিষ্ট নেতা কার্ল কাউস্কী আমায় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন "আমার মনে আছে, একজন ভারতীয় মহিলা একটা পতাকা উড়াইয়াছিলেন।" ['জাতীয় পতাকার' ইতিহাস পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]

পৃঃ ৪৪—ফুঃ নোঃ—২ ভগ্নী নিবেদিতা (Miss Margaret Noble) ও অধ্যাপক কাকাসু ওকাকুরা "*Ideals of the East*", "*Awakenning of Japan*" প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা।

পৃঃ ৪৪—ফুঃ নোঃ—৩ঃ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমাকে বলেন, অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' স্কীম নামক পুস্তিকার শেষে এই মন্ত্রের সারাংশ সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। পুলিশের কাছে এই কাগজ থাকা সম্ভব।

পৃঃ ৪৭—ফুঃ নোঃ—১ঃ দেশের রাজনৈতিক চেতনা যখন অগ্রসর হইতেছিল এবং Indian Association সভা গঠিত হয় সেই সময়ে ৺ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারত উদ্ধার" নামক ব্যঙ্গ কাব্য সেই অগ্রগামী গতিতে ভাঁটা আনয়ন করিয়াছিল। বিপিন চন্দ্র পাল বক্তৃতাতে প্রায়ই বলিতেন, কি কুক্ষণে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। এই কাব্যে উকীলদের সভা করিয়া দেশের মুক্তি আনয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছিল।

পৃঃ ৫০ ফুঃ নোঃ—১ বৈপ্লবিকদলের কতিপয় যুবক দ্বারা "ছাত্র ভাণ্ডার" নামক স্বদেশী দোকান অনুমান ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। দোকানটি প্রথমে কলেজ রো'তে মেডিকেল কলেজের ধারে অবস্থিত ছিল। পরে হ্যারিসন রোডে দোকান উঠাইয়া লওয়া হয়। এই দোকানটি বহুবাজারস্থিত "ইণ্ডিয়ান ষ্টোরের" পর দ্বিতীয় স্বদেশী কাপড়ের দোকান ছিল। দলের ছেলেদের টাকাতেই এই দোকান স্থাপিত হয়। অনেকে মফঃস্বলে প্রচার করিবার সময় এই দোকান হইতে কাপড়াদি লইয়া বিক্রয় করিয়া আসিতেন। স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের ছলে লোকের সঙ্গে স্বদেশী রাজনীতির কথা কহিবার সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া যাইত। লেখক এই প্রকারেই নাড়াজোলের জমিদারের সঙ্গে আলাপ করিয়া আসেন।

এই দোকান স্থাপন করিবার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গুটিকতক কর্ম্মীকে গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়া এবং কর্ম্মক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য করা। এই দোকানের প্রথম হইতে নিখিল মৌলিক এবং পবিত্র দত্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। আলিপুর মকদ্দমার পর পুলিশ দোকানটি লুট করিয়া জিনিষপত্র সব নিলাম করিয়া তাহা ধ্বংস করিয়া দেয়।

পৃঃ ৫১ ফুঃ নোঃ—১ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি যখন মোজাফর-পুরে গিয়াছিলেন তখন ইনিই তাহাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি একবার আমাকে বলেন তাঁহারা ছাত্রাবস্থায় ঘোর "ভারতোদ্ধারী" ছিলেন। ইহার নাম গোবিন্দবাবু। আমার পরলোকগত মোজাফরপুর নিবাসী বন্ধু সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ ইহার এবং বাসন্তীবাবু নামক দুইজন বঙ্গভাষী উকিলের কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। ওয়াহেদ তাঁহাদেরই খাতিরে স্বীয় ভগ্নিগৃহে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামকে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন বলিয়া আমাকে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে বলিয়াছিলেন

ওয়াহেদ প্রথমে মৌলানা সওকেত আলীর "মকামে কাবা" নামক প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন। পরে যুদ্ধের সময়ে "হজ" করিবার ছলে দেশত্যাগ করেন এবং তুর্কিতে যান। তথায় Committee of Union and Progress নামক তুর্কীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান হইতে মাসহারা পান। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কন্সটাণ্টিনোপলে অহার সহিত আমার দেখা হয়। পরে, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরিচয় হইলে বার্লিন কমিটির সহিত তিনি একযোগে কার্য্য করেন। যুদ্ধের পরে, আগা খানের সাহায্যে ইংরেজী পাশ-পোর্ট প্রাপ্ত হইয়া ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি ভারতে আসেন। এই সময়ে তিনি মুসোলিনির ভ্রাতার সহিত একযোগে Indo-Italian Syndicate নামক একটি ব্যবসায়ী সংঘ স্থাপন করেন। বেনিটো মুসোলিনি তখন ইতালীয় সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগে এই সংঘ স্থাপিত হয়। মুসোলিনি ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তিনি 'that Ancient Country" (সেই প্রাচীন দেশের) সঙ্গে ব্যবসায়, কৃষ্টি প্রভৃতির সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যগ্র ছিলেন। ওয়াহেদ এই কথাও আমাকে বলেন, "আমাকে রোমে লইয়া যাইবার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তথায় Friends of Indian Freedom নামক একটি সমিতি স্থাপন করা কিন্তু ইহা ঘটিয়া উঠে নাই। আমি রোমে গিয়া বসবাস করিতে স্বীকৃত হই নাই।"

কিন্তু এই ব্যবসায়ের উদ্যম সফল হয় নাই। ইতালীয়েরা বলেন, ভারতীয়েরা মূলধন লইয়া আসুক, অথচ নিজেরা কোন অর্থ বাহির করিবে না। শ্রীযুক্ত সোরেব খোরেশী (ইনি বর্ত্তমানে ভূপাল ষ্টেটে কর্ম করেন) এইকথা আমাকে গৌহাটি কংগ্রেসের অধিবেশন সময়ে জানাইয়াছিলেন।

ওয়াহেদ আমাদের সঙ্গে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মস্কোতে গিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ইউরোপে গত্তায়ু হইয়াছেন।

পৃষ্ঠা ৫২ ফুট নোট—১ : রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ" বক্তৃতা এবং Parallel government স্থাপন করিয়া দেশমুক্ত করার প্ল্যানের পর, অনুমান হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারীন্দ্র প্রভৃতি অন্তরঙ্গ কর্ম্মীদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে একটি পত্র লিখি যে, আমরা ভারতীয় সভার সহযোগে কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত নই। তাঁহার সহিত সংযুক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে চাই। ইহাতে তিনি তাঁহার দ্বারকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ বাসায় আমাকে আহ্বান করেন এবং বলেন, "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত এই বিষয়ে কথা কও" "bringing coal to Newcastle !" ন্যায়। ইহাতে সখারাম বাবু, দেবব্রত বাবু এবং আমি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বালিগঞ্জের বাডীতে যাই। তিনি বলিলেন, রবি বাবু আমায় জিজ্ঞাসা করেন, "ইহারা কাহারা ?" আমি সব কথা বলি। তিনি বলেন, তিনি বক্তৃতা ও সাহিত্য দ্বারা কার্য্য করিবেন। ইহাতে সখারাম বাবু ব্যঙ্গ করেন—"কবিতা লিখিয়া ভারতোদ্ধার হইবেনা"। পরে, এই সহযোগিতার তাগাদার জন্য ৺ব্যোমকেশ মুস্তফীর সহিত সাহিত্য-পরিষদ আফিসে (তৎকালে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল) আমি সাক্ষাৎ করি। তিনি "স্বদেশী সমাজ" পরিকল্পনা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বলিলেন, এই কর্ম্মপদ্ধতি এখনও সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয় নাই। লিখিত কর্ম্মপদ্ধতির পাণ্ডুলিপির মুদ্রিত প্রুফ তিনি তৎকালে দেখিতেছিলেন এবং বলিলেন, পরিকল্পনা পূর্ণভাবে তৈয়ারী হইলে পরীক্ষা (Experiment এর) জন্য একস্থলে তাহা বাস্তবিক কর্ম্মে পরিণত করার চেষ্টা হইবে।

এই পরিকল্পনা পড়িয়া বুঝিলাম, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হাঙ্গারীয় জাতীয়তাবাদী ডিক (Deak) হাঙ্গারিতে অষ্ট্রিয়ার ক্ষমতার বিলোপ সাধন কল্পে এইরূপ "স্বদেশীয়ানা" করিয়াছিলেন এবং কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডে সিন-ফিনেরা তাহা করিয়াছিল। তদনুরূপ ইহা "স্বদেশী" হইবার একটি কর্ম্মপদ্ধতি মাত্র। যাহাই হউক, পরে, এই দলের কোন এক মিটিং-এ রবি বাবু আমাদের ডাকিয়াছিলেন। আমি তখন "ভবানী মন্দির' পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে বিহারে প্রেরিত হইয়াছিলাম। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্নদা কবিরাজের কাছ হইতে ইহা শুনিলাম, তিনি এই আহ্বানে এই সভায় গমন করিয়াছিলেন। সভায় নানাদল নানাকথা বলে, রবি বাবু তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার কি মত"! কবিরাজ জবাব দেন, "আমরা তর্ক করিতে অক্ষম, কার্য্য দিন্, করিতে প্রস্তুত"। রবি বাবু বলিলেন, "তাহা আমি জানি।"

রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" প্রতিষ্ঠাকল্পের প্রচেষ্টার সহিত বৈপ্লবিক সমিতির সহযোগিতার উত্তম এই স্থলেই শেষ হয়।

এই সময়ে সাধারণ লোকে রবীন্দ্র বাবুর মণ্ডলী, কংগ্রেসের পরমদল—যাহা বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দের চারিধারে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং বৈপ্লবিক দল—এই সকলকে একদল বলিয়া মনে করিত। যাঁহারা বেশী সংবাদ রাখিতেন তাঁহারা আমাদের "পি. মিত্রের দল" বলিয়া জানিতেন। আমরা এই আবর্ত্তে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতাম। বিপিন পাল প্রভৃতি মনে করিতেন, এই ছোঁড়ারা হুজুগে, তাহাদের একটা খেয়াল হইয়াছে মাত্র। একবার তিনি ব্যঙ্গ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, "বর্ত্তমান রণনীতি" কাগজে লিখিয়া দেশে বিপ্লব আনিবে? বারীন্দ্র তখন রণনীতি সম্বন্ধে গোটা কতক

প্রবন্ধ যুগান্তরে প্রকাশ করিয়াছিলেন (ইহা পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়)। একদিন "সন্ধ্যা" আফিসে আমরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিলাম। তিনি ব'ললেন, ভারতে Bastaille পতনও হইবে না এবং কামান বন্দুক দাগিয়া বিপ্লবও হইবে না। তবে, দুই একটা ডাকাতি কি হইবে না? দুই একটা "বোমা" কি ফাটিবে না? তখন তিনি Bloodless Revolution বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন এবং Passive Resistance-ই তজ্জন্য পন্থা, তাহারই নির্দ্দেশ দিতেন। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে বরিশাল সম্মেলনে বিপিন বাবু বলিয়াছিলেন, গান্ধী-প্রবর্ত্তিত পন্থাসমূহ বাঙলায় নূতন নয় এবং তাহা পূর্ব্বে বাস্তব ভাবে প্রয়োগ করাও হইয়াছে,এই কথা ধ্রুবসত্য ; অসহযোগ আন্দোলনে কেবল কাশী "চরখা" এবং রুসীয় টলষ্টয়ের মত এই সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আর গান্ধীবাদ সংশ্লিষ্ট "কুটির-শিল্পবাদ" তাহাও আমাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। 'যুগান্তর' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় ভারতে পুঁজিতন্ত্রের (Capitalism) বিপক্ষে হেনরী জর্জ্জের Cottage Industry (কুটির শিল্প) ও Handicrafts সমর্থন করিয়া যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আমি লিখিয়াছিলাম, তাহার সম্মান রাখিবার জন্য কোন মূলধনীয় বিজ্ঞাপন কাগজে গ্রহণ করা হইত না। এই সংখ্যায় অরবিন্দ লিখিত প্রবন্ধে হাজারীয় Frederich List-এর অর্থনীতিবাদ প্রচার করা হয়।

একদিকে বক্তৃতাবাগীশদের অবজ্ঞা, অন্যদিকে গভর্ণমেণ্টের কড়া নজর, এই দুইয়ের মধ্য দিয়া আমাদের চলিতে হইয়াছিল। এইজন্য নেতাদের হুকুম ছিল, বক্তৃতাস্থানে যাইও না, বক্তৃতা করিও না। আমরা বক্তৃতাবাগীশদের "ভূয়ামাল" বলিয়া ঘৃণা করিতাম। নীরবে মুখ বুজিয়া কর্ম্ম করিবার শিক্ষা হইয়াছিল আমাদের।

তবুও জানিনা কেন, মিহির ও সুধাকর নামক মুসলমানীয় পত্রিকা আমাদের "যুগান্তরের গুণ্ডার দল" বলিয়া গালিগালাজ করিত।

পৃষ্ঠা ৫২ ফুটনোট ২—১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে একবার সন্ধ্যাকালে গরমপন্থীয় জাতীয়তাবাদীদের একটা বৈঠক হয়। তাহাতে চিত্তরঞ্জন দাস বলেন, ভারতে যে বিপ্লব হইবে, তাহা Bloodless Revolution রূপেই সংঘটিত হইবে। দেবব্রতবাবু বাহিরে আসিয়া আমাকে বলেন, "ভূপেনবাবু, চিত্তদাস খসিল, তিনি রক্তহীন বিপ্লবের কথা বলিতেছেন!" চিত্তরঞ্জন তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে দার্জ্জিলিং-এ বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্বে আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম তখন ঘোর সোসালিষ্ট ছিলাম! কিন্তু এক্ষণে তাহা বিশ্বাস করিনা।"
তাঁহাকে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রমথ মিত্রের সহকারীরূপে বৈপ্লবিক সমিতিতে দৃষ্ট হয়। ইহার পর, বিপিনচন্দ্র পাল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া গরমদলের পাণ্ডা হন এবং উপরোক্ত মত পোষণ করেন। তৎপর, তিনি গান্ধীজীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অনুগামী হন। শেষে "স্বরাজিষ্ট" হইয়া দেহত্যাগ করেন।

আমার সহিত উপরোক্ত স্থানে যখন তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি Equality of man (মানবের সমানাধিকার) মানিনা" (অথচ ইহার পূর্ব্বে তিনি গয়ার আনার্কিষ্ট-কমুনিষ্ট প্লানের ন্যায় একটা কর্ম্মপদ্ধতি দেশকে প্রদান করিয়াছেন!) এবং আমাকে বলিলেন, "তোমরা Terrorism কর কেন? ইহাতে কি হয়? বাঙ্গালার বৈপ্লবিক সমিতির ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতির মুখ হইতে এই বাক্য আমার কাছে বড় বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

পৃষ্ঠা ৫৩ ফুট নোট ১—১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনেরকালে চরমপন্থীয়েরা পৃথকভাবে একটি কনফারেন্স আহ্বান করিয়াছিলেন। বোধহয় তিলক মহোদয় ইহার সভাপতি হন। এই সম্মেলনে চরমপন্থীয় বা গরমদলেরপক্ষ হইতে ভারতের রাজনৈতিক আদর্শ স্থিরীকৃত হয়। সম্মেলনের পূর্ব্বে, সন্ধ্যা আফিসে সন্ধ্যাকালে শ্রীহট্টের কামিনী কুমার চন্দ ও বিপিন পালমহোদয়দ্বয় আদর্শ বিষয়ে একটি খসড়া করিতেছিলেন। সেইস্থলে লেখকও বসিয়াছিলেন। তাঁহারা স্থিরীকৃত করিলেন, autonomy (স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন) হইতেছে ভারতের আদর্শ ইহাতে লেখক পাল মহাশয়কে বলেন, "কি স্থির করিলেন? 'স্বাধীনতা' শব্দ ব্যবহার করিলেন না কেন?" এই অনুযোগ শুনিয়া বিপিন বাবু কামিনী বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কামিনী বাবু, শুনুন, ছেলেরা কি বলিতেছে?" কামিনী বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি আমার বক্তব্য বলিলাম। তাহাতে তিনি এবং বিপিনবাবু বলিলেন, "এই 'autonomy' কথাটাই বিশেষ মারাত্মক; ইহার চেয়ে আর কি চরমপন্থীয় শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে?" সেই একদিন আর আজ একদিন! সেইসব দিন আমাদের বুকে Nightmare এর ন্যায় চাপিয়াছিল।

এই প্রকারে চরমপন্থীয়েরা আদর্শকে কুয়াসাচ্ছন্ন রাখিলেন আর সেই সময়ে নৌরজী মহোদয় কংগ্রেসমণ্ডপ হইতে "Swaraj is our birth-right" (স্বরাজ-আমাদের জন্মগত অধিকার) বলিলেন। কুহেলিকাপূর্ণ দুইটি আদর্শই বৈপ্লবিকদের পছন্দ হয় নাই।

পৃষ্ঠা ৫৪ ফুট নোট ১—আমার মকদ্দমার পূর্ব্বে আমাদের ইলেকট্রিক প্রেস অচল হওয়ায় বাগবাজারস্থ দলের সভ্য শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তের ছাপাখানা হইতে যুগান্তর ছাপান হইত। কিন্তু কোন অনুসন্ধান উপলক্ষে

পুলিশ তথায় গিয়া ইহা ধরিয়া ফেলে। এই প্রকারে ছাপান বেআইনী বলিয়া পুলিশ কেশববাবুর বিপক্ষে মকদ্দমা করিয়া তাঁহার পাঁচশত টাকা দণ্ডদান করে। ইহার পরেও আমার মকদ্দমার সময় "হিতবাদী" প্রেস হইতে আমাদের পত্রিকা রাত্রিতে মুদ্রিত করিয়া লওয়া হইত। মালিকের পুত্র মনোরঞ্জনবাবু নিজে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করাইতেন। কেশবচন্দ্র গুপ্ত পার্টির সর্ব্বপ্রথম সময়ের সভ্য ছিলেন। আলীপুর মকদ্দমায় তাঁহার নাম বিজড়িত হওয়ায় তিনি নিরুদ্দেশ হন। কিন্তু বর্ত্তমানের সংবাদ, তিনি এতদিন ধরিয়া ছদ্মবেশেই জীবন যাপন করিয়াছেন এবং সুস্থ আছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি আমার পূর্ব্ব-কর্ম্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন।

পৃষ্ঠা ৫৪ ফুটনোট ২—রুষ প্রভৃতি দেশের ইতিহাস পাঠে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, একটি বৈপ্লবিক সমিতি বেশীদিন স্থায়ী হয় না। বাহির হইতে শত্রুর আঘাত ক্রমাগত তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে স্থির থাকিতে দেয়না। এইজন্য 'সমিতির' পর "সমিতি" গঠিত হয় এবং ভাঙ্গিতে থাকে। মূলমন্ত্র অর্থাৎ আদর্শ দ্বারাই কর্ম্মী পরিচিত হন। সমিতিগুলির উত্থান ও পতনের সঙ্গে বিপ্লববাদ প্রচেষ্টার উত্থান ও ধ্বংস হয় না। বিপ্লবের প্রবাহ ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-ভাবের মধ্য দিয়া গন্তব্য স্থানে ঠিক উপনীত হয়। বিপ্লব একটা অখণ্ড বস্তু, ইহা একটা দল বা বিশিষ্ট ব্যক্তির মতের সহিত সনাক্ত নহে। ফরাসী বিপ্লব এই প্রকারে বিভিন্নস্তর দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। রুষ ঐতিহাসিকেরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে ডিসেম্বারিষ্টদল, বিংশ শতাব্দীর বোলশেভিষ্ট দল পর্য্যন্ত লইয়া অখণ্ড "রুষ-বিপ্লব" বলিয়া অভিহিত করেন।

ভারতের ইতিহাসে বিপ্লববাদের যতটুকু অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা এই ধারা অনুযায়ী গমন করিয়াছে বা এখনও করিতেছে। ভারতের "স্বাধীনতা-আন্দোলন" একটা অখণ্ড বস্তু; তাহার পরিণতি এখনও হয় নাই।

পৃঃ ৫৫ ফুঃ নোঃ ১—ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদজনিত বস্তুতন্ত্রবাদ (Historical Dialectical Materialism) দ্বারাই বাতাবরণানুযায়ী বিভিন্ন মত ও শক্তি সমাজে অভিব্যক্ত হয়। এই প্রণালী দ্বারাই জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ভারতে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা শ্রেণী-স্বার্থের দাস হইয়া জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে (Individual Terrorism) 'সনাতনীয়' ও "ভারতীয়" বলিয়া গণসমূহের জাগরণ প্রচেষ্টাকে "বৈদেশিক পন্থা" বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহাদের যুক্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই এই কথা বলা হইতেছে। মস্কো হতে আমদানী 'থিয়সফী' এইদেশে সনাতনী বলিয়া সম্মানিত হইল, মস্কো হইতে টলস্টয়-বাদ সনাতনীয় ও জাতীয় বলিয়া গৃহীত হইল কিন্তু মার্ক্স'বাদীয় সোসালিসম্ বা কমুনিসম্ বিদেশীয় ও অ-ভারতীয় বলিয়া নির্য্যাতিত হয়। গান্ধীবাদের কতটা সনাতনীয় এবং ভারতীয় এই যুক্তি শ্রেণী-স্বার্থের চূড়ান্তই প্রকাশ করে।

পৃঃ ৫৫ ফুঃ নোঃ ২—নরেন্দ্র গোস্বামী আদালতে নিজের এজেহারে যাহা বলিয়াছে তাহা সব ঠিক নহে। অন্যকে মকদ্দমায় জড়াইবার জন্য যে অনেক মিথ্যাকথা বলিয়াছে। দলের বাঁকুড়া শাখার নেতা ৺সুরেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্র লইয়া সে আমার নিকট আসিয়াছিল।

পৃঃ ৫৮ ফুঃ নোঃ ১—ইনি ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

পৃঃ ৫৯ ফুঃ নোঃ ১—দলের যাহাদের সঙ্গে মিশিয়াছিল ও কর্ম্ম করিয়াছিল, সকলকেই সে ধরাইয়া দিয়াছিল। উহার দ্বারাই বৃন্দাবনের বাবাজী ধৃত হন এবং রঙ্গপুরের ডাকাইতি করিবার চেষ্টার কথা সে প্রকাশ করিয়াছিল। এই জন্যই তথাকার যে ডাকাইত একটী বিধবার এক ঘটিপূর্ণ টাকার সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল, তাহার নামও গোস্বামী প্রকাশ করিয়াছিল। এই ডাকাইত ধৃত হইয়া আলীপুর মকদ্দমায় স্বীকারোক্তি করিয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া রঙ্গপুরের আরও কয়েকজন কর্ম্মীকে ধরাইয়া দেয়।

পৃঃ ৬১ ফুঃ নোঃ ১—পুরীর গোবর্দ্ধন মঠের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য আমাদের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কুলকার্ণি সমভিব্যহারে তাঁহার সহিত প্রথম আলাপ করেন। পরে আমি সেই সূত্রে তাঁহার কাছে মধ্যে মধ্যে যাইয়া আলাপ করিতাম। শেষে উড়িষ্যার নেতাদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ করাইয়া দিই। অবশেষে আমাদের অনেকেই তাঁহার কাছে যাইতেন; শুনিয়াছি ভবানী মন্দির পরিকল্পনাকালে আমাদের কোন লোককে তিনি বলিয়াছিলেন, "আলাদা মঠ আর কেন? আমাদের সব মঠ ব্যবহার করিতে পারিবে।" তিনি আমার কাছে প্রথমে এই বাক্য লন যে আমাদের সহিত আর্য্য-সমাজের কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি স্বভাবতই ঘোর সনাতনীয় এবং ব্রাহ্মণ্যাভিমানী।

এই স্থলের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মহন্তের সহিতও আমার আলাপ হয়। এই সম্প্রদায়ের মহন্তেরা উড়িষ্যাবাসী কিন্তু কার্য্যতঃ হিন্দীভাষী ছিলেন। উড়িষ্যার নেতৃস্থানীয় ৺ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দিই। মহন্তজী বলিতেন—"হামলোগ্ তৈয়ার হ্যায়।" একবার অর্থের জন্য উড়িষ্যার জমিদার বংশের রামকৃষ্ণ বসুর কাছে তাঁহার আত্মীয় যোগেশবাবুর সহিত আমাদের লোক যান। রামকৃষ্ণ

বাবু রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য ৺বলরাম বসুর পুত্র। তিনি সমিতির কথা শুনিয়া বলিলেন—বাঙ্গলায় কি এমন কোন দল আছে? আমি এমন প্রকারের একটি দলকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকি। ইহা ধর্ম্ম ও রাজনীতি মিশ্রিত উড়িষ্যার একটি দল। উড়িষ্যার "মালিকা" সম্প্রদায়কে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন কিনা তাহা বুঝা যায় না।

পৃষ্ঠা ৬১—ফুটনোট ২—সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট শ্রবণ করিয়াছি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আখড়া ছিল।

পৃষ্ঠা ৬১—ফুটনোট ৩—এই সম্প্রদায়কে পরে পুলিশ নির্য্যাতন করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়।

পৃষ্ঠা ৬১—ফুটনোট ৪—উড়িষ্যার অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান নেতা। যতীনবাবুর দ্বারা আমাদের দলে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যতীনবাবু আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন। ইনি পরে গান্ধীপন্থী হন।

পৃষ্ঠা ৬২—ফুটনোট ১—ডঃ তারকনাথ দাস নৈহাটির লোক। তিনি জেনেরাল এসেমব্লী ইনষ্টিটুশনে (বর্তমানের Scottish Church College) পড়িতেন। এই সময়ে সতীশচন্দ্র বসুর সহিত তারকের আলাপ হয় এবং অনুশীলন সমিতিতে ব্যায়ামাদি করিতেন। সতীশের দ্বারাই তিনি সমিতিতে আনীত হন কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাঁহার টাঙ্গাইলের রাম মজুমদারের আশ্রমের সহিত সংযোগ ছিল। এইজন্য প্রথমে তিনি অতি সনাতনীয় ছিলেন। তিনি এবং তিনকড়ি গোস্বামী বলিয়া একটি কাঁশারী পাড়ার গোস্বামী বংশের তরুণ উভয়ে অস্ত্রবিদ্যায় ভালো খেলোয়াড় হন। তিনকড়িকে আমিই উক্ত সমিতিতে ভর্ত্তি করিয়া দিই। তিনি মুষ্টিযুদ্ধ ও তরবারি ব্যবহার ভাল শিক্ষা করেন। তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তারকচন্দ্র দাস পরে অনুশীলন সমিতি ছাড়িয়া দেন এবং আমাদের স্থাপিত 'ছাত্রভাণ্ডারে' যোগদান করেন। এই বিষয়ে তিনি

আমাকে অনুযোগ করেন,—"কি বলিব ভাই, নিজের দলের বিপক্ষে কোন কথা বলা উচিত নহে। সতীশ কাহাকে কিছু বৈপ্লবিক শিক্ষা প্রদান করে না।" এই অনুযোগ অনেকেই তখন করিয়াছেন। ভারক ছাত্রভাণ্ডারের কর্ম্মী হইয়া (এই সময়ে এই ভা'ার হ্যারিসন রোডে অবস্থিত ছিল) মফস্বলে স্বদেশী কাপড ও দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিতেন। তিনি তমলুকে মাথায় মোট করিয়া স্বদেশী কাপড বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করিতেন। এই সময় তিনি কেন্দ্রে লিখিয়া পাঠাইলেন, ' ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও তমলুকের উকিল ক্ষীরোদ সিংহের পুত্র দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের approach (ধরা) করা হয় নাই কেন?" কিন্তু পরে, অনুসন্ধানে জানা গেল যে কেহই বৈপ্লবিক সমিতির মত পোষণ করেন না। শাসমল সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-পন্থীয়। লেখকের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর, কৃষ্ণনগরের সম্মেলনের কলহের পর, শাসমলের কোন আত্মীয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "শাসমল আমাকে বলিয়াছিলেন, বৈপ্লবিকেরা আমাকে তাঁহাদের দলে টানিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আমি অস্বীকার করি।"

।পৃষ্ঠা ৬৩—ফুটনোট ১—তারকদাস পরে মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। শেষে, তিনি "তারকব্রহ্ম ব্রহ্মচারী" নামে পরিচিত হইয়া গেরুয়া পরিয়া ভ্রমণ করিতেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অধরচন্দ্র লস্কর নামে একটি কর্ম্মীকে লইয়া তিনি জাপানে যান এবং তথা হইতে আমেরিকায় যান। স্বদেশী-আন্দোলনের কর্ম্মে তারকদাসের স্থান অতি উচ্চে।

পৃষ্ঠা ৬৩—ফুটনোট ১—কলিকাতার S. K. Lahiri কোম্পানীর এজেন্ট ৺বাবু পুনিত লাল। ইহার সহিত আমাদের আলাপ হয় এবং

'ভবানী মন্দির' পরিকল্পনা উপলক্ষে পাটনায় আমি ইহার অতিথি হই। ইনি তাঁহার পুরাতন বৈপ্লবিক বন্ধুদের কাহারও কাহারও সহিত আমার আলাপ করাইয়া দেন। ইনি বলিতেন, "আমার পুরাতন কথা মনে পড়িলে এখন হাসি পায়। তৎকালে, যে যেরূপ পারি ভাঙ্গা অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতাম।"

পৃষ্ঠা ৬৩—ফুটনোট ২—কংগ্রেসের নেতা বাবু মঙ্গলাচরণ; তথাকার শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী উকিল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইত্যাদি।

পৃষ্ঠা ৬৪—ফুটনোট ১—এইস্থলের প্রধান কর্ম্মী শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ এইস্থান ব্যতীত তিনি উড়িষ্যাতেও কর্ম্ম করিয়াছেন।

পৃষ্ঠা ৬৩—ফুটনোট ২—ইহা হিন্দুস্থানী কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা গঠিত হয়। এই পলটন কলিকাতায় আসিলে তাহাদের নেতাদের সহিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, দেবব্রত বসুর আলাপ হয়। কোন কোন সিপাহী প্রয়োজন হইলে ছাত্র-ভাণ্ডারে আসিতেন। ইহাদের Sepoy clerk যিনি ছিলেন তিনি দেবব্রত বসু এবং আমার বাড়ী আসিতেন। তাঁহার উপরের ইংরেজ অফিসার বড় কড়া নজর তাঁহার উপর রাখিত। তিনি পলটনে ভীষণ ভাবে বক্তৃতা করিতেন। অবশেষে তাঁহার Contract ফুরাইলে অফিসার তাঁহাকে আর বহাল রাখিল না এবং তিনিও তজ্জন্য চেষ্টা না করিয়া চাকরী ত্যাগ করেন।

পৃষ্ঠা ৬১—ফুটনোট ৬—বীরশা কোল খৃষ্টান যুবক ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। মিশনারীদের দ্বারা কোলদের (হোজাতি) প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য কোলেরা তিনবার বীরশার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। শেষে, বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা ধৃত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কেহ কেহ বলেন, তিনি ব্যায়রামে মৃত হন। কোলেরা তাঁহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করিত। এইজন্য তাহারা তাঁহাকে "বীরশা ভগবান" আখ্যা দিয়াছিল।

পৃষ্ঠা ৬৪—ফুটনোট ৪—ইহার নাম শুনিয়াছিলাম—জোহান সর্দ্দার তাঁহার অনুসন্ধানে আমি গৈরিক বস্ত্র পরিয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ছোটনাগপুরে গিয়াছিলাম। কিন্তু শুনিলাম তিনি জঙ্গলেই লুকায়িত থাকেন।

পৃষ্ঠা ৬৪—ফুটনোট ৫—ইঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। ইঁহাদের সংস্পর্শে বিহারের নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছাত্রাবস্থায় আসেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, "আমি আপনাদের সর্ব্ব সংবাদ রাখিতাম, কিন্তু কখনও দলভুক্ত হই নাই"।

পৃষ্ঠা ৬৫—ফুটনোট ১—হরিচরণ বাবু আম্বালায় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আম্বালায় ইঁহার সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি দুঃখ করেন, "আমার সব কর্ম্মীরা মারা গেছেন। তাঁহারা বীর ছিলেন।" তাঁহার কাছে আমার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার দুই জন পুরাতন পঞ্জাবী শিষ্য আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। উক্ত স্থানের কংগ্রেসনেতা লালা দুনীচাঁদও যৌবনে ইঁহার শিষ্যত্ব করিতেন। লালাজী নিজে লেখককে এই কথা বলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসে হরিচরণ বাবু গরমদলের প্রতিনিধি ছিলেন। ইনি এক্ষণে গতায়ু হইয়াছেন।

পৃষ্ঠা ৬৬—ফুটনোট ১—১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন কালে বৈপ্লবিক পার্টির প্রথম সম্মেলন আহূত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় এবং বিভিন্ন জেলা হইতে ডেলিগেটগণ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে যাঁহাদের নাম লেখকের মনে আছে তাহা এইঃ—মৈমনসিংহ

হইতে পরেশ লাহিড়ী (বর্ত্তমানের মহাদেবানন্দ গিরি), ঢাকা হইতে শ্রীপুলিন চন্দ্র দাস, ত্রিপুরা হইতে শ্রীনিখিল মৌলিক ও ডাঃ কর্ম্মকার, নদীয়া হইতে শ্রীললিত চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার ভাগিনেয় ৺যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেদিনীপুর হইতে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু বর্দ্ধমান হইতে নবীন উকিল শ্রীযুক্ত সামন্ত (ইনি কিন্তু কার্য্যবশতঃ পূর্ব্বদিনেই কলিকাতা ত্যাগ করেন) ও বিভূতিবাবু, যশোহর (মাগুরা) হইতে ৺বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য, কলিকাতার অনুশীলন সমিতি হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার সহকর্ম্মী ৺সেনগুপ্ত ; কলিকাতার বিশিষ্ট কর্ম্মীরা যথা :—অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, অন্নদা কবিরাজ, বারীন্দ্র ঘোষ, ৺দেবব্রত বসু, লেখক প্রভৃতি, পাবনার প্রতিনিধিত্ব করিলেন অবিনাশবাবু ও অন্নদা কবিরাজ প্রভৃতি। জলপাইগুড়ি হইতে আসেন শ্রীসান্যাল, আত্মোন্নতি সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী, দিনাজপুর হইতে তথাকার প্রবীন উকিল ইত্যাদি।

ডেলিগেটদের সনাক্ত করিয়া যোগদান করিতে দেওয়া হয়। বর্দ্ধমানের বিভূতিবাবু পুলিশে কেরাণীর কর্ম্ম করিতেন। ললিতবাবু তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তিনি পুলিশে চাকরী করেন। ইহাতে ললিত বাবু চেঁচামেচি করেন যে, পুলিশের লোক ভিতরে ঢুকিয়াছে। এইসময়ে লেখক বাহিরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথা কহিতেছিলেন। তিনি তখন ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে সবে আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়াছেন। আমি তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "এখনও সম্পূর্ণ সারিয়া উঠি নাই"। এই সময়ে ললিত বাবুর ব্যস্ততার কথা শ্রবণ করিয়া আমি তথায় যাই এবং হাসিয়া বলি, বিভূতি বাবু আমাদের লোক, আমি তাঁহার জন্য guarantee হইতেছি। বিভূতি বাবুর সঙ্গে তারপর শেষ দেখা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের কংগ্রেসী

সম্মেলনে। তিনি তখন বলিলেন, পুলিশের কার্য্যে পেনশন লইয়া বীরভূমে কংগ্রেস কর্ম্মী হইয়াছেন।

এই সময়ে পরেশ লাহিড়ীর সনাক্তকরণের কথা উঠে নিখিল মৌলিক তাঁহার বন্ধু, কিন্তু তিনি তখনও সভায় উপস্থিত হন নাই। কাজেই সভাপতি যখন তাঁহার credential চাহিলেন তিনি (বোধ হয় ভয়ে) আসল কথা গোপন করিয়া বলিলেন, "আমার বন্ধু নিখিলবাবু বলিয়াছিলেন এইস্থানে একটা সভা হইবে, তাই এইস্থলে আসিয়াছি। তৎপর, সভাপতি যখন বলিলেন, আপনি দীক্ষা লইতে রাজী আছেন ?" তখনও তিনি সত্যগোপন করিয়া "না" জবাব দিলেন। তখন সভাপতি বলিলেন, "Be pleased to leave the meeting (অনুগ্রহ করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করুন)। লেখকের সঙ্গে লাহিড়ীর আলাপ ছিল, কিন্তু তিনি যখন নিজের বৈপ্লবিক পরিচয় দিতেছেন না এবং যাঁহার কাছে তিনি দীক্ষা লইয়াছেন তিনি যখন হাজির নাই তখন লেখকের উপর-যাচা হইয়া তাঁহাকে সনাক্ত করা অনুচিত এবং দলের নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া চুপচাপ করিয়া থাকেন। লাহিড়ী পরে লেখককে বলেন, নিখিল বাবু তথায় ছিলেন না বলিয়াই তিনি আত্মগোপন করিয়াছেন, যদিও তিনি পার্টি-মেম্বার।

তৎপর দিনাজপুরের সিনিয়ার উকিলের কথা উঠিল। তিনি তখনও দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই ; কিন্তু সভাপতি মিত্র মহাশয় বলিলেন - I stand guarantee for him with my life (আমি নিজের জীবন দিয়া তাঁহার জামিন হইতেছি)।

তৎপর সভাপতি তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমেই সকলকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা discipline মানিতে রাজী আছেন কিনা ?" সকলে একবাক্যে বলিলেন, "আমরা রাজী আছি।" এই উত্তরের পর তাঁহার বক্তব্য তিনি বলিতে লাগিলেন। তিনি বাঙ্গালায় বৈপ্লবিক কর্ম্মের

সর্ব্ববিভাগের কথা বলিলেন। "যুগান্তর" পত্রিকার কথা বলিলেন এবং ইহাকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পরে, একটা নিভৃত স্থান ক্রয় করিয়া তথায় সামরিক শিক্ষা দিবার কথা উঠে। মিত্র মহাশয় ইহাতে বিশেষ জোর প্রদান করিয়াছিলেন। এই কথাতে দিনাজপুরের বৃদ্ধ উকিলটির চিত্ত আকর্ষণ করে এবং তিনি এই বিষয়ে নানা প্রশ্ন করেন। শেষের কথা উঠিল, কে কোন্ জেলার বিপ্লবের ভার গ্রহণ করিবেন। অনেকেই নিজ নিজ জেলার ভার লইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পুলিনবাবু বলিলেন তিনি ঢাকা জেলার ভার নিবেন; ডাঃ কর্ম্মকার ত্রিপুরা জেলার ভার নিলেন।

সভাপতির বক্তৃতা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বকর্ম্মের সমন্বয় করিয়া বিপ্লবকে কি প্রকারে চালাইতে হইবে সে বিষয়ে বলিলেন। বক্তৃতার শেষে মিত্রমহাশয় জ্ঞানেন্দ্র বসুকে চট্টগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্ঞা॰বাবু সেই সময়ে সাংসারিক কার্য্যে চট্টগ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি মিত্র মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আপনি যখন চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন, তখন আথড়ায় কত লাঠির ভিড দেখিয়াছিলেন কিন্তু পরে, তথায় একটি লাঠিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই (অর্থাৎ সব নির্ব্বাপিত হইয়াছে)।" তৎপরে, কথা উঠে, মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিকদের সহিত বাঙ্গলার কর্ম্মীরা ভাববিনিময় করিবে কিনা? সভাপতি বলিলেন, "প্রয়োজন নাই, আমাদের কর্ম্মের গুপ্তকথা তাহাদের বলিবনা।" শেষে প্রতিনিধিরা বলিলেন, "তাঁহারা কংগ্রেসের ডেলিগেট হইয়া আসিয়াছেন, কংগ্রেসে না গিয়া সেই টাকা পার্টিকে দিতে তাঁহারা ইচ্ছুক; কিন্তু কংগ্রেসে "আদর্শ" বিষয়ে যে নরম দল ও গরম দলের বিবাদ রহিয়াছে, তাঁহারা ডেলিগেটরূপে গরম দলকে এই বিষয়ে ভোটদানে সাহায্য করিতে পারেন।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "তাহা সত্য, তাহা হইলে আপনারা কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করুন।"

আমার জেলের পর, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পার্টির দ্বিতীয় অধিবেশন উক্ত স্থানেই হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন অবস্থানুযায়ী পার্টির কর্ম্ম-পন্থা নির্দ্ধারণ করা। এই সংবাদ লেখক পরে লোকমুখে শ্রুত হইয়াছেন (এই বিষয়ে শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য্যের বিবৃতি "গ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৬৭—ফুঃ নোঃ ১—ইনি তিলকের পত্র পাইয়া বেলুড় মঠে আস্তানা করেন। বোধ হয় ইনি গেরুয়াধারীরূপে তথায় আসিয়াছিলেন।

পৃঃ ৬৭—ফুটনোট ২—তিলক, খাপার্দ্দে, মুঞ্জে প্রভৃতি। এই সময়ে তিলক বাঙ্গলার প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করেন—ব্যামফিল্ড ফুলারের মাথা কোন বাঙ্গালীরা ভাঙ্গে নাই।

পৃঃ ৬৮—ফুটনোট ১—এই প্রচেষ্টা সফলকাম হয় নাই। যাঁহারা পুলিশ ও রাজকর্ম্মে ঢুকিয়াছিলেন, তাঁহারা খয়ের খাঁ হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্ব সম্পর্ক নিজেদের স্বার্থে প্রয়োগ করিতেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনকালে মেদিনীপুরে এক অত্যাচারী ডেপুটির নাম বিশেষভাবে অখ্যাতি প্রাপ্ত হয়। ইনি ছাত্রা-বস্থায় একজন উদ্যোগী বৈপ্লবিক ছাত্রকর্ম্মী ছিলেন এবং ষ্টেপলটনকে কলেজে মারিবার একজন অন্যতম বলে স্পর্দ্ধাও করিতেন। রুষেও এই প্রকারের প্রচেষ্টা সফলকাম হয় নাই।

পৃঃ ৭২—ফুটনোট ১—এই অধ্যায়টি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। তখনকার কংগ্রেসী নেতাদের বুলি ছিল—"আমরা বিদেশী আমলাতন্ত্রের বিপক্ষে লড়িতেছি।"

পৃঃ ৭৪—ফুটনোট ১—মাসারিকের **Spirit of Russia** নামক পুস্তক পাঠে দৃষ্ট হয় যে ইহাদের চিন্তার একটা ধারা ছিল। তাহা মার্ক্সবাদের বিপক্ষেই নিয়োজিত হইত। তাঁহাদের সুদৃঢ় কর্ম্মপদ্ধতি ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, শাসনতন্ত্র হস্তে আসিলে তাঁহারা পার্টির যেরূপ মত বা পথ ছিল তাহা কার্য্যে লাগান নাই।

পৃঃ ৭৬—ফুটনোট ১—কোন কোন ইউরোপীয় লেখক ম্যাটসিনিকে এইজন্য সোসালিষ্ট বলিয়াছেন। ইহা সত্য, ব্রাসেলে প্রথম শ্রমিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের (First International) অধিবেশনের প্রাক্কালে ম্যাটসিনির শিষ্যেরা তাহা দখল করিয়াছিল কিন্তু মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ লণ্ডন হইতে যাইয়া তাঁহাদের হস্ত হইতে ইহা কাড়িয়া লন। ইহার পর আর কোন আন্তর্জাতিকে ম্যাটসিনির শিষ্যদের উপস্থিতির সংবাদ পাওয়া যায় না। আজকালকার পরিভাষায় তিনি "বুর্জোয়া-ডেমক্র্যাট" ছিলেন। লেনিন তাঁহাকে এই আখ্যাই প্রদান করিয়াছেন। তবে তিনি নৈষ্ঠিক গণতন্ত্রবাদী (Republican) ছিলেন।

পৃঃ ৭৬—ফুটনোট ১—হিসাব করিয়া দেখিলে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদী শহীদের সংখ্যা রুষদেশ হইতে হয়ত কম হইবে না।

পৃঃ ৭৮ ফুটনোট ১—স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই কথা শুনিয়াছি যে, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি নিজেদের পরিচিত লোকদের (যাঁহারা বৈপ্লবিক দলের লোক) ডাকিয়া বলিয়াছেন—"ছেলেরা যে ভাল কার্য্য করিতেছে তাহার জন্ম অর্থ নাও"—বলিয়া অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

পৃঃ ৭৮—ফুটনোট ২—এই ডেপুটেশানের কতিপয় সদস্যের কাছ হইতে আমি নিম্নলিখিত তথ্য পাই। এনভার পাশার সহিত পরিচয়কালে

সকলকার মুসলমান নাম শুনিয়া তিনি বলেন :—"তোমাদের মধ্যে কেহ হিন্দু নাই?" তখন ভারতীয়েরা বলেন, "আমরা সকলেই হিন্দু, কেবল মুসলমান নামে এই দেশে আসিয়াছি।" তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করেন : "ইহা শুনিয়া আমি আনন্দিত। আমি ধর্ম্ম ও রাজনীতি আমার বিভিন্ন পকেটে রাখি।" তৎপর, তিনি বলেন, "যে কয়জন ভারতীয় মুসলমান আমি দেখিয়াছি তাহারা নিন্দনীয় ব্যক্তি।" এই উপলক্ষে তিনি বলেন : "Those Bengalee boys who are throwing bombs will do the work…" ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে শেখ আবদুল্লা এস সাবিস নামক মিশরীয় প্যান ইসলামীয় প্রচারক এনভার পাশার ভারত বিষয়ে মত সম্বন্ধে আমাদের কাছে নিম্নলিখিত ঘটনাটি বলেন। তিনি আবদুল জববার নামক তুর্কী প্রবাসী একজন ভারতীয়কে পাশার কাছে লইয়া যান। পাশার কাছে জববার বলেন—হিন্দুরা যেমন কার্য্য করিতেছে, তিনিও তদ্রূপ কার্য্য করিতে চান। তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করা হউক। পাশা বলেন,—হিন্দুরা ভারতের জন্য কর্ম্ম করিতেছে, তুমি ইসলামের জন্য কর্ম্ম কর। উভয় কর্ম্ম মূলতঃ এক।

পৃঃ ৭৯—ফুটনোট ১—এই তথ্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে ইঙ্গিত আছে।

পৃঃ ৮১—ফুঃ ১—এই কথা কোন কোন মডারেট নেতাও স্বীকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে ৺বি, সি, চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। নিরপেক্ষ কংগ্রেসী স্বরাজিষ্টও এই সত্য স্বীকার করিয়াছেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে কোন একস্থানে একজন নিখিল ভারতীয় মডারেট নেতার সহিত আমার আলাপ হয় এবং রাজনীতিক তর্কাদি হয়। এই সময়ে আমি অনুযোগ করিয়াছিলাম যে, আমাদের দুঃখ-কষ্ট বরণের

ফল তাঁহারা ভোগ করিতেছেন (বিকর্মের ফলে ইনি গভর্ণরের কাউন-সিলের সভ্য হইয়াছিলেন)। ইহাতে তিনি তর্ক করিলে আমি বলি—'হাঁ, আমি আপনার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করি নাই বটে, কিন্তু আপনি আমার কষ্টভোগের ফলের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেছেন ("It is on account of my sufferring that Morley-Minto reform was passed, it is on account of my suffering that Montague-Chelmsford Reform was passed")। ইহাতে আমার স্বরাজিষ্ট বন্ধু বলিলেন, "You are right" (তুমি ঠিক বলিতেছ)। মডারেট নেতাটি নত মস্তকে নির্ব্বাক রহিলেন। এই স্থলে "আমি" শব্দটি ইংরেজী Idiom অনুযায়ী "আমরা" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল। আমার স্বরাজিষ্ট বন্ধুটি ছিলেন ভাগলপুরের জমিদার বিখ্যাত ৺দীপনারায়ণ সিংহ।

পৃঃ ৮১—ফুটনোট ২—এক্ষণে শুনিতেছি লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হইয়া পিঙ্গলের তথায় ফাঁসী হয়। পিঙ্গলে ও সত্যেন্দ্রনাথ সেন উভয়ে আমেরিকা হইতে কলিকাতা আসেন। উভয়েই এই স্থানে ধৃত হন। কিন্তু সত্যেন প্রমাণাভাবে খালাস হন এবং পিঙ্গলের লাহোরে ফাঁসী হয়। কিন্তু আমি প্রবাসে ইংরেজী সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে পিঙ্গলে বর্ম্মায় ভারতীয় সিপাহীদের বিগড়াইতে যাইলে তাহারা তাঁহাকে ধরাইয়া দেয় এবং তথায় তাঁহার ফাঁসী হয়। পিঙ্গলে ও সত্যেনের কথা আমাকে সত্যেনের এক আত্মীয় বলিয়াছেন। তিনি বলেন, উভয়ে তাঁহাদের কলিকাতার বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থিত ছিলেন। বর্ম্মার সংবাদ ঠিক কি না তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন। এক্ষণে শুনিতেছি পিঙ্গলে ভারতেই সিপাহী বিগড়াইবার চেষ্টা করে। অবশ্য ইংরেজ পুলিশ দ্বারা প্রস্তুত সংবাদগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। শুনিতেছি পিঙ্গলে বর্ম্মায় উক্ত কর্ম্মের জন্য প্রেরিত হন। শ্রীভূপতি মজুমদারের নিকট ইহা শুনিয়াছি।

পৃঃ ৮২—ফুঃ নোঃ ১—(ভুলক্রমে ২ নং হইয়াছে।) নির্জ্জনে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া একদল সন্ন্যাসী দ্বারা তাহার পূজা চালাইয়া এবং উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা বিপ্লববাদ প্রচার করা এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম করার সঙ্কল্প অরবিন্দ বরোদা হইতে ১৯০৫ সালে আনেন। এই সঙ্কল্প তিনি তাঁহার ভ্রাতা দ্বারা কলিকাতায় পাঠান। এই কর্ম্মোপলক্ষে ৺হেমচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে একটা সভা আহুত হয়। তথায় ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৺রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, দেবব্রত বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। দেবব্রতের কাছে শুনিয়াছি, রামেন্দ্র বাবু এই বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'বেলুড়মঠ' হইয়াছে কিন্তু দেশের কর্ম্ম কি করিতেছে? আবার একটা মঠের প্রয়োজন কি? হীরেন্দ্র বাবু প্রতিবাদ করিয়া, বলেন, ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। শেষে কলিকাতায় একটি Board of Trustees নিযুক্ত হয়। তন্মধ্যে ৺হেমচন্দ্র মল্লিক (সুবোধ মল্লিকের খুল্লতাত); হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি ছিলেন। এই উপলক্ষে একটী পুস্তিকা বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হইয়া প্রচারিত হয় এবং ছোটনাগপুরের পাহাড়ে মন্দির স্থাপনের জন্য ভূমির খোঁজও হয়। এইজন্য বারীন্দ্র ও হরিশ ঘোষ উভয়ে বিহারে যান। মন্দিরের জন্য চাঁদা তুলিবার নিমিত্ত রসিদ বইও মুদ্রিত হয়। আমিও আরা এবং পাটনায় এই কর্ম্মের জন্য পরে প্রেরিত হই। ভূমি পাইবার সম্ভাবনা ছিল, অনেক বিহারী জমিদার এতৎকল্পে রাজী ছিলেন। যেসব বিহারী ভদ্রলোক ভিতরের কথা জানিতেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাঁহারা অনেকেই চাঁদার খাতায় নামসহি করেন। কিন্তু পাটনার বাঙ্গালীরাই নানা প্রকারের আইনের ফাঁকি বাহির করেন। Trustee-দের নাম কোথায়, তাহাদের স্বাক্ষরিত পত্র কোথায়, কে কে এই পরিকল্পনায় আছেন ইত্যাদি না

জানলে বিশ্বাস করা যায় না! এই সময়ে পুনিতবাবু আমায় কতিপয় বিহারী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তাঁহারা বলিলেন, "মদৎ মিলেগা," কিন্তু বাঙ্গালীদেরই অবিশ্বাস ছিল। পুনিতবাবু আমাকে তৎকালে পাটনায় অবস্থিত অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন এবং কিছুদিন আমি সরকার মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করি। এই সময়েই একবার কথোপকথনকালে অধ্যাপক সরকার বলেন, "ভগ্নী নিবেদিতা বলেন, রামমোহন রায়ের উপযুক্ত স্থান ছিল রণজিৎ সিংহের ডানদিকে। তাহা না করিয়া তিনি একটা ধর্ম্ম-সমাজ করিয়া নিজের জীবন ব্যয় করিলেন (The proper place of Rammohan Roy had been by the right side of Ranjeet Singh)।" নিবেদিতার এই মতে সরকারের মন্তব্য এই, "রণজিৎ সিংহ ছিলেন একজন বর্ব্বর, সে রামমোহনের কদর কি বুঝিত!" আমাদের দেশের অধ্যাপকদের Dialetical materialism-এর জ্ঞান এই প্রকারের।

পৃঃ ৮৩—ফুঃ নোঃ ১—(ভুলক্রমে ২ নং হইয়াছে) এই আদর্শের ফলেই বোধ হয় অনেকে ভোলা গিরির শিষ্য হন। পরে, অনেকে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন।

পৃঃ ৮৩—ফুঃ নোঃ ২—ইঁহার নাম সত্যেন্দ্রনাথ সেন। ইনি রাঁচির কেদারনাথ সেনের পুত্র এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কেদারবাবু বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের Deputy Inspector of Schools ছিলেন। সত্যেনের পৈতৃক বাসস্থান কুষ্টিয়া মহকুমার বারখৈল গ্রাম। ইনি মাণ্ডরা এবং পরে কলিকাতার সিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যান এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে পিঙ্গলের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাস্তায় হংকং সহরে অবতরণ করেন। ভারতে উপনীত হইবার কয়েকদিন

বাদেই পুলিশদ্বারা ধৃত হন (Vide Rowlatt Committee Report) পুলিশ কয়েদ করিয়া তাঁহাকে লাহোরে পাঠায় কিন্তু প্রমাণাভাবে (Want of indentification) খালাস পান। কিন্তু তৎক্ষণাৎ Defence of India Act অনুসারে পুনঃ ধৃত হন এবং প্রেসিডেন্সী, আকোলা, মণ্টগোমারী এবং হাজারীবাগ জেলে ক্রমান্বয়ে থাকিতে হয়। জেলে তাঁহার উপর অকথ্য শারীরিক পীড়া প্রদান করা হয়। সত্যেন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে খালাস পান কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মাগুরা মহকুমার ভুষলকান্দি নামক গ্রামে মাতুলালয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি হেমপ্রভা নামে বিধবা স্ত্রী এবং পাঁচদিনের সদ্যজাত শিশু মনুকে (S. N. Sen) রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র এক্ষণে নবদ্বীপ জেলার কালীগঞ্জ পোষ্টাফিসের অন্তর্গত লাঘুরিয়া গ্রামে কবিরাজ রমেশচন্দ্র রায়ের কাছে আছেন। এই তথ্য আমাকে সত্যেনের এক নিকট আত্মীয় প্রদান করিয়াছেন। সত্যেন পূর্ব্বোক্ত খগেন্দ্র চন্দ্র দাসের ভাগিনেয় সম্পর্কীয় লোক এবং পুরাতন কর্ম্মী ও বার্লিন কমিটির একজন সংস্থাপয়িতা অধ্যাপক শ্রীশ সেনের মাসতুতো ভ্রাতা।

পৃঃ ৮৩—ফুঃ নোঃ ৩—ইহার নাম জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, শ্রীরামপুর নিবাসী। ইনি বিদ্যাশিক্ষার্থে আমেরিকায় গিয়াছিলেন এবং যুদ্ধের সময় বার্লিন হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অনুশীলন সমিতির উৎপত্তি বিষয়ে সতীশ চন্দ্র বসুর বিবৃতি

আমি আগে ৺নারায়ণচন্দ্র বসাকের আখড়ায় (গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট) ব্যায়াম করিতাম। এইস্থান হইতে আমি জেনেরাল এসেমব্লী কলেজের জিমনাষ্টিক ক্লাবে ভর্ত্তি হই। ৺গৌরহরি মুখোপাধ্যায় (ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের খুল্লতাত এই ক্লাবের মাষ্টার ছিলেন। এই সময়ে অধ্যাপক Wann-এর কাছে প্রাথমিক ক্লাসে (First year) পড়ি। ওয়ান উপরোক্ত ব্যায়াম ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। এই ক্লাবের সংযুক্ত "কাশীনাথ লিটেরারী ক্লাব" নামক একটি বিভাগ ছিল। একদা তথায় একজন সেক্রেটারী সভার minutes লিখিবার জন্য বিলাতি কাগজ আনয়ন করেন; কিন্তু ওয়ান মহোদয় বলিলেন, "India-made কাগজ আন, না-হয় আমি এই ক্লাস বন্ধ করে দিব।" তখন আমার মনে পড়িল স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি! এতদ্বারা মনে ধাক্কা লাগিল—আমরা স্বামীজির স্বদেশী, জিমনাস্টিক, লাঠিখেলা, বস্তীতে Sanitary work প্রভৃতি করার উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছি। ইহার পর, আমরা স্বামী সারদানন্দের কাছে যাই। তিনি বলিলেন, "স্বামীজি বলিয়া গিয়াছেন, যে-কার্য্য করিতেছ, তাহা করিবে, কখনও তাহা ছাড়িবেনা।" তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেনঃ একটা কাক দড়ি দিয়া বাঁধা থাকিলে যেমন মুক্তির জন্য ঝটপট করে, তেমনি তোমরাই-বা কেন মুক্তির জন্য জীবন দিবেনা? সিস্টার নিবেদিতার কাছে যাহা বলিয়া গিয়াছি তাহা তোমরা ছাড়িবেনা। তিনিই তোমাদের উপদেশ দিবেন। ভগ্নী নিবেদিতা বলিলেন, "তোমরা স্বামীজির উপদেশ জান, বস্তীতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কার্য্য করিবে, লাঠি ও মুগুর খেলা করিবে, শরীর চর্চ্চা করিবে।"

তৎপর, একবার কলিকাতায় সাতদিন বৃষ্টিপাত হয়। কলিকাতায় প্লেগ হইয়া গিয়াছে, আমরা relief work করিবার জন্য ওয়ানের সঙ্গে বাহির হইলাম। তিনি ড্রেন সাফ করিতে আরম্ভ করান। তৎপর বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপিত হইল। স্বামী সারদানন্দ প্রথম সভাপতি হন; তিনি বলেন, "বিবেকানন্দ সোসাইটি" ধর্ম্মচর্চ্চা নিয়াই ব্যস্ত থাকুক, আখড়া আলাদা থাকুক, তুমি (সতীশ) ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রচার কর।" তৎপর ওয়ানের অনুমতিক্রমে স্বামীজির ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত কলেজের আমতলায় Historical club বসিতে আরম্ভ হয় (কলেজের chapel ঘর ব্যবহারার্থ অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই)। কিন্তু লাঠিখেলার অনুমতি পাওয়া যায় নাই। এই জন্য ইহার পর, মদন মিত্রের লেনে একটি ছোট লাঠিখেলার ক্লাব স্থাপন করিলাম। এই সময়ে কলেজের প্রিন্সিপাল মরিসন, নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের হেডমাষ্টার নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, তারিণী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উক্ত স্কুলের স্বত্বাধিকারী গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, সেণ্ট্রাল কলেজের স্বত্বাধিকারী ক্ষুদিরাম বসু প্রভৃতি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে বেশ্যাপল্লী উঠাইয়া দিবার জন্য আখড়ার ছেলেদের উপদেশ দেন। এই বিষয়ে গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় (ইনি এটর্নী ছিলেন) এতৎকল্পে মামলা প্রভৃতির খরচা নিজে বহন করিতে স্বীকার পান।

এই সময়ে, আমরা নরেন্দ্র বাবুকে আখড়ার নামকরণের জন্য অনুরোধ করি। তাহাতে তিনি "অনুশীলন সমিতি" এই নাম ধার্য্য করেন। এই নামটি বঙ্কিম বাবুর সাহিত্য হইতে গৃহীত হয়। এই সময়ে ওয়ান বলেন, তোমাদের "ইংরেজ তাড়ান দল" বলিয়া বদনাম উঠিয়াছে। ইত্যবসরে, তেঘরিয়ার শশী চোধুরী, ব্যরিষ্টার আশুতোষ চৌধুরীর কাছে আমাদের লইয়া যান। শশীদা বলেন, এই ছোকরারা আমাকে খুব

উৎসাহ দেন, আমার কুলুপ (তাঁহার স্থাপিত টেকনিক্যাল স্কুলে প্রস্তুত) প্রভৃতি বিক্রয় করেন ইত্যাদি। আমি শশীদা'কে বলি, "আমাদের সভাপতি বা নেতা নেই"। চৌধুরী ক্লাবের কথা শুনিয়া বলিলেন, এই কর্ম্মের উপযুক্ত লোক হইতেছেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র। চৌধুরী মিত্রের নামে পত্র দিয়া তাঁহার কাছে আমাদের পাঠাইয়া দেন। তাঁহাকে সব কথা বলিলে তিনি excited হইয়া আমাকে জাপটাইয়া ধরিলেন; পরে তিনি ক্লাবের Commander-in-chief (পরিচালক) হইলেন। সাতদিন বাদে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বরোদা হইতে একটা দল আসিয়াছে—তোমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী উদ্দেশ্য তাহাদেরও। সর্ব্বপ্রকারের training (সামরিক শিক্ষা) তাহারা দিবে। তাহাদের সহিত তোমাদের amalgamate (সংযোগ) করিতে হইবে।" আমরাও রাজী হইলাম। এই সময়ে উভয় দলে মিল হইয়া গেল। তাহার ফলে যে দল গঠিত হইল তাহার সভাপতি হইলেন প্রমথনাথ মিত্র, সহকারী সভাপতি হইলেন চিত্তরঞ্জন দাস (পরের দেশবন্ধু দাস) ও অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সঙ্গে দলে আসিলেন, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ হালদার চিত্তরঞ্জনের শ্যালক) ব্যারিষ্টারদ্বয়। সভ্যদের ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করার জন্ত হালদার মহাশয় একটি ছোট ঘোড়া এই সঙ্গে দলকে দান করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে একটি ব্যায়ামের আখড়া আপার সার্কুলার রোডে স্থাপিত হইল। বরোদা হইতে আগত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "মদন মিত্রের লেনের আখড়া পৃথকভাবে থাকুক। আমাদের অল্প বয়সের সভ্যেরা (Junior members) মদনমিত্রের লেনের আখড়ায় থাকুক, আর বয়স্ক সভ্যেরা (Senior members) যতীন বাবুর নেতৃত্বে আপার সার্কুলার রোডের আখড়ায় ব্যায়াম অভ্যাস করুক।"

এই সময়ে অরবিন্দ একবার ছদ্মবেশে মদনমিত্র লেনের আখড়ায় আসিয়াছিলেন। এই কথা আমি মিত্র মহাশয়ের কাছ হইতে শ্রবণ করি। পরে, অরবিন্দ আমাকে মেদিনীপুরে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর কাছে প্রেরণ করেন। সেইখানে আমি তাঁহার ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে দীক্ষিত করি এবং তথায় আখড়ায় boxing শিক্ষা প্রদান করি।

এই সময়ে যে দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইত তাহাতে "ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন" করার কথার উল্লেখ ছিল বলিয়া আমার মনে হয়। তৎকালের training department-এর প্রথম দলের কর্ম্মীদের মধ্যে সব অনুশীলন সমিতির লোক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত, অধ্যাপক নলিনী মিত্র, ইন্দ্র নন্দী (আত্মোন্নতি সমিতির সভ্য), আমি (সতীশ), বারীন, রবীন্দ্র বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য (উভয়ে আড়বেলিয়া গ্রামের), পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর, জ্যোতিষ চন্দ্র সমাজপতি (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র) দলে ছিলেন। সখারাম বাবু অনুশীলনের Moral class-এ বক্তৃতা দিতেন। আমি তাঁহাকে মিত্রের কাছে লইয়া যাই। এই বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের পূর্ব্বে হেম মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগন ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি জাপানী প্রফেসার ওকাকুরাকে সাদর-অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়া আনেন কিন্তু কোন সমিতি ইহারা গঠন করেন নাই। পি. মিত্র ও হেম মল্লিক অনুশীলন সমিতির ছেলেদের ওকাকুরার সঙ্গে মিশিতে দেন নাই। ভগ্নী নিবেদিতা বরোদাতে অরবিন্দকে এই সমাবেশের সংবাদ দেন।

যতীনবাবুর নেতৃত্বে সার্কুলার রোডে আখড়া স্থাপিত হয় এবং তৎ-সংলগ্ন একটি বাড়ীতে তিনি সপরিবারে এবং অবিনাশ, রবীন এবং বারীন প্রভৃতি কর্ম্মীদের সহিত বাস করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে জনকতক

কর্ত্তা কড়োয়ায় রাজনীতিক ডাকাইতি করেন। একজন ফিরিঙ্গিকে ধরিয়া তাহার টাকা ছিনাইয়া লওয়া হয়। তারকেশ্বরে এই প্রকারের প্রচেষ্টা প্রথম হয়। একবার এই উদ্দেশ্যে ভগ্নী নিবেদিতার কাছ হইতে তাঁহার রিভলবার চাহিতে কেহ গিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বিষম রাগান্বিত হন এবং এই যাচ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিয়া দেন। মিত্র সাহেবও এই সব ডাকাইতির বিপক্ষে ছিলেন। এই সময়ে যতীন বাবুর বিপক্ষে বারীন নালিশ (charge) আনয়ন করেন। এই চার্জ মিথ্যা ছিল। যতীনবাবুর বিপক্ষে extravagant (বেশী খরচে) বলিয়া যে নালিশ আনয়ন করা হয় তাহা আমার পেটে অস্ত্রোপচারের পরে শীঘ্র সুস্থ হইবার জন্য তিনি অনেক খরচ করেন। তিনি আমাকে ভাল ভাল খাদ্য দিয়াছেন; যতীনবাবু একদিন তাঁহার স্ত্রী চিন্ময়ী দেবীর হার নিয়া আমার হাতে দিয়া বলেন, "মিত্র সাহেবকে দেখাইয়া এই হার বারীনকে দিবেন। ইহার দ্বারা আমি যে খরচা করিয়াছি তাহার পূরণ হইবে।" মিত্রসাহেব তাহা শুনিয়া চটিয়া যান এবং আমাকে বলেন, "এই গহনা কেন নিলে? বারীন কি নিজে খায় নাই, যতীন কি একলাই খাইয়াছে?"

ঝগড়ার ফলে সার্কুলার রোডের আখড়া উঠিয়া যায়। যতীনবাবু দেশে চলিয়া যান। যখন তিনি কলিকাতায় আসিতেন আমার কাছে থাকিতেন। মিত্র সাহেব আমাকে বলেন, 'দলাদলির কথা শুনিসনে, সব জিনিস তোর কাছে রাখ (যতীনবাবুর আখড়ায় ঘোড়াটা সতীশ বাবুর কাছে থাকিত), যতীনকে আশ্রয় দিবি।' ইতিপূর্ব্বে বেলুড়মঠে, স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি উৎসবে আমার সহিত আত্মোন্নতি সমিতির সভ্যদের আলাপ হয়।

ইহার পর, জেনেরাল এসেমব্লী কলেজ হইতে তারকনাথ দাস, সতীশ সেনগুপ্ত প্রভৃতিকে দলে সংগ্রহ করি। এই সময়ে রামবাগানে

একটি আখড়া স্থাপিত হয়, ইহার নাম ছিল United Friends Club. জোড়াসাঁকোর রাধিকা মোহন রায় ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন (এই ক্লাব উপস্থিত গিরিশ পার্কে অবস্থিত আছে)। নারিকেল ডাঙ্গার ওস্তাদ পাঁচু খলিফা এই আখডায় ছোরা, লাঠিখেলা প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন।

ইতিমধ্যে অরবিন্দ যখন দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আসেন তৎকালে একদিন মিত্র, সুরেন্দ্র ঠাকুর ও অরবিন্দবাবু আমার বাড়ী আসেন কিন্তু আমাকে বাডী পান না। আমাকে না পাইয়া বাবাকে বলিয়া যান যে অরবিন্দ আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা করা দরকার। পরে পি. মিত্রের বাডীতে যাইলে তিনি বলেন, যতীন বাবুর যে ক্লাবটা উঠিয়া গিয়াছে তাহা revive (পুনঃস্থাপন) করিতে হইবে ইহাই সকলকার ইচ্ছা। এতৎ অনুযায়ী নলিনী মিত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার বাডীর কাছে নন্দন বাগান (?) মাঠে Boxing club খুলিলাম। তথায় একদিন ঘোড়া হইতে পডিয়া আমার পায়ে চোট লাগে (গ্রন্থকার সেই সময়ে দেবব্রত বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। তথায় সতীশবাবু আনীত হন এবং লেখক সতীশের এক বন্ধু ডাক্তারকে আনিবার জন্য যান, কিন্তু তিনি call প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দাও)।

যতীন বাবুর কথায় প্রত্যাবর্তন করা যাউক। পরে তিনি সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি সোহম্ স্বামীর কাছ হইতে সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। সোহম্ স্বামীর পূর্ব্ব নাম ছিল শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি সার্কাসে বাঘের সহিত লডিতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে, যাহাতে ব্যায়াম নীতি দেশে প্রচলিত হয় তাহার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন (ঢাকায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকারের সঙ্গে যখন পার্শ্বনাথ বাবুর সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি গ্রন্থকারকে বলেন, শ্যামাকান্ত আমায় বলিয়া গিয়াছেন, "কতগুলি মানুষ প্রস্তুত কর")। সোহম্ স্বামীর গুরু ছিলেন তিব্বতী বাবা [শ্রীহট্টে জন্ম,

নাম বোধ হয় ছিল নবীন চক্রবর্ত্তী (?)। যতীনবাবু নিরালম্ব স্বামী নাম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় গ্রামে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। কলিকাতায় মৃত্যুর দিনও আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। তিনি অতি উচ্চ দরের লোক ছিলেন।

এক্ষণে দলের কথায় ফেরা যাউক। একই পার্টির আগভার নাম ছিল "অনুশীলন সমিতি" আর কাগজের নাম ছিল "যুগান্তর"। ইহা দলের বিভিন্ন বিভাগ মাত্র। ভূপেন ছিল অনুশীলন ও যুগান্তরের intermediary link [মধ্যবর্ত্তী সংযোগস্থল]।

স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণকালীন মিত্র সাহেব ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পুলিন দাস ও জুনিয়ার উকিল আনন্দ চক্রবর্ত্তী [পাকডাশী] এই দুইজনকে দলভুক্ত করেন। পরে তিনি অনুশীলনের কর্ম্মস্থল এই প্রকারে নির্দ্ধারিত করেন: কলকাতার অনুশীলন হইবে Head office [কেন্দ্রীয় স্থান]। কলিকাতার অধীনে ঢাকায় পুলিন দাসের একটা Head quarter থাকিবে। বরিশাল, ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী মালদহ পুলিন দাসের কর্ত্তৃত্বের বাহিরে থাকিবে।

একবার ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় Bamfield Fuller-কে বরিশাল হইতে তাড়াইবার জন্য Anti-Circular Society-র ছেলেদের পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাহারা পুলিশের কাছে মার খায়। এই কার্য্যে অশ্বিনী দত্ত মহাশয় তাঁহার বরকন্দাজ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই দল পুলিশের কাছে অপমানিত হইয়া চলিয়া আসে। তৎপর সুরেন্দ্রবাবুর অনুরোধে মিত্র সাহেব অনুশীলন হইতে বারজন খেলোয়াড পাঠান। তাহারা পুলিশকে লাঠিখেলায় হারায়। ইহাতে মুসলমান জনতা পুলিশকে মারিতে যায়। কিন্তু আমি ও বরিশাল কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহাদের বাধা প্রদান করি। মুসল-

মানেরা বলিল, "লাট সাহেবকে এখানে ঢুকিতে দিবনা আর অনুশীলন বাবুরা যাহা বলিবে তাহা করিব।" ফুলারের ষ্টীমার ঘাটে আসিলে, অনুশীলনের ছেলেরা চিৎকার করিয়া বলিল, "Fuller go back!" ফুলারকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

ভূপেনের জেলের পর, বিডন স্কোয়ার বাগানে পুলিশের সহিত জনসাধারণের মারামারি হয় (পুলিশ এক বক্তাকে বক্তৃতা করিতে দেয় নাই)। এই হাঙ্গামা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হয়; United Friends' club-এর ছেলেরা ইহা করিয়াছিল। পান্নালাল বসাক (বিডন রোডের বাড়ী) প্রথম পুলিশের উপর লাঠি চালান। তারপর, United Friends' Club, দর্জিপাড়া-অনুশীলন সমিতি যোগদান করিয়াছিল (এই মারামারি জাতীয় রূপ ধারণ করে), কারণ পুলিশ মার খাইয়া সন্ধ্যাবেলায় যখন রাস্তার ও ট্রামের লোকদের বেপরোয়া মারিতে থাকে ইহার প্রত্যুত্তর-স্বরূপ রাস্তাস্থিত বাড়ীসমূহের ছাদ হইতে বারনারীরা পর্য্যন্ত ইংরেজ সার্জেণ্ট ও পাহারাওয়ালাদের উপর থান ইট ছুড়িয়া তাহাদের জখম করে —গ্রন্থকার)।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দ "অনুশীলন সমিতি" বেআইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হইলে সব শাখা পৃথক হইয়া যায়। ইহার পর এই সমিতির নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া আমরা "Bengal Youngmen's Zamindary Co-operative Society নামকরণ করি। মিত্র মহাশয় জজ সারদাচরণ মিত্রকে এই নূতন সমিতির সভাপতি করিয়া দেন। ঢাকার অনুশীলন সমিতি পরে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। আলিপুর মামলার পর "আত্মোন্নতি সমিতি" ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

ঢাকার অনুশীলন সমিতি বাহ্‌রার ডাকাইতির পর পুনরায় ডাকাইতি করে। ইহাতে প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় পুলিন দাসকে

এই প্রতিষ্ঠান হইতে তাড়াইয়া দেন। মিত্র মহাশয় ডাকাইতির বিপক্ষে ছিলেন।

আমাদের নূতন সমিতির কার্য্য দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট খুসি হয় এবং বলে, C. I. D. False (মিথ্যা) রিপোর্ট দিয়াছে। Imperial Government তোমাদের সম্বন্ধে একজন Russian detective নিযুক্ত করিয়া সন্তুষ্ট হয় যে, পুলিশের অভিযোগ মিথ্যা। ইহারা দেশের একটা military atmosphere create (সামরিক বাতাবরণ সৃষ্টি) করিয়া দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে।

যুদ্ধের (প্রথম যুদ্ধ—গ্রন্থকার) সময়ে ঢাকার অবনী প্রথমে প্রায় ১৩টি রিভলবার লুকাইয়া আমাকে দেন। ইনি আমেরিকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাকে প্রথমে একটা রিভলবার দেন; পরে তাহার সন্ধান দ্বারা আরও ১২টা আমি পাই। এই সময়ে আমরা অনেক রিভালবার পাই। আমরা চন্দননগরে শিশিরকুমার বসুর মারফৎ কতকগুলি অস্ত্র লুক্কায়িত করি। পরে ঢাকা, মৈমনসিংহ ও মালদহে বেশী পরিমাণে অস্ত্র যায়। আশুবাবু চারিদিকে এই সব মাল পাঠান। ঢাকায় মাল সব থেকে বেশী প্রেরিত হয়, তৎপর রঙ্গপুরে যায়।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যখন সর্ব্বদল এক হইয়া বৈপ্লবিক কার্য্য করিতে লাগিল, তখন কেবল পুলিন দাস (ঢাকার অনুশীলন) আমাদের সহিত যোগদান করে নাই। ইহার ফলে, মৈমনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের অনুশীলনের বিশিষ্ট কর্ম্মীরা কলিকাতায় আমাদের সহিত একযোগে কর্ম্ম করিতে লাগিল। খুলনা ও যশোহরের অনুশীলন বিশিষ্টভাবে ঢাকার দলের বিপক্ষে ছিল। নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বরিশালের অনুশীলন কলিকাতার সহিত একযোগে ছিল। আমরা ত্রিপুরাতে চাষের জমি

লইয়াছিলাম ; তথায় বারুদির জমিদার বংশের বরদাকান্ত নাগ* (ইনি লোকনাথ ব্রহ্মচারীর শিষ্য ছিলেন) চাষ বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাহায্য করিতেন। কিন্তু কলিকাতা হইতে পুলিশ আসিয়া আমাদের লোকদের বিপ্লবী বলিয়া গ্রেফতার করে। অথচ আমরা রীতিমত ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম লইয়া এই স্থানে কৃষিকর্ম্ম করিতাম। কিন্তু পুলিশ বলে "ইহা সতীশ বসুর বোমা ফ্যাক্টরী।"

কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশকে ফেরৎ দেন। আমরা চাষের experiment করিয়া তবে তথা হইতে চলিয়া যাই। এই জমিতে পরীক্ষার ফলে এক বিঘায় ৪০ মণ পর্য্যন্ত আউস ধান হইত। পুলিশের উৎপাতের পর, বরদা বাবুর কথায় ত্রিপুরায় আমাদের চাষ হইতে লাগিল ত্রিপুরার মহারাজা ও অধিবাসীরা আমাদের বহু সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কৃষি-কর্ম্মের উদ্দেশ্য ছিল, দেশে বৈজ্ঞানিক মতে দেশের চাষের production [উৎপাদন] করা। বরদাবাবু ত্রিপুরায় চাষ করিতে গিয়া মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর ত্রিপুরার কৃষিকর্ম্ম উঠিয়া যায়।

যুদ্ধের সময়, ঢাকার অনুশীলন ব্যতীত বাঙ্গলার সর্ব্ব কর্ম্মীই এক হইয়াছিল। কণ্টাইয়ের Relief work এর কার্য্যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের সহিত সহযোগিতা করেন। মাগুরার হীরালাল রায় মিত্র মহাশয়ের কাছে যতীন মুখোপাধ্যায়কে লইয়া আসেন। হীরালালবাবু আমাদের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন।

---

*তারানাথ রায়চৌধুরী প্রথমে ইঁহাকে গ্রন্থকারের সহিত আলাপ করাইয়া দেন। তৎপর একদিন, গ্রন্থকার সতীশ বসুর সমভি-ব্যাহারে মিত্র মহাশয়ের কাছে তাঁহাকে লইয়া যান। শুনিয়াছি পরে তিনি মিত্র মহাশয় দ্বারা দীক্ষিত হন।

যুদ্ধের সময় আমরা arms smuggling [গুপ্তভাবে অস্ত্রসংগ্রহ] করিয়াছি। আমাদের সঙ্গে ইন্দ্রনাথ নন্দী, সতীশ মুখোপাধ্যায় * প্রভৃতি ছিলেন। আমরা প্রত্যেক জেলায় অনুশীলন এবং তাহার বাহিরের কর্মীদের এই মাল দিতাম। কর্মী হইলেই তাহাকে আমরা মাল দিতাম। মাল দিবার পর, কর্মীদের নিকট বুয়ার যুদ্ধের কয়েদীদের দ্বারা লিখিত pamphlet [পুস্তিকা] আমরা distribute [বিতরণ] করিতাম। এই পুস্তিকাতে গোরিলা (gucrilla যুদ্ধ কি করিয়া করিতে হয় তাহা বিবৃত আছে। ছেলেরা training পাইয়া excursion এ যাইত। যুদ্ধের সময়ে কেবল কর্মীদের সস্তায় মাল প্রদত্ত হইয়াছে।

যুদ্ধাবসানের পর, গভর্ণমেণ্ট চারিদিকে search [অনুসন্ধান] করিতে আরম্ভ করে। সেই সময়ে কর্মীরা সব মাল পুকুর, নদী বা সাগরে ভাসাইয়া দেয়। তৎপর সকলে চুপচাপ থাকে। ইহার পর, All India Religious Conference-এ আমরা ৫০০ স্বেচ্ছাসেবক প্রদান করি। এই সকল যুবক, ছাত্র বা চাকরীজীবীদের পুত্র ছিলেন। তৎপর, আমরা সুন্দরবনে কৃষিকর্মে লাগিয়া যাই। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমরা Zamindary Co-operative Society-তে কার্য্য আরম্ভ করি। এক্ষণে এই কমিটি একটা in-efficient Committee-র হাতে আছে।

৯১ বেচুচাটুয্যে ষ্ট্রীট।
কলিকাতা
১৭।১১।৪৭ (স্বাক্ষর) শ্রীসতীশ বসু

* ইনি রডা কোম্পানীর অস্ত্র ডাকাইতির অন্যতম। পরে সাধু হইয়া ডিব্রুগড়ের মহাত্মা নামে রক্ষা পান।

পরিশিষ্ট—গ

বৈপ্লবিক সমিতির প্রারম্ভ কালের ইতিহাস

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বিবৃতি

১৯০২ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ বরোদা হইতে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুপ্ত-সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলায় পাঠান। এই উদ্যমের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা আনয়ন করা। তৎপর, কলিকাতায় ১০৮-এ বা বি আপার সার্কুলার রোডে একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া যতীনবাবু প্রথম প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ স্থানে কয়েক দিন থাকার পর তিনি আড়বেলিয়া যান। [১] তথায় সুরেন্দ্রনাথ সেনের কাছে থাকেন। তিনি তথাকার হেডমাষ্টার ছিলেন। তথায় যতীন বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার কাছে শুনিলাম, অরবিন্দ শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন। যতীন কি উদ্দেশ্যে আড়বেলিয়ায় আসিয়াছিলেন তাহাও আমাকে বলিলেন। যতীনবাবুর কথামত কলিকাতায় আসিলে অরবিন্দের পরিবর্ত্তে তাঁহার ভ্রাতা বারীনের সঙ্গে দেখা হয়। তাহার একদিন মাত্র পূর্ব্বেই কলিকাতায় আসিয়া বারীন ঐ বাসায় উঠিয়াছেন। বারীনের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় স্থির হয় যে ঐ দিন থেকেই আমি যেন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সঙ্গে কর্ম্মে যোগদান করি। সেই সময় থেকে জেল যাওয়া পর্য্যন্ত আমি এই কর্ম্মে লিপ্ত ছিলাম। আমার প্রথমে যাবজ্জীবনের জন্য দীপান্তররূপ কারাদণ্ড (Transportation

---

১। অরবিন্দের মামা (মাতার খুড়তুত ভাই) জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর সহিত এই বিষয়ে অরবিন্দের পূর্ব্বে আলাপ হইয়াছিল। সেই সূত্রেই যতীনবাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করেন। শেষোক্ত আড়বেলিয়ার হেড্ মাষ্টার সুরেন্দ্রনাথ সেনের বন্ধু ছিলেন। বোধ হয় জ্ঞানবাবুর সহিত কথাবার্ত্তার পর যতীনবাবু আড়বেলিয়া যান।

for life) হয়, তৎপর আপীলে Transportation for seven years [সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর] হয়।

কলিকাতায় যতীন বাবুর বাসার সংলগ্ন ভূমিতে একটি আখড়া স্থাপন করা হয়। সাঁতার খেলা, লাঠি খেলা, ঘোড়ায় চড়া, মুষ্টি যুদ্ধ (Boxing) শিক্ষা, সাইকেল চড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহাই ছিল আমাদের বাহিরের আবরণ। এই সঙ্গে বিশ্বস্ত ছেলেদের গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনির জীবনী [২] এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক আন্দোলন কি করিয়া পরিচালিত হইয়াছিল তাহার বিষয়ে বক্তৃতা হইত। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পি. মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রধানতঃ বক্তৃতা দিতেন। বই পড়িয়া সব বুঝাইয়া দেওয়া হইত।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে পি. মিত্র, সরলাদেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি. আর. দাস প্রভৃতি আমাদের মাথার উপর ছিলেন। পরে সরলাদেবীর কাছে কেহ যাইতেন না।

কর্মের জন্য প্রথম Fund (অর্থ) মিত্র, দাস প্রভৃতি চাঁদা করিয়া টাকা দেন। অরবিন্দ প্রথম থেকেই মোটা টাকা দিতেন। আসলে অরবিন্দের টাকাতেই চলিত। সুরেন্দ্রনাথ হালদার একটি ছোট ঘোড়া দান করিয়াছিলেন। ইহা পরে সতীশ বসুর কাছে দেওয়া হইয়াছিল। বড় ঘোড়াটার টাকাও দানে পাওয়া গিয়াছিল। আমি বিভিন্ন লোকের কাছ হইতে চাঁদা আদায় করিতাম; তজ্জন্য সি. আর. দাসের কাছ হইতেও চাঁদা আদায় করিতাম।

২। এই সময়ে যতীনবাবু "ভারতী" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে "ইতালীয় বিপ্লব" বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।

আমি জাপানী ওকাকুরার কথা বিশেষ কিছু জানিতাম না। বারীনের সঙ্গে যতীনবাবুর মনান্তর হওয়ায় আমি ও বারীন মদন মিত্রের লেনে উঠিয়া যাই। আখড়া তৎকালে ভাঙ্গিয়া যায়। যতীনবাবু পরে সে বাড়ী ছাড়িয়া দেন। কিছুদিন বাদে যতীনবাবু ঝামাপুকুর লেনে এক মেসে বাসা নেন। ইহার কিয়ৎদিন বাদে অরবিন্দ কলিকাতায় দ্বিতীয়বার আসেন এবং আমাকে ও বারীনকে লইয়া যতীনবাবুর বাসায় যান এবং আমাদের ঝগড়া মিটাইয়া দেন। আমরা আলাদা হইলেও বারীন ও আমার এবং যতীনবাবুর খরচা অরবিন্দ বরাবর দিয়া যাইতেন। ওই স্থানে পুনরায় আমাদের মিলন হয়। তথায় Planchette লইয়া ভূত ডাকা হইত [৩]; তখন আবার কার্য্য আরম্ভ হইল। আমরা কিন্তু আর আখড়ার দিকে যাইতাম না। সতীশ বসুকে এই ভার দেওয়া হয়। তিনি বিভিন্ন আখড়া স্থাপন করিতে লাগিলেন।

৩। অরবিন্দ বর্ষাঋতুতে পুনরায় কলিকাতায় আসেন। ঐ বাসায় একবার বৃষ্টির সময়ে বৈকালে গ্রন্থকার যাইয়া দেখেন অরবিন্দ, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, বারীন, যতীনবাবু প্রভৃতি ভূত ডাকিতেছেন। Planchetteএ (প্লানচেটে) রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র, যতীনবাবুর মৃতভ্রাতা প্রভৃতির ভূত আসে। হেমবাবুর ভূত চারি ছত্র কবিতা লেখে। তাহার প্রথম ছত্র আমার মনে আছে—"হবে কি ভারত স্বাধীন……"। রামমোহনের ভূত বিপ্লববিষয়ে বলিল, "ফল শুভ, কর্ম্ম কর"। কিন্তু বিবেকানন্দের বেলায় ভূত পরাস্ত হয়। তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, "এইস্থলে তাহার কোন আত্মীয় আছেন কি না তাহা বলুন" তখন ভূত জবাব দিতে পারে নাই। বিদ্যাভূষণ, প্লানচেটের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া উঠিয়া গেলেন। অরবিন্দের সহিত লেখকের এই প্রথম পরিচয়।

ইহার পর, সিমলা ষ্ট্রীটে বাসা লওয়া হয়। অরবিন্দ, বারীন ও আমি তথায় থাকিতাম। তৎপর গ্রে ষ্ট্রীটে বাসা স্থাপন হয় (একটা আস্তাবলের উপরে একটা বড ঘর—লেখক)। তথায় অরবিন্দ, বারীন, যতীনবাবু ও আমি থাকিতাম। পরে, নিখিল ভৌমিক (ভবানন্দ স্বামী) তথায় থাকিতেন। [৪] এইসঙ্গে কুলকর্ণী, যোশী নামক দুইজন মহারাষ্ট্রীয় যুবকও তথায় পরে থাকিতেন। এইস্থান হইতেই "No Compromise" নামক Pamphlet প্রথম বাহির হয়। অরবিন্দই এই পুস্তিকার লেখক ছিলেন [৫]।

"বঙ্গ-ভঙ্গ" আন্দোলনের সময়ে "সোনার বাঙ্গলা" নামক ইস্তাহার বাহির হয়। আমি "No Compromise" নামক Pamphlet লইয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যাই। তিনি সেটা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, এই রকম ইংরেজী কে লিখিয়াছেন, কোন বাঙ্গালী এই রকম লিখিতে পারেন না। আমি উত্তরে তখন অরবিন্দের পরিচয় তাঁহার কাছে দিলাম। আমি যখন সুরেন্দ্রবাবুকে আমাদের কথা বলি, তিনি চমকাইয়া উঠেন, একটি গুপ্তস্থানে গিয়া উভয়ের কথা হয়। তিনি বলেন, "বাবা

৪। লেখক শুনিয়াছিলেন নিখিলবাবু ইন্দ্রনাথ নন্দীর বিশিষ্ট বন্ধু হিসাবে দলের সহিত পরিচিত হন।

৫। এই পুস্তিকার তাড়াসমূহ ঐ স্থান হইতে সরাইবারকালে লেখক ও আর একজন লোক বসিয়াছিলেন। যতীনবাবু তথায় তাঁহাদের বলিলেন কেহ কেহ জানেন যে এই প্যামফ্লেট এইস্থান হইতে বাহির হইয়াছে, আপনারা কোন কথা বাহির করিবেন না।

এইসব তোমরা কর, ইহাতে তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমি যতদূর সম্ভব তোমাদের আর্থিক সাহায্য করিব কিন্তু তোমাদের এইকার্য্যে আমি যাইতে পারিব না। আমরা বুড়া হইয়া গিয়াছি, তোমরা Youngmen (যুব)। তোমরা ইহা কর"।

এই সময়ে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের কাছেও যাই। তিনি আমাদের খুব উৎসাহিত করেন। অশ্বিনীকুমার দত্তও উৎসাহিত করেন। তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় দেখা হয়। তিনি বলেন, আমরা এখন বুড়া হইয়া পড়িয়াছি, এখন আমাদের শক্তিতে কুলায় না। তোমরা এই গাছটাকে একবার নাড়া দিয়া দাও, যাহাতে পাখিগুলা কিচির মিচির করিয়া জাগিয়া উঠে অর্থাৎ যাহাতে দেশের লোকের ঘুম ভাঙ্গে।

আমি পি. মিত্রের কাছে লাঠিখেলা শিখিতে যাইতাম। পরে, মিত্রের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক থাকেনা। তিনি সতীশ ও পুলিন দাসকে লইয়াই থাকিতেন। তাঁহাদের তিনি বেশী Sup port (সাহায্য) করিতেন। তিনি আখড়া লইয়াই থাকিতেন।

পুনরায় যতীনবাবু আমাদের সঙ্গ হইতে আলাদা হইয়া যান, তাঁহার সঙ্গে মিলিত না।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে Party Conference হয়। বিভিন্ন জেলা হইতে সভ্যেরা আসেন। প্রত্যেকেই নিজের জেলার কার্য্যের Progress (উন্নতি) বিষয়ে সংবাদ পেশ করেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত স্থানেই পুনরায় Conference হয়। উদ্দেশ্য ছিল, পথ ও কর্ম্মপদ্ধতি বিষয় নির্দ্ধারিত করা।

উপরোক্ত কর্ম্মের সঙ্গে সংলগ্ন থাকা ব্যতীত, আমি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্র নাথ সেনের সহিত রাঁচি যাই এবং সেখানেশ্রীগণেশ চন্দ্র ঘোষের সহিত

পরিচয় হয়; এবং রাঁচিতে একটা Centre (কেন্দ্র) স্থাপিত হয়। [৬] গণেশ ঘোষ কটকে এবং উড়িষ্যায় বহু কার্য্য করেন।

আমার কটকে (১৯০৬ ?) যোগেশ ঘোষের সহিত আলাপ হয়। তিনি ভবানীপুরের যাদব ডাক্তারের পুত্র। তিনি তৎকালে দর্পণ স্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি তথায় অনেক কার্য্য করিয়াছেন।

"বোমা তৈরীর সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাহা দেখান হয় নাই। ইহা সত্য যে নারায়ণগড়ে Train wrecking করা হয়। আমার মনে হয়না যে মিশ্রী বাবু [৭] উত্তরপাড়ার রাজা প্যারী মোহনের পুত্র) চন্দননগরে বোমা ফেলিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন। মহারাজা সূর্য্যকান্ত আমাদের অর্থ সাহায্য করিতেন। আমার হাতেই তিনি টাকা দিয়াছেন। আমি গগন ঠাকুরের

৬। অনুমান ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তারানাথ রায়চৌধুরী এবং পরে ১৯০৬ সালে লেখক রাঁচি যান। অর্থাভাবে উভয়কে পদব্রজে পুরুলিয়া হইতে রাঁচি যাইতে হইয়াছিল। রাঁচিতে বৈদ্যনাথ বলিয়া একটি ছাত্র বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। তথায় অনেক বাঙ্গালী, বিহারী এবং মাড়োয়াড়ী যুবক দলভুক্ত হইয়াছিলেন।

৭। লেখকের মনে আছে বারীন একবার সিমুলতলায় গিয়া তাহা সুরেন্দ্রবাবুকে দেখান। তিনি দেখিয়া বলিলেন, 'এইবার ঠিক হইবে, বেটার মাথা এইবার ভাঙ্গিবে।" বোধহয় খালি খোলটা দেখান হইয়াছিল। কিন্তু বারীন ও লেখক যখন সিমুলতলায় যান তখন তাহাদের সঙ্গে কিছুই ছিল না যদিও বারীন এই বিষয়ে আলোচনা করিতেই গিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ লইয়া বাজারে কত আজগুবি সৃষ্টি হইয়াছে।

কাছ হইতে মাসে মাসে টাকা লইয়া আসিতাম। তিনি বলিতেন, হয় সুবোধ মল্লিক, না হয় অরবিন্দ না হয় অবিনাশ ভট্টাচার্য্য টাকার জন্য আসিবেন [৮]। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পরেও আমাদের অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, আমাদের জন্য রিভলভার যোগাইতেন।

অবিনাশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতি উচ্চ দরের লোক ছিলেন। তিনি সমস্ত বিষয়-আশয় এবং মুনসেফী চাকরী প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন দেশের কার্য্যের জন্য। তাঁহার সঙ্গে আমাদের কখনও অমিল হয় নাই।

"যুগান্তর" আমাদের দেশের কার্য্যের জন্য উৎসর্গীকৃত কাগজ ছিল। ইহা আমাদের বৈপ্লবিকদলের কাগজ ছিল। পার্টি-মেম্বার প্রকাশ মজুমদারের [৯] প্রেসে যুগান্তর প্রথম ছাপা হয়। তিন সপ্তাহ তথা হইতে কাগজ বাহির হয়। এই প্রেস কুমারটুলীতে ছিল। তার পর, যুগান্তরের নিজের প্রেস হয়। তখন আমার হাতে মাত্র পঞ্চাশ টাকা ছিল। প্রেসের নামটি "সাধনা প্রেস" ছিল। আমার নামেই প্রেসের স্বত্বাধিকারিত্ব এবং আমার নামেই প্রেসটা ক্রয় করা হয়। বসন্ত

৮। যুগান্তরের প্রথমাবস্থায় গনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ হইতে তারানাথ রায়চৌধুরী অনুমান পঞ্চাশ টাকা কাগজের জন্য আনিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "মনে করুন ইহা কুড়াইয়া পাইয়াছেন।" অবিনাশকেও তদনুরূপ কথা বলিতেন।

৯। প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম. এ. প্রথমে কটকে মাষ্টার ছিলেন। তথায় তিনি দলভুক্ত হন। পরে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে কিছু দিন শিক্ষকতা করেন। শেষে তাহা ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি কুমারটুলির কবিরাজদের আত্মীয়।

ভট্টাচার্য্য [১০] ভরত শিরোমণির পৌত্র প্রথম প্রিন্টার হন। কাগজ বাহির করিবার জন্য কত টাকা উঠিয়াছিল তাহা মনে নাই।

অবিনাশ চক্রবর্ত্তী প্রথম প্রথম টাকা দিয়া আমাদের সাহায্য করিতেন। প্রেস চালান এবং কর্ম্মীদের খাই-খরচার-জন্য মাসে মাসে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা দুই তিন মাস তিনি দিয়াছিলেন। আমার বোধহয় যে Hand machine Press-এর দাম পরিশোধ করা হয় নাই। প্রকাশ বাবুর কাছ হইতে ধারে প্রথমে প্রেসটা কেনা হয়। মেদিনীপুরের জমিদার নন্দ ১০০০ টাকা দিতেন [১১]

পরে আমাদের কার্য্যালয় যখন বৌবাজার ষ্ট্রীটে উঠিয়া যায় তখন Electric machine Press কেনা হয়। তখন যুগান্তরের অনেক টাকা আমদানী হইতেছে। ভোলানাথ দত্তের দোকান হইতে কাগজ কেনা হইত। বাজারে কোন দেনা পড়ে নাই।

১০। বসন্তের দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস হইয়াছিল? প্রেসিডেন্সি জেলে আনীত হইবার পর জেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাহার Truss খুলিয়া লয় এবং বড় মোট ঘাড়ে করিয়া উপরে লইবার হুকুম দেয়। ফলে সে Orchitis রোগে মরণাপন্ন হয়। এই সময়ে ঐ জেলে লেখকও ছিলেন। ব্যারামের ফলে তাহার বিকার হয় এবং যেসব মহান উক্তি তাহার মুখ হইতে বাহির হয় তাহা শুনিয়া লেখক চমকিত হন। বিপিন বাবুও তখন সেই জেলে ছিলেন। তিনি লেখকের কাছ হইতে ঐ সব উক্তির কথা শুনিয়া বলেন, "বসন্ত দেবতা"।

১১। এই টাকা বাৎসরিক চাঁদা হিসাবে আসিত। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শীতকালে দ্বিতীয়বার এই টাকা পাওয়া গেল। নিখিল মৌলিক এবং লেখক সুবোধ মল্লিকের হস্তে উহা জমা দিয়া আসেন। সুবোধ বাবু দলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আমাদের বার বার বলিতেন, "তোমরা কাঁচা sedition কেন লেখ"। তৎপর, একবার ভূপেনের হাতে "সন্ধ্যার" সম্পাদকীয় ভার দিয়া উপাধ্যায় রাজসাহীতে যান [১২]। এই উপলক্ষে ভূপেন বলিলেন, এইবার সুযোগ পাইয়াছি, আমি কাঁচা sedition লিখিব। সেই সময় তদনুরূপ সম্পাদকীয় প্রবন্ধও প্রকাশিত হয় [১৩]

যুগান্তর কাগজের উদ্যোক্তা ছিলেন বারীন, ভূপেন ও আমি। হরিশচন্দ্র ঘোষও এই সঙ্গে খাটিয়াছিলেন। যুগান্তর বাহির হইবার পর, কিছুদিন বাদে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি তাঁহার বাসা হইতে যুগান্তর আফিসে লইয়া আসি। তাঁহার সহিত আমার পত্রালাপের দ্বারা পরিচয় হওয়ার পর তাঁহাকে আফিসে লইয়া আসি [১৪]। আমাদের সঙ্গে তাঁহাকে আন্দামানে যাইতে হইয়াছিল।

১২। একটা মকদ্দমা উপলক্ষে তিনি তথায় যান এবং ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বলেন, পূর্ব্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ওয়াহাবী আন্দোলনে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাই নাকি পুলিশের তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার পর কিন্তু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। —লেখক

১৩। এই ব্যাপার লইয়া ৺সুরেশ সমাজপতি লেখককে বলেন, 'ইহা আপনার লেখা। আমরা পুরাতন সাহিত্যিক, আমরা জানি না, কে কি ধরণের লেখেন! এই সময়ে উপাধ্যায়ের সঙ্গে এই সব লোকের মনোমালিন্য ছিল। —লেখক।

১৪। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যুগান্তরের কার্য্যোপলক্ষে লেখক পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উপেন বাবুকে লেখক যুগান্তর আফিসে দেখেন। **Bandemataram** পত্রিকায় তিনি লেখকরূপে ছিলেন।

ভুপেনের জেলের পর বসন্ত জেলে যায় [১৫] ; তাহার পর বৈকুণ্ঠ আচার্য্য জেলে যান। সঞ্জীবনীর সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র বৈকুণ্ঠকে আমাদের কাছে কার্যের জন্য পাঠান। তারপর, নিখিল মৌলিক প্রভৃতির হস্তে যুগান্তরের ভার দিয়া "নবশক্তি" কাগজ চালাইবার জন্য আমি যাই। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কাগজ চালাইতে না পারিয়া আমাকে তাহার ভার লইবার জন্য অনুরোধ করেন [১৬]। আমি দৈনিক "নবশক্তি" সংবাদপত্রের ভার লই। তিনি কাগজে declaration দিয়াছিলেন, "অতঃপর অবিনাশ ভট্টাচার্য্য এই কাগজ চালাইবেন"। এই কাগজের ৪৮ গ্রে ষ্ট্রীটের আফিসে আমি, অরবিন্দ ও তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার ভগ্নী সরোজিনী এবং শৈলেন বসু ২৩ স্কট লেন হইতে উঠিয়া আসিলাম ; তাহার দুইদিন আগে ৩০শে এপ্রিল মোজাফরপুরে "বোমা" পড়ে এবং ২রা মে আমি, অরবিন্দ ও শৈলেন গ্রে ষ্ট্রীটের বাসা হইতে Arrested (ধৃত) হইলাম। তাহার পর "নবশক্তি" আর বাহির হইতে পারিল না। আমি আন্দামানে যাই।

আমি আমার জ্যাঠতুত ভাই স্বর্ণেন্দু (ডাক নাম "টেনা") এবং শৈলেন্দ্র বসুকে যুগান্তর আফিসে কার্য্যের জন্য লইয়া আসি। ইহারা আড়-বেলিয়ার লোক। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের (M. N. Roy) পিতাকে আমরা মামা বলিতাম। তাহার সহিত এই সম্পর্কেই সে আমার

১৫। ইনি মৈমনসিংহ নিবাসী। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইহার সহিত উক্ত স্থানে লেখকের সাক্ষাৎ হয়। গভর্ণমেন্ট তাঁহার সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করায় তিনি দুঃস্থ অবস্থায় দিন কাটাইয়াছেন।

১৬। ইহার বহুপূর্ব্বে দেবব্রত বসু নবশক্তির সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

গ্রামসম্পর্কে মামাত ভাই হয়। তাহাকে আমিই দলে টানিয়া আনি। সে বাল্যকালে কিছুদিন আড়বেলিয়াতে ছিল। সে আমাদের অমতে চাঙ্গড়ী পোতা ডাকাইতিতে যোগদান করিয়াছিল।

যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত দ্বিতীয়বার পৃথক হওয়ার পর, তাঁহার সহিত আমাদের আর কোন যোগাযোগ হয় নাই। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে আমাদের মকদ্দমায় জড়াইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণ না থাকায় খালাস পান।

পি. মিত্র আমাদের মকদ্দমায় খুব খাটিয়াছিলেন। তিনি আমাদের মকদ্দমায় একজন Lawyer হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। Norton যখন আমাদের Notorious বলিয়াছিল তিনি তাহাকে এই কথা তুলিয়া নিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

সিঁথি

১০ই নভেম্বর, ১৯৪৭। স্বাক্ষর—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আত্মোন্নতি সমিতির ইতিহাস
শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দীর বিবৃতি

১৯০৩ সালের পূর্ব্বে এই সমিতি সংগঠিত হয়। রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ মুখার্জ্জী, ভুবনেশ্বর সেন—এই কয়জনে উত্তোগী হইয়া সমিতির পত্তন করেন। ইহাদের সহিত স্বামীজীর কোন সম্বন্ধ ছিল না। ইহারা তাঁহার সম্পর্কে আসেন নাই। সতীশ খেলাচন্দ্র ইনসটিটুশানে সমিতির আলোচনা ক্লাস বসিত। স্বাধীনতার সঙ্গে দেশের মঙ্গল হউক, এই ছিল আলোচ্য বিষয়। স্বাধীনতার উপর বেশী জোর তখন দেওয়া হইত না। তরুণেরা নিজেরাই উত্তোগী হইয়া এই সমিতি করিয়াছিলেন। বিশ-ত্রিশজন সভ্য হইয়াছিলেন। সকলেই ছাত্র ছিলেন। স্কুলের শিক্ষকেরাও আলোচনায় যোগদান করিতেন। তৎপর আমি আরও দুইজন ঐ সমিতিতে যোগদান করি। আমি boxer বলাই চাটুজ্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরাখাল দাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ হইতে বৈপ্লবিক Motive ও Method প্রাপ্ত হই। তিনি দেশের স্বাধীনতার আদর্শ আমাকে দেন। আমি পরের লোক (Next man) যতীন্দ্রনাথ হালদারের কাছ হইতে একটি সমিতির সংবাদ পাই। তিনি বলেন, বর্দ্ধমান ও শান্তিপুরে একটি দল আছে; যতীন হালদার এই দলকে আমার কথা বলেন। তাঁহারা বলিলেন, কলিকাতার এই প্রকারের একটি দল আছে তাহার সংস্পর্শে ইন্দ্রবাবু আসুন। এই শান্তিপুরের দলের ভূপতি গোস্বামী ঐ আত্মোন্নতি সমিতির সংবাদ আমায় দেন। তৎপর, যতীন্দ্রনাথ হালদার, রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, আমি—এই তিনজন আত্মোন্নতি সমিতিতে যোগদান করিলাম।

এই সময়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মিত্রজীদের সহিত সমিতির

ছেলেদের প্রায়ই মারামারি হইত। এইসময়ে ফিরিঙ্গীদের Overbearing attitude আমরা বড়ই অনুভব (Feel) করিতাম। ইহাতে আমাদের পরাধীনতার অপমান হৃদয়েঅনুভব করিতে থাকি। এইকালে হেম মল্লিক মারামারির সময়ে তাঁহার বাড়ী আশ্রয়রূপে ব্যবহার করিতে দেন। তিনি একদল ছেলেকে উপযুক্ত নাগরিক আদর্শে গঠিত করিতে চাহিতেন। তিনি চাহিতেন যে একদল ছেলে Civic duty, সাহস প্রভৃতি দ্বারা পুষ্ট হইয়া গঠিত হয়। স্বামীজির দেহত্যাগের পর Vivekananda Society স্থাপিত হয়। মানিকতলা ষ্ট্রীটে এই সমিতির আফিস থাকে। এই বাড়ীর উল্টাদিকে মানিক দত্তের বাড়ীতে "অনুশীলন সমিতির" সভ্যেরা জমা হইতেন। এই সময়ে তাঁহাদের সহিত আমার আলাপ হয়। তাহাদের নামটা আমায় আকৃষ্ট করে।

এই সময়ে হেমবাবু যখন উপরোক্ত প্রকারের যুবকদল সৃষ্ট করিতে চান, তখন আমি তাঁহাকে অনুশীলনের কথা বলি। ইহাতে তিনি ছয়শত যুবককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভুরী ভোজন প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠান তাঁহার বাড়ীতে হয়। সেই সময়ে অনুশীলনের একটা rally হেমবাবুর বাড়ী হয় এবং অনুশীলন উৎসাহ প্রাপ্ত হয়। এই সময় থেকে হেমবাবু অনুশীলনের পৃষ্ঠপোষক সাহায্যদাতা হন।

তৎপর নিখিল মৌলিকের (ভবানন্দ স্বামী) সঙ্গে আমার আলাপ হয়। শুনিয়াছিলাম, ইনি পরেশ লাহিড়ী (মহাদেবানন্দ স্বামী) এবং ক্ষিতিমোহন সেন (বর্ত্তমান শান্তিনিকেতনের আচার্য) একটি বৃহৎ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই দলের নিখিলদা'র সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। তাঁহারই পরামর্শানুযায়ী আমরা ব্যবসাক্ষেত্রে নামি এবং "ছাত্র-ভাণ্ডার" স্থাপন করি।

ইহার পূর্ব্বে রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ হইতে বৈপ্লবিক সমিতির

সংবাদ পাই। তখন বৈপ্লবিক সমিতির আখড়া এবং কর্ম্মীদের বাসস্থান আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত ছিল। তথায় রঘুনাথ আমাকে লইয়া যান। এই প্রকারে আত্মোন্নতি সমিতির রঘুনাথ, আমি ও জীবন মুখোপাধ্যায়, প্রথমে বৈপ্লবিক সমিতিতে যাই। পরে ক্রমে ক্রমে আত্মোন্নতি সমিতির সর্ব্ব সভ্যই বৈপ্লবিক সমিতিতে যাইতে থাকেন। এই প্রকারে আত্মোন্নতি সমিতির সহিত বৈপ্লবিক সমিতির যোগাযোগ হয়। এতৎসম্বন্ধে কোন বুঝাপড়া ছিল না। যতীন বন্দোপাধ্যায় উপযুক্ত লোক দেখিলেই কার্যে নিযুক্ত করিতেন। এই উপায়ে আমরা বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য হই। বাস্তবপক্ষে "আত্মোন্নতি সমিতি" বৈপ্লবিক সমিতিতে সম্পূর্ণরূপে যোগদান করিয়া একীভূত হইয়াছিল অথচ আত্মোন্নতি সমিতি বাহিরে নিজের অস্তিত্বও রাখিয়াছিল! এই স্থলে বক্তব্য যে আমি বৈপ্লবিক সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করি নাই অথচ তাহার নকল (copy) আমি লইয়া আসি। জীবন, রঘুনাথ প্রভৃতি প্রতিজ্ঞাপত্রে oath লইয়াছিলেন। এতদ্বারাই তাঁহারা সম্পূর্ণ ভাবে বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন।

বিপিন গাঙ্গুলী, প্রভাস দে প্রভৃতি তখন Junior সভ্য ছিলেন। প্রভাসকে আমিই আত্মোন্নতিতে প্রবেশ করাই। পবিত্র, মনি মিত্র প্রভৃতি আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁহারা যতীন বাবুর কাছে যান। পবিত্র বৈপ্লবিক দলে প্রবেশ করিয়াছিল।

একটা ব্যবসায় কেন্দ্র করিয়া তাহার আবরণে বৈপ্লবিক কার্য্য চালাইবার পরামর্শ নিখিল বাবু আমাকে দেন। ইহার পূর্ব্বে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, ভগ্নী নিবেদিতা, অধ্যাপক জগদীশ বসু, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার প্রভৃতি বুদ্ধগয়ায় যান। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে যাই। রবিবাবু প্রভৃতি বুদ্ধগয়ার মোহান্তকে বলিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই

একাংশ, এইজন্য বুদ্ধগয়ার মালিকানা দখল তুমি ত্যাগ করিও না। এই সময়ে আমার সহিত পাটনার বাবু পুনিত লালের আলাপ হয়। তিনি ব'লেন, তাঁহাদের যৌবনে তাঁহারা বিহারে একটি বৈপ্লবিকদল গঠন করিয়াছিলেন। পুনিতবাবু Lahiri Company-র পাটনাস্থ এজেন্ট ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার সহিত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের আলাপ আমি করাইয়াদিই। এইসময়ে Magic Lantern দিয়া আমরা স্বদেশীভাব প্রচার করিতেছিলাম। বুদ্ধ গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর "ছাত্র-ভাণ্ডার" স্থাপিত হয়। ছাত্র-ভাণ্ডার বৈপ্লবিক কর্ম্মীদের একটা আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। আমার অনুরোধে নিখিলবাবু, হরিশ শিকদার, প্রভৃতি মিলিয়া একটা Fund সংগ্রহ করি। সুবোধ মল্লিক তাহার Head Collector ছিলেন। এই Fund আমরা কর্ম্মীদের ব্যয়ের জন্য দিতাম। ছাত্র-ভাণ্ডার বর্ত্তমানের Seal's Mansion কলেজ ষ্ট্রীটে স্থাপিত হয়। তৎপর তাহার উল্টা J. K. Sharma-র দোকানের পার্শ্বে উঠি‍য়া যায়। তৎপর হ্যারিসন রোডে দুইস্থানে উঠিয়া যায়। পবিত্র ও নিখিলবাবু ইহার ভার নেন। ছাত্রভাণ্ডারের প্রধান কর্ম্মী ছিলেন পবিত্র দত্ত। এই ভাণ্ডারের আবরণে বৈপ্লবিক কর্ম্ম ছিল। ছাত্র-ভাণ্ডারের ছাতের উপরে সখারামবাবু ক্লাশ করিতেন। আলিপুর বোমকেসের পর, পবিত্র দত্তকে পুলিশ Howrah gang case-এ ধৃত করে; এবং বলিল, যে ছাত্রভাণ্ডারের ম্যানেজার হইবে তাহাকে ধরিব। সেই শুনিয়া রঘুনাথ ও আমি যে পরিমাণ টাকা দিয়াছিলাম তজ্জন্য সেই পরিমাণের মাল লুকাইয়া সরাইয়া ফেলিলাম। এই প্রকারে ছাত্র-ভাণ্ডার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গুজব উঠিল পুলিশ দোকান লুটাইয়াছে। আমি ছাত্র-ভাণ্ডারের আর কোন সংবাদ রাখি না।

স্বদেশীযুগে বাঙ্গলায় সর্ব্বত্র যে Riot হয়, সেই সময়ে অরবিন্দ

দুইশত টাকা দিয়া আমাকেপূর্ব্ববঙ্গেরলোকদের সাহায্যার্থে যাইবার ভাড়া দিলেন। ছয়জন লোককে (১ সুধীর সরকার, ২ নরেন বসু, ৩ শিশির ঘোষ, ৪ বিপিন গাঙ্গুলী, ৫ প্রভাস দে, ৬ হরিশ শিকদারকে, লইয়া আমি মৈমনসিংহ, জামালপুরে যাই। প্রভাস ও হরিশ মৈমনসিংহ সহরে রহিল। আমরা Riot উপলক্ষে ধৃত হই। আমরা আত্মরক্ষার্থ আঠারটা গুলি দাগি। মকদ্দমা চলিল না, কারণ পুলিশ ২৭জন লোককে খাড়া করিয়াও Identify করিতে পারিল না, আমরা খালাস পাই। মজার কথা, এই জামালপুর জেলের Superintendent ডাক্তার আমাদের দলের লোক ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি ভূপেন দত্তের শিষ্য, আপনাদের যাহা প্রয়োজন আমি তাহার সুবিধা করিয়া দিব।"

জামালপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর বীরেন্দ্রনাথ সেন (সুশীল সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) আমাকে বলিলেন, "কালী-মায়ের বোমা" তিনটা আপনার কাছে রাখিলাম; কাজের সময় প্রয়োজন হইবে। বারীন ঘোষের ধরা পড়িবার পর আমার মাতুল বলিলেন, 'তুমি এই আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া ব্যবহার কর, তোমার কাছের মাল আমায় দাও। আমি কয়দিন পরে, বর্ত্তমানের হাঙ্গামা মিটিলে তোমায় ফিরাইয়া দিব।" তখন, আমার পিতামাতাকে বলিলাম, "আমি এই বোমার জন্য দায়ী, কিন্তু তাঁহার সংসারের পোষ্য অনেক। কাজেই তাঁহার এ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত নহে। আমি ইহার জন্য দায়ী।" ইহাতে মা বলিলেন, ' একদিকে ভাই একদিকে ছেলে ; আমি কি বলিব" । ইহার পর, আমি এই তিনটি বোমা নষ্ট করিবার জন্য বাঁহাতে ধরিয়া ডানহাত দিয়া বাক্স খুলিতেছিলাম। সেই সময়ে নষ্ট করিবার কালে একটি ফাটিয়া যায়। তাহাতে আমার বাঁ হাতটি উড়িয়া Lahiri company-র ছাদে পড়ে। সেই বাড়ীর ১০।১৫জন লোক ছাদে গিয়া দেখিতে থাকে—কি, ব্যাপার

আমার মা তাঁহাদের অনুরোধ করেন, তাঁহারা যেন কিছু প্রকাশ না করেন। তাহাতে Lahiri Co-র ডাক্তার চারুব্রত রায় প্রত্যেক কর্ম্মচারী ও চাকরকে খরচা দিয়া দেশে পৌছাইয়া দেন। তাহার একমাস আঠার দিন বাদ নরেন গোস্বামীর একরারের (Confession) পর পুলিশ আমাকে ধৃত করে।

আমার জেলের খবর এই : জেলে বারীন একটা Dramatic effect করিয়া জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিল। ইহাতে হেমদা' ও সত্যেন বসু বলেন, "ইহা নিষ্ফল হইবে, বরং গোস্বামীকে ইহ-জগৎ হইতে সরাইয়া দাও।" এই plot-এ আমার কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল সম্পর্ক এই, নরেন গোস্বামীকে গুলি করার আগের দিন জেল-কর্ত্তৃপক্ষ আমার মধ্যম ভ্রাতাকে আমার সহিত জেলের মধ্যে হাসপাতালে দেখা করিতে দেন। তখন আমি অসুস্থ ছিলাম। আমার ভ্রাতা আমাকে বলিলেন, "দাদা, একজন লোক আমাকে একটা রিভলভার জেলে লইয়া যাইতে বলিয়াছিল। কিন্তু আমার সাহস হয় নাই।" ইহাতে সত্যেন বলিল, "কেন নরেনবাবু! আনিলেন না কেন, আনিলে ভালই হইত।" সত্যেন ফাঁসীর আগের দিন আমাকে বলিয়াছিল, আপনার ভ্রাতা যখন রিভল্‌ভারের কথা বলিয়াছিল, তখন আপনারই কাপড়ের পাড—যাহা পৈতারূপে বাঁধা হইয়া আমার শরীরে ছিল—তাহাতে একটা রিভলভার ঝুলান ছিল।"

ফাঁসীর পূর্ব্বে সত্যেন Physically বড় weak (শারীরিক দৌর্ব্বল্য) ছিল। তাহার মন সতেজ ছিল, সে ভয় পায় নাই। তা'র ভীষণ হাঁপানীর ব্যারাম ছিল। এই মকদ্দমায় আমার Life transportation হইয়াছিল, কিন্তু দুইবার আপিলে খালাস পাই। পুলিশ দ্বারা ধৃত হইবার পর, সকলেই কমবেশী Confession রূপ

Statement দিয়াছিল। আমিও দিয়াছিলাম; আত্মরক্ষার ভাব সকলকারই মনে জাগিত ইহাতেই Confession প্রদত্ত হইত। কেবল হেমদা বলিত যে, এইসব বিষয়ে একেবারে চুপ থাকাই বৈপ্লবিকের কর্ত্তব্য। পুলিশের সঙ্গে চালাকী চলে না। হেমদা কোন Statement দিত না। হেমদা প্যারিস হইতে যে নূতন বৈপ্লবিক কর্ম্মপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা নেতারা গ্রহণ করেন নাই। বারীনদাও আমল দেন নাই, নিজের মতই বারীনদা চালাইতেন।

জাপানী ওকাকুরা *Ideals of the East* পুস্তকের প্রতিপাদ্য তথ্যগুলি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ভগ্নী নিবেদিতাকে দেন। তাহাতে নিবেদিতা উক্ত পুস্তক লিখেন। ফলতঃ ইহাই নিবেদিতার লিখিত পুস্তক। ওকাকুরা ইংরেজী কম জানিতেন।

ডঃ ভূপেন দত্তকে আমি প্রাচীন কথা বলাতে তিনি উপরোক্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া লইলেন।

৬।২ রাম ব্যানার্জ্জি লেন,
কলিকাতা।

১৭।১।৪৮ (স্বাক্ষর) শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী

———

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসুর বিবৃতি

একবার একটা সার্কাস দেখিতে গিয়া আমার পিতা একজন ইউ-রোপীয়ের কাছে অপমানিত হন। এই আমার প্রথম ইংরেজ বিদ্বেষ। তৎপর, যখন আমার ২৫ বৎসর বয়স সেই সময়ে গৌরীবেড়ের এক বাগানে আখড়া স্থাপন করি। তথায় তীর-ধনুক, লাঠি খেলা, বল খেলা হইত। ইহার পর, নয়নচাঁদ দত্তের লেনে "মাহেশালয়" আমার দ্বারা স্থাপিত হয়। তথায় ছেলেরা পড়িত এবং লাঠি খেলা, Air Gun এ tip অভ্যাস করিত। এই সঙ্গে অমর দত্ত (৺কুমার দত্ত এটর্ণীর ভ্রাতা) ও তাঁহার পুত্রকে এই স্কুলে দিলেন। কাশী হইতে আগত হিন্দুস্থানী পণ্ডিত সংস্কৃত পড়াইতেন। মুক্তাগাছার জমিদার জগতকিশোর আচার্য্য চৌধুরী আমাদের আখড়া দেখিতে আসেন। তিনি একজন লাঠিখেলার ওস্তাদকে পাঠান। এই সময়ে, অতুলকৃষ্ণ ঘোষকে আখড়ায় নিযুক্ত করা হয়; তিনি লাঠিখেলা শিক্ষা দিতেন। এই আখড়া আমার বাড়ীর পার্শ্বে ছিল। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আশ্রমের শিষ্যের ন্যায় থাকিতে হইত। ছেলেদের টিকি রাখিতে হইত। "মাহেশালয়" তিনবার খানাতাল্লাসি হয় এবং আমার বাড়ীও খানাতাল্লাসি হয়।

বঙ্গ-ভঙ্গের সময়ে "ভারত ভাণ্ডার" নামে একটা স্বাধীন দোকান কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে স্থাপিত হয়। তৎপূর্ব্বে, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি তখন বলিতেন, হিন্দুধর্ম্মের ভিতর দিয়া আমি যীশুখৃষ্টকে ঢুকাইব। যখন আমাদের ভারত ভাণ্ডার স্থাপিত হয় তাহার পর ৺তারানাথ রায়চৌধুরীর সহিত আমার আলাপ হয়। সে একবার রিভলভার আমার বাড়ী রাখিয়া যায়। তারপর, তাহা ফেরৎ দিতে যাইয়া তারানাথ ধরা পড়ে। ইতিপূর্ব্বে, বৈপ্লবিকদের কথা আমি কিছু শুনিয়াছিলাম। জ্যোতিষচন্দ্র সমাজপতি কিছুদিনের জন্য

"মাহেশালয়ের" সহিত সংযুক্ত হন। সেই সময়ে ক্ষুদিরাম আর একটা ছেলেকে লইয়া "মাহেশালয়ে" আসে। তারানাথ আমাকে আন্দোলনে প্রথম প্রবেশ করান। ইহার পূর্ব্বে আমরাও পৃথকভাবে জিনিষ সঞ্চয় করিয়াছি। বিপিনচন্দ্র পাল ও উপাধ্যায় আমাদের কর্ম্ম জানিতেন, মোক্ষদা সামাধ্যায়ী এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীও আমাদের ব্যাপার জানিতেন। বিপিনবাবুকে আমরা আমাদের মালের ঘর দেখাই। ইহা কাশী বসুর লেনে একটা নিচু ঘরে থাকিত। বোধ হয় ৩০টা দ্রব্য, তলওয়ারও দুইটা রাইফেল ছিল। ইহাতেই পুলিশ ইন্সপেক্টর বিনোদ গুপ্ত রটায়—তাহাকে পাতালে চোখ বাঁধিয়া এই ঘর দেখান হইয়াছিল।*

"যুগান্তর" দ'লে আমার আলাপ হয় তারানাথের মারফৎ। তখন ভূপেনবাবুর জেল হইয়াছে। পরের কালে মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণ গুহ, কিরণ মুখার্জ্জি প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হয়। কিরণ মুখার্জ্জি ইহাদের হইয়া আমার কাছে আসেন। এই সময়ে আলিপুর বোমার মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে।

একবার বি. সি. চাটুয্যে আমাকে "বেঙ্গলী" আফিসে ডাকিয়া পাঠান, উদ্দেশ্য যে অরবিন্দের জেল থেকে পালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু তজ্জন্য যে সব লোকের দরকার তাহার যোগাড় হইল না। এই জন্য এই কার্য্যের সুবিধা হইল না। বাহির থেকেই এই চেষ্টা হইয়াছিল।

৺অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আমার গঙ্গার ধারে আলাপ হয়। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীই আমাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ করাইয়া দেন। গান্ধী আন্দোলনের পূর্ব্বে শ্যামসুন্দর আমাকে বলেন যে, মৌলানা আবুল

* বার্লিনে একজন Ex-Detenue লেখককে এই গল্পটি তাহাকে ... বলেন। তাহাতে এই গল্পটি গোয়েন্দা ইন্সপেক্টার পূর্ণ লাহিড়ীর স্কন্ধে আরোপিত হয়। —গ্রন্থকার।

কালাম আজাদ (ইনি তখন চৌরঙ্গী লেনে থাকিতেন) আমার সঙ্গে আলাপ করিতে চাহেন। আমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র অমরকে পাঠাই। অমরকে তিনি বোমা প্রস্তুত করিবার প্রণালী জিজ্ঞাসা করেন এবং বলেন, "আমি ইহার খরচ দিব।" অমর বলে, "আপনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি ভাল লোক দিবেন"। তখন যতীন্দ্রনাথ যুগান্তরের নেতা। আজাদের সঙ্গে কথা ছিল, তাঁহার লোক একটা সাঙ্কেতিক নিশানা—একটা হাসনাহানা গাছের পাতা লইয়া আসিলে আমি তাহার সঙ্গে কথা কহিব। তাঁহার সহিত আলাপের পর ঢাকার শান্তি মুখার্জ্জিকে আজাদের কাছে পাঠাই। কিন্তু তারপর শান্তির কয়েদ হয়। আমার বাড়ী এবং মাহেশালয় ও দোকান প্রভৃতি সার্চ্চ (খানাতাল্লাসী) হয়। ইহাতে আমি আজাদের সহিত সম্পর্ক বন্ধ করিয়া দিই। আমার স্থানসকল সর্ব্বসমেত ২৫ বার খানাতাল্লাসী হয়।

প্রথমযুদ্ধের সময় বি সি. চাটুয্যে, নরেন্দ্রনাথ শেঠের মারফৎ আমাকে ডাকিয়া পাঠান। তিনি বলিলেন, Charmichael বলিতেছে- এখন কেন কার্য্য করিতেছ ? একটা কিছু যুদ্ধের পর পাইবেই, এখন সব বন্ধ কর। আমি বলিলাম, সকলকে ছাড়িয়া দাও, তারপর আমাদের কথাবার্ত্তা হউক, তখন যে ঝাপড়া হইবে। এই বিষয়ে আর কিছু হয় নাই। এই সময়ে যতীন মুখার্জ্জি মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ৩।৪ মাস বাদে আমাদের জেল হয়।

আমি যুগান্তর দলের একজন সভ্য হইয়াছিলাম। তখন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি নেতা ছিলেন। তাঁহার সহিত একদিন আমার আলাপ হয়। একদিন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট "বেঙ্গল ষ্টোর" দোকানের উপরে কুমারকৃষ্ণ দত্তের আফিসে আমায় ডাকিয়া পাঠান হয়। তখন রাত্রিবেলা নগেন্দ্র মল্লিক, চারু মিত্র, মন্মথ মিত্র, কুমারকৃষ্ণ দত্ত, সুরেশ সমাজপতি ও বোধহয় তাঁহার ভ্রাতা জ্যোতিষ এবং "সঙ্গীত সমাজের" দলের অনেকে তলওয়ার

স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আজ থেকে আমরা দেশের জন্য তরবারী ধরলাম"। এই ঘটনা ভূপেনবাবুর যুগান্তর সংক্রান্ত জেলের পর হয়।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় হিন্দু হন, কালীঘাটে এই ক্রিয়া হয়। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বাঁড়ুয্যে, পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতির পরামর্শে তিনি হিন্দু হন। আমি সেইদিন তথায় ছিলাম; রাত্রিতে তথায় বক্তৃতা হয়। পঞ্চানন তর্করত্ন 'শুদ্ধি' বা 'পুনঃ হিন্দুকরণ' ব্যাপার সম্পাদন করেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রচার করিয়া লোকের মনকে স্বাধীনতার পথে লইয়া গিয়াছেন।

আলিপুর মকদ্দমার পর, অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর মুন্‌সেফী চাকরী যায়। তৎপর, হাইকোর্টে উকিল হন, ইহার পর যুদ্ধের সময়ে তাঁহার জেল হয়। তৎপর, তিনি ব্যাঙ্ক করেন। বৈপ্লবিক কর্ম্মে তিনি প্রায় ৭০-৮০ হাজার টাকা দান করেন। অবিনাশ বাবুর সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয় তিনি তখন ফকির হইয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছি। তিনি একজন ত্যাগী সাধু, পণ্ডিত, চরিত্রবান এবং পরোপকারী ছিলেন। দেশের জন্য এইরকম ত্যাগ কম লোকই করিয়াছেন। এই রকম ত্যাগী, পরোপকারী কম লোকেরই সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে।

অরবিন্দ যখন গ্রে ষ্ট্রীটে সপরিবারে থাকিতেন তখন আমি তথায় যাইতাম, তাঁহার কথা শুনিতাম। অরবিন্দকে ধরিবার পর, আমি তাঁহার বাড়ীতে যাই এবং আমরাই হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে খবর দিই। অরবিন্দকে ধরার কথা বলিয়া তাঁহাকে তৎস্থলে আনয়ন করি কিন্তু হীরেন্দ্র দত্ত বলিলেন, "পুলিশ জামিন দিলনা"।

১০ই নভেম্বর, ১৯৪৭। স্বাক্ষর—যতীন্দ্রনাথ বসু

মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা।

ক্ষুদিরাম

মোজাফরপুর বোমা বিস্ফোরণ সংক্রান্ত মামলায় তৎকালীন উকিল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়, যিনি উপস্থিত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পাটনায় বাস করিতেছেন, তিনি প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা জানেন তাহা আমায় ২।২।৪৯ তারিখে নিম্নলিখিত বিবৃতিরূপে বলিয়াছেন ঃ—

"কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাহাটা কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস জমিদারীর হেড-ক্লার্ক ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে মাহাতের ষ্টেশনের কাছে একটি ধর্ম্মশালা ছিল। তথায় প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম কিশোরী বাবুর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া উক্ত ধর্ম্মশালায় একটি ঘর পায়। আদালতে যে সব সাক্ষী জমা হয় তাহাতেই আমরা টের পাই যে, একটা মণিঅর্ডার ইহাদের নামে আসে। সেই মণিঅর্ডার কিশোরী বাবু ইহাদের হইয়া স্বাক্ষর করিয়া গ্রহণ করেন এবং ইহাদের দেন। পোষ্টাফিস হইতে পুলিশের অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত তাঁহার স্বাক্ষর করা-রসিদ আদালতে কিশোরী বাবুর বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হয় কিন্তু কিশোরী বাবুর বিরুদ্ধে আর অন্য কোন প্রমাণ না থাকায় তাঁহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা সরকার পক্ষ হইতে তুলিয়া লওয়া হয়।

ঘটনার ১০।১৫ দিন পূর্ব্বে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম মোজাফরপুরে আসিয়া কিংস্ফোর্ডের গতিবিধির সংবাদ রাখিতেছিল। ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে সাক্ষী কেশবলাল চট্টোপাধ্যায়, (পরে ইনি রায়-সাহেব হন।) কলেক্টারের কেরানী ছিল। সে কোন অপরিচিত বাঙ্গালীকে ইতিমধ্যে দেখিয়াছিল। সেই অপরিচিত বাঙ্গালীই ক্ষুদিরাম এই বলিয়া সে আদালতে সনাক্ত করে। ইহার পর কেশব বাবু খুব উন্নতি লাভ করে, শেষে গভর্ণরের পার্শন্যাল ষ্টাফের অফিসার হয়। কোর্টের facts (তথ্য) সমূহ যাহা আমরা পাই তাহা এই ঃ—ঘটনাটি আন্দাজ রাত্রি ৮টার সময় হয়।

পুলিশ তখনই সহরের চারিদিকে রাত্রি দশটার সময়ে ঢেডা পিটাইয়া ঘোষণা করে যে, দুইজন বাঙ্গালী যুবক বোমা ছুড়িয়া কেনেডির মেমকে ও মেয়েকে মারিয়াছে। কেহ তাহাদের সন্ধান দিলে পুরস্কার পাইবেন। ষ্টেশনে, রেল প্রভৃতি জায়গায় টেলিগ্রাফ যায়। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম বোমা ফেলিবার পর মোজাফরপুর হইতে সমস্তিপুরের অভিমুখে রেলের লাইন ধরিয়া ২৩ মাইল দূরে রাতারাতি হাঁটিয়া যায়। সমস্তিপুর ষ্টেশনের আগের ষ্টেশনে—আধুনিক নাম লাখা—তথায় ক্ষুদিরাম একটি মুদির দো'ানে বাঙ্গলায় বলে, চার পয়সার মুড়ি দাও। এই সময়ে সেখানে একটি পুলিশের লোক দাঁড়াইয়াছিল। সে সন্দেহ করিয়া তাহাকে ধরে এবং মোজাফরপুরে লইয়া যায়। প্রফুল্ল ইত্যবসরে উ'াকে ধরিতে দেখিয়া সমস্তিপুরে পলাইয়া যায়। সমস্তিপুরে সে রেলের জনৈক বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর বাড়ী আশ্রয় নেয়। তিনি প্রফুল্লকে আশ্রয় দেন এবং তাহার দুই দিন পরে প্রফুল্ল নূতন বেশভূষা, নূতন জুতা পরিয়া ঐস্থান হইতে কলিকাত অভিমুখে রেলের ইণ্টার ক্লাসে উঠিয়া এক কোণে বসে। সেই গাড়ীতে নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মোজাফরপুরের রায় সাহেব শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র এবং নিজে পুলিশ সাব-ইনসপেক্টার—ছুটির পরে রাঁচিতে কর্ম্মস্থলে যাইতেছিল। ঐ ট্রেনে প্রফুল্লের সহিত তাহার আলাপ-পরিচয় হয়। পরে তাহার সন্দেহ হয়। সন্দেহ হইতে, দুইটা ষ্টেশনের পরের ষ্টেশনে তাহার দাদামহাশয়কে টেলিগ্রাম করে, 'আমি ইহাকে গ্রেফতার করিতে পারি কি না?' সে তথায় পোষ্টেড্ ছিলনা, কোন ক্ষমতাও ছিলনা, কেবল ছুটিতেছিল; কাজেই দাদা মহাশয়কে টেলিগ্রাম করিয়া তথাকার পুলিশ হইতে তাহার গ্রেফতার করিবার ক্ষমতা আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করে। কালেক্টর উডম্যান মোকামা ষ্টেশনের পুলিশকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানায়

এবং গ্রেফতার করিবার জন্য অনুমতি নন্দলালকে দেয়। মোকামা ঘাটে, নন্দলাল * যখন গ্রেফতার করিতে যায়, তখন প্রফুল্ল বলে, 'আপনি বাঙ্গালী হই'। আমাকে অ্যারেষ্ট কারতে যাইতেছেন"। এই বলিয়া দুইটা গুলি—একটা গলায়, একটা বুকে, নিজে একটার পর আর একটা ছুঁড়ে। Evidence এ (সাক্ষ্য এই কথা বাহির হয় যে, ঐ স্থানের অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারীর সাক্ষ্য এই, He fired two shots, one after another, it is a fact (সে একটার পর আর একটা গুলি ছোঁড়ে, ইহা সত্য ঘটনা। তাহার পর, প্রফুল্লর মৃতদেহ পোষ্টমর্টেম জন্য পাঠান হয়। তৎপর শরীরের ফটোগ্রাফ লওয়া হয়। মৃতদেহটা পুলিশ এবং ডোম নেয়। ইহাই দস্তুর। তাহার মাথাটা কাটিয়া মোজাফরপুরে লইয়া যাওয়া হয়। ফটোগ্রাফ লইবার জন্য মাথা কাটা হয়। আমরা কেবল মাত্র তাহার কাটা মাথার ফটো দেখিয়াছি। মনে হয়, আদালতে কেবলমাত্র ফটোই প্রদর্শিত হইয়াছিল। মকদ্দমা মোজাফরপুরেই হইয়াছিল। কার্নডাফ Curnduff) স্পেশাল জজ এবং পাটনার পাবলিক প্রসি-কিউটার রায় বাহাদুর বিনোদ মুখার্জ্জি স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হন। ক্ষুদিরামকে ডিফেন্স করিবার জন্য মোজাফরপুরে কোন উকিল পাওয়া যাইবে না বলিয়া রঙ্গপুর হইতে লাহিড়ী, সতীশ চক্রবর্ত্তী, কুলকমল সেন আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ডিফেন্স করার প্রয়োজ হয় নাই, কারণ, প্রসিদ্ধ উকিল কালীদাস বসু এই ভার গ্রহণ করেন। কমিটিং কোর্টে, এভিডেন্স ম্যাজিষ্ট্রেট যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন তাহা 'ষ্টেটস্‌ম্যান', 'অমৃত বাজার' পত্রিকাতে বাহির হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে কালীদাসবাবু জেল আপিল করিবার জন্য চেষ্টা করেন।

---

* এই পুলিস কর্ম্মচারী নন্দলাল বৈপ্রবিকদের দ্বারা কলিকাতায় নিহত হয়। গ্রন্থকার

কিন্তু তাহাতে ক্ষুদিরামের আপত্তি হয়। আর ফাঁসীর মঞ্চে যখন তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়, তখন সে খুব নির্ভীক চিত্তে মঞ্চে আরোহণ করে। মঞ্চের দিকে সে খুব দৃপ্ত-পদবিক্ষেপে যাইতেছিল। তাহার শরীর দাহ্ করা হয়। এই জন্য বারের জনকতক উকিল, অনেকগুলি বাঙ্গালী মিলিত হইয়া মৃতদেহকে দাহ করিবার জন্য জেল সুপারিটেনডেন্টের কাছে অনুমতি প্রাপ্তির দরখাস্ত করেন এবং তাঁহারা অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। তাহাতে সঠিক সংবাদ আছে"।

সুরেন্দ্রবাবু লেখককে বলিয়াছেন, ক্ষুদিরামের ভগ্নী তাহার সহিত দর্শনের জন্য মোজাফরপুরে যান কিন্তু সাক্ষাতের হুকুম পান নাই।*

---

* ক্ষুদিরামের বিচারের সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়, একটি মহিলা ক্ষুদিরামের "ভগ্নী" বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য উকিলদের বাড়ীতে গিয়া ধরণা দিতেছেন। ক্ষুদিরামের আদালতের বিবৃতিতেই প্রকাশ পায়, তাহার ভগ্নীপতি আদালতে রাজকর্মচারী ছিলেন ক্ষুদিরাম স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দান করায় তিনি তাহাকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কাজেই উপরোক্ত স্ত্রীলোকটি ক্ষুদিরামের সহোদরা হইতে পারেন না। পুনঃ মেদিনীপুরে ক্ষুদিরামের কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠি হইতে লেখক অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন, ক্ষুদিরামের সহোদর তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য মোজাফর-পুর যান নাই। সংবাদপত্রে উল্লিখিত এই মহিলাটি বোধ হয় ভগ্নীর বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া ক্ষুদিরাম যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেই স্থানের পার্শ্বস্থিত বাড়ীর যে মহিলাটি এই নিরাশ্রয় বালককে আদর যত্ন করিতেন তিনিই। ইনিই সম্ভবতঃ মোজাফরপুরে যান, কিন্তু গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে দর্শনের অনুমতি দেয় নাই।

কিন্তু এই ভুল সংশোধন করিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা এই স্থলে করা হইল। সত্য ও মানবতার সম্মানরক্ষা করিবার জন্যই এই অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত মহিলাটির সৎসাহসের পরিচয়ের কথা এই স্থলে শ্রদ্ধাসহকারে উল্লিখিত হইল। ক্ষুদিরামের ঘটনাবিষয়ে তথাকথিত ঐতিহাসিকের এই ঘটনা বাদ দিয়া গিয়াছেন, এবং কেহ কেহ এই মহৎ অন্তঃকরণবিশিষ্টা মহিলাটির গাত্রে কর্দ্দম নিক্ষেপ করিয়াছে। ইহাই হইতেছে বুর্জোয়া ন্যাশলিস্টদের মনস্তত্ত্ব এবং বুর্জোয়া ইতিহাস!

সুরেন্দ্রবাবুর এই মৌলিক বিবৃতির সহিত ৺সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদের দ্বারা আমার কাছে পুনঃ পুনঃ কথিত উক্তি, 'বাসন্তীবাবু দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার ভগ্নীর বাটিতে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামকে, কিছুদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার সমর্থন পায়না। সুরেন্দ্রবাবু বলেন, বাসন্তী বাবু (তথাকার একজন বাঙ্গালী উকিল) কখন তাঁহাদের এই বিষয়ে কোন ইঙ্গিত দেন নাই। পুলিশও এই বিষয়ে নীরব। তবে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহারা কোথায় ছিল তাহা তাঁহারা জানেন না। সুরেন্দ্রবাবু বলেন, বাসন্তী বাবুর বদন সর্ব্বদাই হাস্যময় থাকিত। মিসেস কেনেডীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে তিনি তাঁহার মুখ কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহাতে পুলিশ বলে যে তিনি ব্যঙ্গ করিয়া তৎকালে হাসিতেছিলেন। এই অভিযোগ প্রদত্ত হইলে বাসন্তী বাবু তাহা resent করেন।

সুরেন্দ্র বাবুর উক্তি ওয়াহেদের উক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। আমার জেলের পর, মোজাফরপুরের কোন উকিলের সহিত পার্টির কোন লোকের আলাপ হইয়াছিল কিনা তাহাই অনুসন্ধানের বস্তু। সন্ধ্যা আফিসে গোবিন্দবাবুর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল; কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু বলেন, তিনি প্রফুল্লদের প্রচেষ্টা বিষয়ে কিছুই অবগত

ছিলেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালার গুপ্তসমিতি বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। যুগান্তর দলের একমাত্র কেবল আমার সহিতেই উপরোক্ত স্থানে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল।

১৩৫৪ সালের আশ্বিন মাসের "শনিবারের চিঠি" নামক পত্রিকাতে শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় "ক্ষুদিরাম" শীর্ষক প্রবন্ধে মোজাফরপুর মামলা বিষয়ে যাহা বর্ণনা করিয়াছে, তাহা সুরেন্দ্রবাবুর বিবৃতির সহিত মিল আছে। উভয়েই ক্ষুদিরামের মামলায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহার ফলে সুরেন্দ্রবাবু লেখককে বলেন, তাঁহার মুনসেফ হইবার আশা বিনষ্ট হয়। উপেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন সুরেন্দ্রবাবু ক্ষুদিরাম সংক্রান্ত মকদ্দমায় ধৃত কিশোরী বাবুর জন্য আদালতে জামিন হইয়াছিলেন। উপেন্দ্রবাবুর ক্ষুদিরাম সংক্রান্ত মকদ্দমার অন্যতম উকিল ছিলেন এবং তাহার ফাঁসির সময়ও উপস্থিত ছিলেন।

উভয়ের বিবৃতির সহিত ক্ষুদিরাম সংক্রান্ত সাধারণ বিবৃতির কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। এই জন্যেই তাঁহাদের বিবৃতি এই স্থলে উল্লিখিত হইল। উপেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "এখন প্রফুল্লর সহযাত্রী এবং সমস্তিপুরের অধিবাসী বাঙ্গালীদের নিকট প্রফুল্ল সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহাও লিপিবদ্ধ করিতেছি···ক্ষুদিরাম আমাদের বলিয়াছিল যে, উহারা বোমানিক্ষেপ করিয়া রেলের রাস্তা ধরিয়া চলিতে থাকে সমস্তিপুরের দিকে। সকালবেলা পুশা ষ্টেসনের নিকট একটা নির্জ্জন আমবাগানে লুকাইয়া থাকে...ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রফুল্ল ক্ষুদিরামকে পাঠাইয়াছিল ষ্টেশন সংলগ্ন দোকান হইতে মুড়ি আনিবার জন্য। ক্ষুদিরাম হিন্দি বলিতে পারিত না। মুদীর দোকানে গিয়া বলিল, 'মুড়ি দে।' বলিতেই পাশে দাঁড়ানো কনেষ্টবল তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। ক্ষুদিরাম আমাদের বলিয়াছিল যে, ধৃত হইবার পর সে কি একটা চীৎকার

করিয়াছিল। উদ্দেশ্য—প্রফুল্ল আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে… কিন্তু প্রফুল্ল আসিল না। ক্ষুদিরাম বলিয়াছিল প্রফুল্লর আসা উচিত ছিল, আসিলে আমরা উভয়েই পালাইতে পারিতাম।…যাহা হউক, প্রফুল্ল চলিতে লাগিল সমস্তিপুরের দিকে। বেলা দুপুরের কাছাকাছি সেই বাঙ্গালী কর্ম্মচারীটি (ইনি পূর্ব্বোক্ত রেল-কর্ম্মচারী) দেখিতে-পাইলেন, মাঠের মধ্য দিয়া একটি উস্কখুস্ক-চুল বাঙ্গালী ছাত্র আসিতেছে।...বাঙ্গালী বাবুটি বুঝিলেন, এই ছাত্রটিই একটি পলাতক বিপ্লবী। যত্ন করিয়া গোপনে প্রফুল্লকে নিজের বাড়ি লইয়া আসিলেন।…নন্দলাল বলিল, আমি তোমায় গ্রেপ্তার করিতেছি। ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল প্রফুল্ল, "তুমি বাঙ্গালী হইয়া গ্রেপ্তার করিতে চাও আমাকে! আচ্ছা তবে এই নাও," বলিয়া রিভলবার ছুঁড়িলেন। নন্দর আরও কয়েক মাস আয়ু ছিল, তাই মাথা নীচু করিয়া এযাত্রা রক্ষা পাইল। তখন পুলিশ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রফুল্ল একবার নিজের কপালে আর একবার বুকে গুলি করিয়া প্লাটফরমে পড়িয়া গেল।…পুলিশ মৃত প্রফুল্লর ফটো তুলিয়া লইল। শুনিয়াছি, ক্ষুদিরামকে দিয়া সনাক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার ছিন্নমুণ্ড মোজাফরপুরে লইয়া আসিয়াছিল। বিচারকালে সেই অবস্থার ফটো আমি দেখিয়াছি। কপালের ঊর্দ্ধদিকে একটি ও বাঁদিকের বুকের উপর দিকে একটি গুলি প্রবেশের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল।…কি প্রশান্ত নিটোল ললাট ছিল প্রফুল্লর। আর বক্ষদেশ কি উন্নত ও বিস্তৃত। বাঙ্গালী হইয়া এই প্রথম দেখিলাম বাঙ্গালী বীরের প্রকৃত মূর্ত্তি।" (পৃঃ ৫২২-৫২৩)।

উপরোক্ত উভয়ের বিবৃতির সঙ্গে প্রচলিত কাহিনীর সর্ব্ব জায়গায় মিল হয় না। ইহারা বলিতেছেন, বোমা ফেলিয়া প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম

উভয়েই একরাস্তা ধরিয়া পলাইয়াছিল। পুনঃ, উভয়েই বলিতেছেন, প্রফুল্ল একটা কপালে ও একটা বুকে গুলি ছেঁাড়ে। উপেন্দ্রবাবু স্বচক্ষে ফটোতে প্রফুল্লর মৃতদেহে দুই স্থানে দাগ দেখিয়াছেন।

শেষে উপেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, 'কালিদাসবাবু বুঝাইয়া ক্ষুদিরামকে হাইকোর্টে আপিল করিতে রাজী করাইয়াছিলেন। কিন্তু হাইকোর্টে দণ্ড বহাল রহিল শেষে King's mercy-র জন্য কালীদাস বাবু ক্ষুদিরামকে বুঝাইয়াছিলেন। সে কিন্তু রাজী হয় নাই, অবশেষে কালিদাস বাবুকে খুশী করিবার জন্য দরখাস্ত সই করিয়াছিল। কিন্তু কিছুই হইল না। ১১ই আগষ্ট ফাঁসির দিন ধার্য্য হইল" (পৃঃ ৫২৭)।

উপেন্দ্রবাবু তৎকালীন "বেঙ্গলী" পত্রিকার রিপোর্টার হিসাবে ফাঁসির সময়ে উপস্থিত থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফাঁসির সময়ের কথা তিনি বলিতেছেন, "ক্ষুদিরামই আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। আমাদের দিকে আর একবার চাহিল। তারপর দৃঢ়-পদবিক্ষেপে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল" (পৃঃ ৫২৬ ।

এই দুইজন উকিলই মকদ্দমাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বিবৃতি এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

পরিশিষ্ট—ছ

জাতীয় পতাকার ইতিহাস

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস পত্রদ্বারা "জাতীয় পতাকা" সম্বন্ধে আমাকে যাহা অবগত করাইয়াছেন তাহার মূলকথা এই : তিনি ১৯০৬ সালের আগষ্টে ইউরোপ যান। উক্ত বৎসরের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করিবার জন্য যখন নৌরজী মহোদয় ভারতে আসিতেছিলেন তখন প্যারিসের ভারতবাসীরা তাঁহাকে ষ্টেশনে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানান। হেমবাবু তৎকালে প্যারিসে ছিলেন এবং সম্বর্দ্ধনাকারীদের অন্যতম ছিলেন। প্রায় আটমাস পরে ষ্টুটগার্ট সোসালিষ্ট কনফারেন্স হয়। এই কনফারেন্সে প্যারিসস্থিত ভারতীয় দলের পক্ষ হইতে এই বিশ্ব-কংগ্রেসে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি পাঠান উচিত, এই কথা উত্থাপিত হয়। মাডাম কামা ও শ্রীযুক্ত রাণাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া উক্ত কংগ্রেসে কর্ত্তৃপক্ষকে আবেদন জানান হয়। একজন "পি. এইচ ডি" উপাধিধারী রুষীয়-বৈপ্লবিকের চেষ্টায় নিমন্ত্রণ আসে। তখন বক্তৃতা আর পতাকা প্রস্তুতের হিড়িক পড়ে।

তৎপরে, শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মার সাহায্যে হেম বাবু বোমা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিতে থাকেন। এই কর্ম্মে মির্জ্জা আব্বাস (হায়দারাবাদ) ও বাপট (বম্বে) তাঁহার সহকর্ম্মীরূপে কৃষ্ণবর্ম্মা দ্বারা নিযুক্ত হন—এই তিন জনের গোপন স্থানে থাকা, চাঁদা এবং ল্যাবরেটারী চালান ইত্যাদির খরচার জন্য ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ম্মা প্রায় ৩০০০ ফ্রাঙ্ক দেন। শেষোক্তের কাছ হইতে সাহায্যার্থ টাকা বাহির করার বাহাদুরি হেমবাবু তাঁহাকে বলেন। শ্যামজীকে কড়ায় গণ্ডায় হিসাবও তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এতদ্দ্বারা হেমবাবু বোমা প্রস্তুত করিবার বিষয়ে রুষ বৈপ্লবিকের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন্ দলের লোক? মার্ক্সবাদীর

সোসালিষ্টরা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করেন না। কেবল আনার্কিষ্ট ও রুষের সমাজ-বৈপ্লবিকরাই সন্ত্রাসবাদ কর্ম্মে লিপ্ত ছিল।

এই সময়ে সুইজার্লাণ্ডে একজন মারাঠা যুবকের সহিত হেমবাবুর সাক্ষাৎ হয়। গ্রন্থকারকে তৎকালে তিনি লিখিয়াছিলেন, সুইজার্লাণ্ডে একজন মারাঠা যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তাঁহার নাম "রাও"। এক্ষণে হেমবাবু লেখককে অবগত করাইতেছেন যে, এই ব্যক্তি বরোদার সর্ব্বোপরি সেনাপতি মাধো রাওয়ের ভ্রাতা খাসী রাও। গ্রন্থকার বারীনের কাচ হইতে এই খাসী রাও যাদবের নাম শুনিয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তাঁহার দুই পুত্র জার্ম্মানীতে পড়িতে আসিয়াছিলেন। খাসী রাও বরোদার এক পল্টনের অফিসার ছিলেন। গ্রন্থকার শুনিয়াছিলেন যে, তিনি জাপানে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করেন। অরবিন্দবাবু খাসী রাওয়ের নামে হেমবাবুকে একটি Recommendation Letter দেন এবং হেমবাবুর ইচ্ছামত কার্য্যের জন্য কোন মিলিটারী কারখানা বা শিক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। হেমবাবু ন সাটেল (Neu Chatel) কোলোঁথিয়ে মিলিটারী ব্যারাকে রাওকে ধরেন। খাসীরাও গাইকোয়াড দ্বারা প্রেরিত; তিনি অশ্বারোহী পল্টনের পদে ভর্ত্তি হইতে পারিয়াছিলেন। রাও বলিলেন, তাঁহার এক গুরু আছেন, তাঁহার কাছে দীক্ষা লইয়া সাধনা করিয়াছেন বলিয়াই তিনি এই কর্ম্মে সুবিধা পাইয়াছেন। হেমবাবু তাঁহার কাছে মন্ত্রশিষ্য হইয়া কিছুদিন থাকিলে তবে তিনি কোন একটা গতি করিতে পারেন। হেম বাবু তাঁহার শিষ্য হন এবং অল্পদিনেই "হনুমান" ইত্যাদি আসন-সিদ্ধ হন। তখন তিনি শ্রীযুক্ত রাণার নিকট একখানি চিঠি দিলেন—হেম বাবু উপযুক্ত লোক। হেম বাবু বলেন, রাও-এর ধারণা ছিল যে ৮।১০ বৎসরের মধ্যে ভারত-যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। এইসব বিষয়ে তিনি

তাঁহার "বাঙ্গালায় বিপ্লব প্রচেষ্টা" নামক পুস্তকে সবিস্তারে লিখিয়াছেন।

এই স্থলে আসে, প্যারিসের বৈপ্লবিকদের মধ্যে ব্যবহৃত জাতীয় পতাকার কথা। এই বিষয়ে হেম বাবু বলিতেছেন: "আমার বইতে যা লিখেছি তাতে ওই জাতীয় পতাকার আবিষ্কারক বলে আমি একটুও দাবী করি নাই। যদিও আমিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তৈরী করেছিলাম। সাভারকার ঐ পতাকার ফুল পদ্ম), সূর্য্য, চন্দ্রাদির যে ব্যাখ্যা বোম্বের কাগজে দিয়েছিলেন, মুস্লিমের প্রতীক যে "চাঁদ", তাহা অস্বীকার করেন। আর সে-ই যে পতাকার পরিকল্পনা দিয়েছিল, তাহা জাহির করেছিল। পুনঃ, তিনি বলিতেছেন, "ঐ পতাকার পরিকল্পনা একেবারে আমার নয়; আমি ঐ পরিকল্প-নার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম, বিশেষ করে পতাকার মাঝখানে বন্দেমাতরম লেখার বিরোধী ছিলাম।"

'জাতীয় পতাকার" উৎপত্তি এবং বিবর্ত্তনের ইতিহাস লইয়া সংবাদ-পত্রে একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে। লেখকও এই বিষয়ে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু প্যারিসে বৈপ্লবিকদের দ্বারা ব্যবহৃত পতাকাটির বিষয়ে তাঁহার যে কিঞ্চিৎ ভুল হইয়াছে, ইহা হেম বাবুর পত্রদৃষ্টে প্রকাশ পায়। লেখক বিদেশে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই পূর্ব্বে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বিষয়ে হেম বাবুর আলোকসম্পাত সত্ত্বেও একটা খটকা থাকিয়া যায়। তাহা হইতেছে ১৯০৬ সালের ৭ই আগষ্ট বয়কট দিবসে প্রথম "ফেডারেশন হল" নামক প্রাঙ্গনে (পরের গ্রিয়ার পার্ক) বাঙ্গালার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সর্ব্বপ্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা ব্যাপারের অনুষ্ঠানটি। এই বিষয়ে "সঞ্জীবনী" সম্পাদক ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র শ্রীসুকুমার মিত্র মহাশয় লেখককে যাহা বলিয়াছেন এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা লিখিত ৺শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর জীবনীতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা এই:—

"শচীন্দ্র প্রসাদ স্যার সুরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তিনি ১৯০৬ সালে একদিন তাঁহার বন্ধুর পরামর্শে সুরেন্দ্রনাথকে ধরিলেন যে আমাদের একটি জাতীয় পতাকা চাই। সুরেন্দ্রনাথ শিষ্যের অনুরোধে রাজী হইলেন। বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা জাতীয় পতাকা তৈয়ারী কর ও পতাকা আনিয়া দেখাও। শচীন্দ্রপ্রসাদ ও তদীয় বন্ধু পরমোৎসাহে গৃহে ফিরিয়া এক পতাকা তৈয়ারী করিলেন। পতাকার রূপ ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত—সবুজ, পীত ও লাল। সুরেন্দ্রনাথ এক পরামর্শ-সভা আহ্বান করিলেন। তাহাতে স্যার আশুতোষ চৌধুরী, স্যার আবদুল হালিম গজনভী প্রভৃতি যোগ দেন। তাঁহারা স্থির করেন যে এই ত্রিবর্ণের উপর আবার মানচিত্রের সংস্থান অনুসারে ভারতবর্ষের ৭টি প্রদেশের জন্য ৭টি পদ্মদ্বারা শোভিত থাকিবে। সুরেন্দ্রনাথ পরম আগ্রহে, পরম স্নেহে পতাকার দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে জাতীয়-পতাকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করাইয়া লইলেন। ১৯০৬ সালের ৭ই আগষ্ট বয়কট দিবসে এই পতাকা গ্রিয়ার পার্কে উড্ডীন করা হয়। নরেন্দ্রনাথ সেন পতাকার জন্য প্রার্থনা করেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু তাহা সুরেন্দ্রনাথের হস্তে দেন ও তিনি তাহা ১০১টি বোমার ধ্বনির মধ্যে উড্ডীন করেন। ১৯০৬ সালে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়, তখন সেই পতাকা সভামণ্ডপের শীর্ষে উড্ডীন করা হয়। ডেলিগেটদিগের ব্যাজেও এই ত্রিবর্ণ ছিল। এই ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকাই কংগ্রেসের প্রথম পতাকা। কালক্রমে ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বর্ত্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত পতাকার একটি নমুনা জীর্ণ অবস্থায় আজিও স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত আছে।"

"শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু"—পৃঃ ৩২—৩৩।

বিলাতী পণ্যের বর্জ্জনোৎসব

সঞ্জীবনী, ২৪এ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩১৩।

স্কোয়ারে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অনেকে বাহিরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। স্কোয়ারের চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহোপরি সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই জাতীয় উৎসব দেখিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে শঙ্খধ্বনি শুনা যাইতেছিল এবং বোমার আওয়াজ হইতেছিল। সকলের জয়ধ্বনির মধ্যে নরেন্দ্র বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র বাবু সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর স্বরে আকুলকণ্ঠে একটি প্রার্থনা করিলেন। পূর্ণিমার জলোচ্ছ্বাসের সময় মহাজলধি যেমন শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে তেমনি সেই বিশাল জনসমুদ্র পক্ককেশ বৃদ্ধের কণ্ঠে প্রার্থনা শুনিয়া মহানিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। জলদগম্ভীরকণ্ঠের সেই প্রার্থনা শুনিয়া সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া যুক্ত-করে বলিতে লাগিলেন "সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা হে বিশ্বপতি ভগবান! আজ তোমার কৃপায় আমরা এখানে একত্র হইয়াছি তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর এবং আমাদিগের জন্মভূমির কল্যাণ সাধন কর। আমাদিগের মধ্যে যে আত্মনির্ভর এবং স্বদেশপ্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে তজ্জন্য হে ভগবান, তোমাকে শত শত ধন্যবাদ করিতেছি। আমাদিগের চারিদিকে যে নবজাগরণের সাড়া পাইতেছি তাহার মধ্যে তোমার মঙ্গলহস্ত দেখিতে পাইতেছি। তুমিই এই নবপ্রেরণা আমাদিগের মধ্যে দিয়াছ এবং তুমিই তাহা রক্ষা কর। তুমি রাজপুরুষ-দিগের অন্তঃকরণে সদিচ্ছা এবং সাধুপ্রবৃত্তিসকল জাগ্রত করিয়া দাও এবং তাঁহাদিগের মর্ম্মস্থান এমনভাবে স্পর্শ কর যেন বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত হইয়া যায়। আমাদিগের যুবকগণকে অন্যায় এবং অসাধুতার হস্ত হইতে রক্ষা কর এবং তাহাদিগকে চরিত্রবান করিয়া গঠন কর যেন তাহারা

জীবনে মরণে তোমার সেবা এবং তোমার জয়গান করিতে পারে”। নরেন্দ্রবাবু আসন গ্রহণ করিলে হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষ হইতে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও মিঃ আবদুল হালিম গজনবি সুরেন্দ্রবাবুর হস্তে নব-নির্ম্মিত জাতীয় পতাকাটি প্রদান করিলেন। সবুজ, পীত ও লাল রঙের জমির উপর প্রথম লাইনে আটটি পদ্ম, দ্বিতীয় লাইনে সংস্কৃত অক্ষরে বন্দেমাতরম্‌ এবং শেষ লাইনে সূর্য্য ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিই জাতীয় পতাকার চিহ্ন হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবু ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া সকলকে এই জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং গগণ-বিদারী বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনির মধ্যে জাতীয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন।

তৎপরে সুরেন্দ্র বাবু বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের পবিত্র মন্ত্র গম্ভীরস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং সমুদয় জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া একস্বরে সেই মহা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। আবার বোমার আওয়াজ হইল।

অপরাহ্নে কলেজ স্কোয়ারে

বেলা ২টা না বাজিতেই দলে দলে লোক এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সোসাইটির গৃহ অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। * * *

* * একটি বৃহৎ দণ্ডের উপর জাতীয় পতাকা সগর্বে উড়িতেছিল।

ঠিক সাড়ে চারিটার সময়ে এই বিরাট বাহিনী সভাস্থল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে একজন হৃষ্টপুষ্ট যুবক জাতীয় পতাকা হস্তে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

সুকুমার বাবু লেখককে অবগত করান যে, "ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন" হলে বয়কট আন্দোলনকারীদের একটি সভায় এই পতাকার প্রস্তাবটি উত্থাপিত করা হয়। তথায় প্রত্যেক জেলার নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই এই পতাকা এবং তাহার রূপ অনুমোদন করেন। এতদ্বারা এই পতাকার পশ্চাতে তৎকালীন জাতীয় অনুমোদন (Sanction) ছিল।

এই পতাকা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক রাজনীতিক সম্মেলনের বহরমপুর অধিবেশনে উড্ডীন করা হয়। শ্রীসুকুমার মিত্র লেখককে বলেন, এই পতাকা ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতার রাস্তায় কোন Demonstration কালে উড্ডীন করিয়া বাহিত হইত। পরে, "বঙ্গভঙ্গ' রদ হইলে, ইহা লোকচক্ষুর অন্তরাল হয়। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতি এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে বিস্মরণ করিয়াছে, যদিচ এই অনুষ্ঠানের যোগদানকারীদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন।

৭ই আগষ্ট বৈকালে যখন এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তৎসময়ে এলাহাবাদের বসু বংশীয় শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু অশ্বারোহণ করিয়া এই পতাকা উড্ডীন করিয়া ফেডারেশন হল প্রাঙ্গনে আগমন করেন। গমনকালে ঘোঁড়া হোঁচট খায়। কোন স্বদেশী পত্রিকা (বোধ হয় "সন্ধ্যা" পত্রিকা) ইহা উপলক্ষ্য করিয়া কবিতা লিখিয়া উপহাস করে; তখনকার গরম দলের ও সুরেন্দ্র বাবুর বিপক্ষীয় দলের পত্রিকাতে পতাকানুষ্ঠান বিষয়ে উপহাস করা হয়। কেবল "যুগান্তর" পত্রিকায় আমরা ইহা সমর্থন করিয়াছিলাম, লিখিয়াছিলাম, "জাতীয় বৈপ্লবিক পতাকারূপে ইহাকে আমরা গ্রহণ করিতেছি"। "সুকুমারবাবু বলেন, ঐ পতাকার সঠিক বিবরণ "সঞ্জীবনী" ও ইংরেজী "বন্দেমাতরম্" পত্রে প্রকাশিত হয়। তিনি স্বীকার করেন, "যুগান্তর" ব্যতীত আর কোন সংবাদপত্র এই পতাকাকে অভিনন্দিত করে নাই।

এক্ষণে বিদেশস্থিত বৈপ্লবিকদের দ্বারা গৃহীত জাতীয়-পতাকাটির বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। লেখক আমেরিকায় যাইবার পর, ম্যাডাম কামার ইংরেজী ভাষায় লিখিত "তলওয়ার" নামক পত্রিকা প্রকাশ হইতে থাকে। এই পত্রিকাতে বাঙ্গালার পতাকার অনুরূপ একটি পতাকার চিত্র বহির্পটে অঙ্কিত থাকিত। তদুপরি সাদা পদ্ম, সূর্য্য, চন্দ্র ও তারা, এবং দেবনাগরী অক্ষরে 'বন্দেমাতরম" শব্দটিও অঙ্কিত থাকিত। তৎকালীন বিদেশস্থিত ভারতীয়দের কাছে অনুসন্ধানে এই শ্রুত হইয়াছিলাম যে, চন্দ্র মুসলমানের প্রতীক, সূর্য্য পার্শীর প্রতীক, পদ্মফুলগুলি এক এক প্রদেশের প্রতীক, পুনঃ লণ্ডনে শ্যামজী কৃষ্ণ-বর্ম্মার 'ইণ্ডিয়া হাউস" নামক ভবনে এবং অন্যত্র শ্রীমতী কামা তাঁহার উক্ত পতাকা উড্ডীন করিয়া বক্তৃতা করিতেন: This is the flag for which, Khudiram and Prafulla Chaki died (এই পতাকার জন্যই ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মরিয়াছে)। এই জন্য লেখক নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, বাঙ্গালার কংগ্রেস-প্রদত্ত পতাকাই প্যারিসের বৈপ্লবিকদের পতাকায় পরিণত হয়। পুনঃ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সোসালিষ্ট জগতে বিখ্যাত ষ্টুটগার্ট কনফারেন্সে শ্রীমতী কামা তাঁহার এই পতাকা উড্ডীন করেন। ১৯২০খৃঃ বিখ্যাত সোসালিষ্ট নেতা কার্ল কাউটস্কী লেখককে বলেন, "I remember an Indian lady waving a flag" (আমার স্মরণ হয়, একজন ভারতীয় মহিলা একটি পতাকা সভাতে উড্ডীন করিয়াছিলেন)।

ইহার পর এই পতাকা বার্লিনে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের মধ্যে আবির্ভূত হয়। বার্লিন বৈপ্লবিক কমিটি এই পতাকা জাতীয়-পতাকা-রূপে ব্যবহার করে। ছদ্মবেশে নানাদেশ ঘুরিয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মের প্রাক্কালে (বোধ হয় মে মাস) লেখক বার্লিনে উপনীত হন তথায়

কমিটির বাড়ীতে এই পতাকা দেখেন। কিন্তু তাহা কেবল পরিষ্কার ত্রিবর্ণ-চিহ্নিত ছিল। লেখক যখন ৺বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন, এই পতাকার উপর চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি কেন অপসারিত হইল তখন তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—"উহা ম্যাডাম কামার সৃষ্ট; আমরা উহা উঠাইয়া দিয়াছি"। এই সময়ে Vincent Kraft নামক একজন জার্ম্মান সৈনিক ভোজের জন্য তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই পতাকাকে লক্ষ্য করিয়া লেখক ক্রাফ্‌ট বলেন—"এই পতাকার জন্য অনেকেই মরিয়াছেন"। ক্রাফ্‌ট উত্তর করিলেন—"আরও অনেকে মরিবেন"। বার্লিনের এই পতাকাটি যে কলিকাতার ৭ই আগষ্টে প্রদত্ত পতাকার অভিব্যক্তি, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই লেখক এই কথা বলিয়াছিলেন। ক্রাফ্‌ট সঙ্গোপনে ভারতে অস্ত্রাদি পাঠাইবার জন্য জাভার ব্যাটেভিয়া নগরে বার্লিন কমিটি দ্বারা প্রেরিত হইতেছিলেন। কমিটির এই কর্ম্মে জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট তাহাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন ইহার নাম পরে পুনঃ আসিবে।

লেখকের জ্ঞাতসারে কমিটির এই পতাকা কখনও প্রকাশ্যে উড্ডীন হয় নাই। কিন্তু বার্লিন হইতে প্রেরিত ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা মেসোপোটামিয়াতে ইংরেজ সৈন্যদল হইতে পলায়িত (deserter) সিপাহীদের লইয়া যখন "ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী" সৃষ্ট হয়, তখন তাহারা একটি "জাতীয় পতাকা" উড্ডীন করিত। এই রিপোর্ট তথাকার বৈপ্লবিকেরা বার্লিনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অজ্ঞাত এই পতাকার কি রূপ ছিল। তবে মনে হয়, বার্লিন হইতে প্রেরিত বৈপ্লবিকেরা বার্লিন-কমিটির পতাকার প্রতিচ্ছবিই তথায় বহন করিতেন।

বিগত বৎসরে জার্ম্মানী হইতে প্রত্যাগত কর্ত্তারামজী জামসেদপুরে এক সাংবাদিককে বলিয়াছিলেন, বার্লিন-কমিটির পতাকাটি তাঁহার কাছে

আছে। তিনি বার্লিন কমিটির সদস্য ছিলেন এবং কয়েদী ।রতীয় সিপাহীদের তত্ত্বাবধান করিতেন। সম্প্রতি তিনি মৃত যাছেন; কিন্তু উক্ত পতাকাটি তাঁহার পুত্রের কাছে থাকা ব। তিনি টাটানগরে কারখানায় কর্ম্ম করেন।

এক্ষণে, ত্রিবর্ণের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। ৺শচীন্দ্র প্রসাদ বসুর জীবনীতে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে এই বিষয়ে কোন আলোকসম্পাত করে না। লেখক এই বিষয়ে যাহা জানেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল। এই জাতীয় পতাকা লইয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যখন হৈ চৈ হয় তখন কংগ্রেসসেবী ৺সুধীর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখকের এই বিষয়ে আলাপ হয়। সুধীরবাবু কালীঘাটের হালদারদের দৌহিত্র গোষ্ঠীর এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। তিনি সিটি কলেজের স্কুল-বিভাগে শিক্ষক ছিলেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে একজন বিশিষ্টকর্ম্মী ছিলেন। সুধীরবাবু বলিলেন, সুরেন্দ্রবাবু যখন তাঁহাদের একটা জাতীয়পতাকা প্রস্তুত করিতে বলিলেন তখন তাঁহারা রাত্রিতে সমবেত হইয়া এই পতাকার ত্রিবর্ণ নিম্নলিখিত ভাবে স্থির করেন: একটি মুসলমানের প্রতীক, একটি হিন্দুর, একটি শিখের। লেখক যখন জিজ্ঞাসা করেন, ইহা ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকার নকল কিনা? তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করেন, হাঁ, ফরাসী ত্রিবর্ণ পতাকার ভাবই আমরা আসলে গ্রহণ করি কিন্তু প্রকাশ্যে ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতীক বলিয়া ব্যাখ্যা দিই। সুকুমারবাবুও বলেন, ইহা ফরাসী পতাকার ভাব লইয়া প্রস্তুত করা হয়।

যখন সুরেন্দ্রবাবুর বিপক্ষদলীয় পত্রিকাগুলিতে এই জাতীয় পতাকা-অনুষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করিয়াছিল তখন এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাটি

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি, বলিয়াই লেখক "যুগান্তর" পত্রিকায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। সেই একদিন গিয়াছে!

এক্ষণে কলিকাতার পতাকা এবং প্যারিসের পতাকার সৌসাদৃশ্য বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। যদি বলি, শেষোক্ত পতাকাটি তথাকার বৈপ্লবিকদের মস্তিষ্কের মৌলিক উদ্ভাবন—তাহা হইলে এই সৌসাদৃশ্য কোথা হইতে আসিল? এই বিষয়ে সঠিক সংবাদ লেখক কোথাও পাইলেন না। বাঙ্গলার জাতীয়-পতাকার রূপ লেখকের মনে নাই। এই পতাকা দেখিয়াছেন কিনা তাহাও তাঁহার স্মরণ হয় নাই, কেহই তাঁহাকে সঠিকসংবাদ দিতে পারেন নাই। বিদেশস্থ ভারতীয় বৈপ্লবিকেরাও এই পতাকা দেখেন নাই। এইসব কারণেই এই ভ্রম হইয়াছে। অতএব এই তর্কের সমাধান জন্য লেখককে অনুপায়ে তর্কশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সম্পূর্ণভাবে এই সৌসাদৃশ্য কি সমাজ-তাত্ত্বিক **Parallelism in history**-র ধারা অনুযায়ী উদ্ভূত হইয়াছিল? ইহার অর্থ: কলিকাতায় বসিয়া একদল স্বদেশসেবক যে পতাকাটি উদ্ভূত করিলেন, তাহার কিছু পরে পৃথকভাবে প্যারিসে ভারতীয় স্বদেশ-সেবকগণ স্বীয় মস্তিষ্ক হইতে মৌলিকভাবে প্রথমোক্ত পতাকাটির হুবহু অনুরূপ একটি পতাকা সৃষ্ট করিলেন! "ইতিহাসের সমান্তরলীয় রূপ ব্যাখ্যার ইতিহাসও সমাজতত্ত্বে আজ স্বীকৃত হয় না। এখনকার মত হইতেছে, **Diffusion of culture** অর্থাৎ একদেশের কৃষ্টি অন্যদেশে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে গৃহীত হইয়া বিস্তৃত হয়। নিশ্চয়ই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বাঙ্গলার আগষ্টের পতাকার প্রতিচ্ছবি প্যারিসের পতাকার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বিশেষতঃ যখন বাঙ্গলার পতাকাটি অগ্রে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং মাডাম কামা, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের নাম ইহার সহিত বিজড়িত করিতেন। নিশ্চয়ই কেউ বাঙ্গলার

পতাকাটির একটি নকল প্যারিসে লইয়া গিয়াছিলেন বা কলিকাতায় ইহা দেখিয়া এই প্রতীকের ছাপ তাঁহার মনে অঙ্কিত হইয়াছিল; উপযুক্ত বাতাবরণে তাহার প্রতিস্ফুরণ বা প্রতিবিম্ব তথাকার পতাকাতে প্রকাশ পায়।

এক্ষণে এই বিষয়ে সঠিক তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে বাঙ্গলার পতাকা, ম্যাডাম কামার পতাকা যদি কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায়, বার্লিনের পতাকার রূপ এবং কৃষ্ণবর্ম্মার "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিষ্ট" ও কামার "তলওয়ার" প্রভৃতি সংবাদপত্রের উক্তিসমূহের তুলনা করিলে কোন্ উৎস হইতে প্যারিসের পতাকা উদ্ভূত হইয়াছে বা কে কাহার কাছে ঋণী তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এই তথ্য উপস্থিত ইতিহাসের অনুসন্ধানের বাহিরে। এক্ষণে ইহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের হস্তে প্রদান করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত করিলাম। তবে এই কথাই মনে হয়; হায় দুর্ভাগা বাঙ্গলাদেশ! রাজনীতিতে তাহার সমস্ত কর্ম্ম, অপরের মৌলিক কৃতিত্ব বলিয়া ক্রমাগত জাহির করা হইতেছে এবং ভারতের রাজনীতিক ইতিহাস হইতে তাহার সমস্ত অবদান মুছিয়া ফেলা হইতেছে।

জাতীয়-পতাকার অভিব্যক্তি

"জাতীয় পতাকার উৎপত্তি এবং বিবর্ত্তনের ইতিহাস" অসম্পূর্ণ থাকিবে যদি ইহার গোড়ার সংবাদ এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ না হয়। এই জন্ত নিম্নলিখিত সংবাদ এই প্রসঙ্গের সহিত যোজিত করা হইল।

ডঃ ফণীন্দ্রনাথ বসু এম. এ., পি. এইচ. ডি-মহোদয় কৃত Life of Sris Chandra Basu নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত সংবাদ দিতেছেন: "হিন্দু এবং মুসলমানের প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের জন্ত শ্রীশবাবু ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে

লাহোরে The Indian National Society নামক একটি সমিতি স্থাপন করেন। ইহার সভ্যেরা জাতীয় সঙ্গীত সহকারে একটি "জাতীয় পতাকা" উড্ডীন করিয়া লাহোরের রাস্তার পরিভ্রমণ করিতেন। (এই বিষয়ে "The Arya" p. 461, April, 1883 দ্রষ্টব্য) এই পতাকাটি প্রথম উড্ডীন করা হয়। এইসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে ৺রাজনারায়ণ বসুর "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" নামক পুস্তকে লিখিত আছে, "পদ্ম" ফুলই ভারতের জাতীয় প্রতীক তদানীন্তন 'Libera l' নামক সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া একটি জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা অনুমান ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত পুস্তকে প্রদান করেন। তাহা হইলে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার কংগ্রেসের পতাকায় পদ্ম ফুলের আবির্ভাবের হেতু বুঝিতে শক্ত হয় না। ইহার পরে ১ম জগতব্যাপী যুদ্ধের সময় আনি বেসাণ্ট মহোদয়া ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Home Rule League-এর প্রতীকরূপে একটি জাতীয় পতাকা লীগ দ্বারা গৃহীত হয়। তৎপরে গান্ধীজী-পরিচালিত কংগ্রেস ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত একটি পতাকা ভারতীয় নেশনের প্রতীকরূপে গ্রহণ করে। এই প্রকারে শ্রীশবাবুর 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সোসাইটি' পতাকা বাঙ্গলার "কংগ্রেস" পতাকা, ইউরোপে বৈপ্লবিকদের পতাকা, ভারতীয় হোমরুল লীগ পতাকা, জাতীয় কংগ্রেস পতাকা, স্বাধীন ভারতের প্রতীকরূপে বর্ত্তমানের জাতীয় পতাকা, ইহাই হইতেছে ভারতের জাতীয় পতাকার অভিব্যক্তির ধারা।
